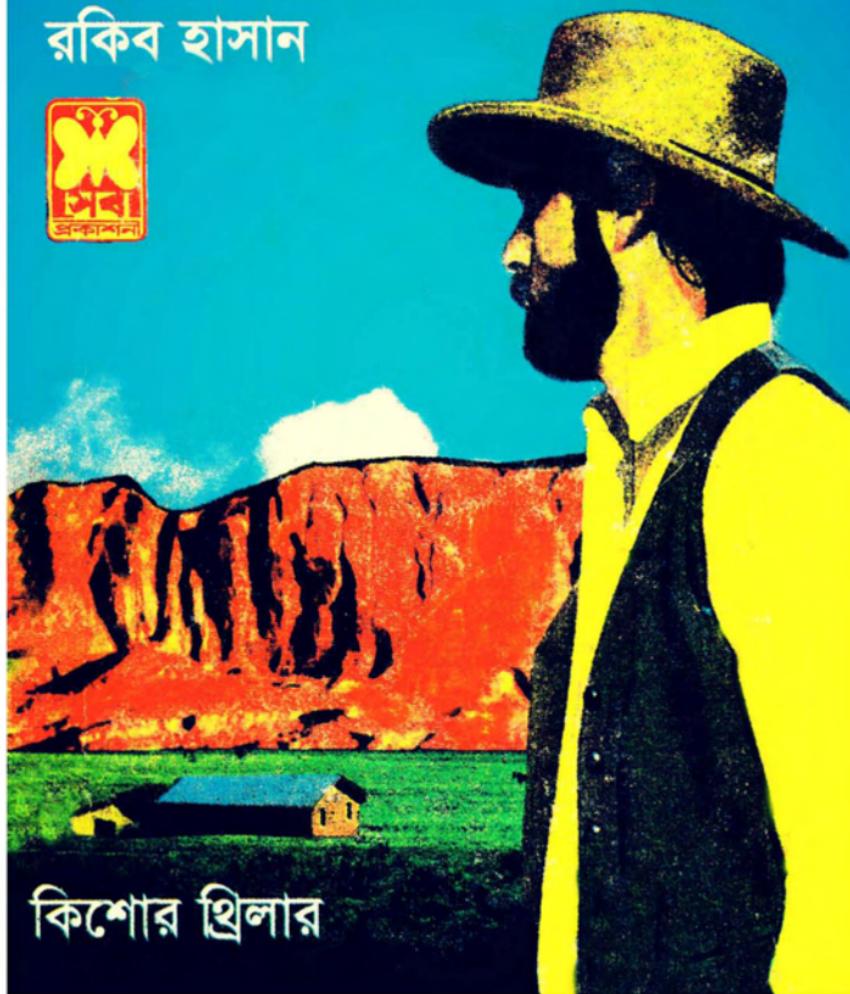
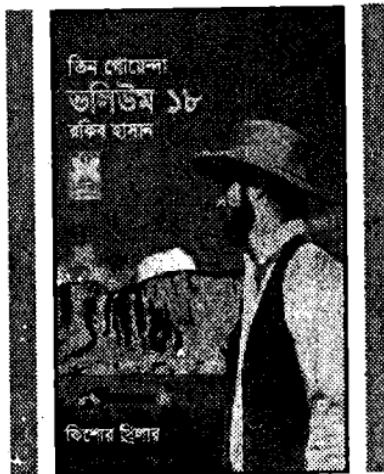


তিন গোয়েন্দা  
**ভলিউম ১৮**  
রকিব হাসান



কিশোর প্রিলাই

ভলিউম-১৮  
তিন গোয়েন্দা  
৬৪, ৬৫, ৬৬  
রফিব হাসান



সেবা প্রকাশনী  
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক  
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-1279-8

প্রকাশক

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক  
সেন্ট্রালবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচন্দ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে  
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেন্ট্রালবাগিচা প্রেস

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক  
সেন্ট্রালবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সম্বন্ধকারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক  
সেন্ট্রালবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দ্রুলাপন: ৮৩১ ৪১৮৪

মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৮০৫০

জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক

প্রজাপতি প্রকাশন

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক  
সেন্ট্রালবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৬২৭

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৯১৮-১৯০২০৩

Volume-18

TIN GOYENDA SERIES

By: Rakib Hassan



আটষষ্ঠি টাকা

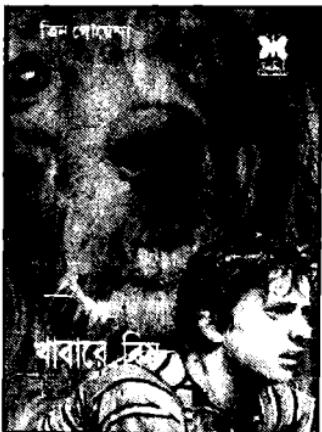
## তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১ (তিন গোয়েন্দা, কঙাল হীপ, ঝুপালী মাকড়সা)	৬৬/-
তি. গো. ভ. ১/২ (ছায়াশাপদ, মধি, রত্নদানো)	৬৬/-
তি. গো. ভ. ২/১ (প্রেতসাধন, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	
তি. গো. ভ. ২/২ (জলদস্যুর হীপ-১,২, সবুজ ভূত)	
তি. গো. ভ. ৩/১ (হারানো তিমি, মুজোশিকারী, মৃত্যুধনি)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২ (কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১ (ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	
তি. গো. ভ. ৪/২ (জ্বাগন, হারানো উপত্যকা, ভুমানব)	
তি. গো. ভ. ৫ (ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগম্বক, ইন্দ্ৰজাল)	৫৮/-
তি. গো. ভ. ৬ (মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রঞ্জনো)	
তি. গো. ভ. ৭ (পুরানো শক্তি, বোবেটে, ভূতড়ে সুড়ঙ্গ)	
তি. গো. ভ. ৮ (আবার সম্মেলন, ভয়ালগাঁথি, কালো জাহাজ)	৬০/-
তি. গো. ভ. ৯ (গোচার, ঘড়ির গোলযাল, কানা বেড়াল)	৬১/-
তি. গো. ভ. ১০ (বাঞ্ছিটা প্রয়োজন, খৌতা গোয়েন্দা, অুঠে সাগর ১)	
তি. গো. ভ. ১১ (অবৈধ সাগর ২, বুক্সির বিলিক, গোলাপী মুক্তে)	৬৫/-
তি. গো. ভ. ১২ (প্রজাপতির ধামার, পাচল সংস্থ, ভাঙ্গা ঘোড়া)	৬৩/-
তি. গো. ভ. ১৩ (ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকল্যা, বেগুনী জলদস্যু)	
তি. গো. ভ. ১৪ (পায়ের ছাপ, তেপাস্তর, সিংহের গর্জন)	৭১/-
তি. গো. ভ. ১৫ (পুরানো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৬৯/-
তি. গো. ভ. ১৬ (পাঁচীন মৃতি, নিশাচর, দক্ষিণের হীপ)	৭২/-
তি. গো. ভ. ১৭ (দীর্ঘের অঞ্চল, নকল কিশোর, তিনি পিশাচ)	৬০/-
তি. গো. ভ. ১৮ (খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৬৮/-
তি. গো. ভ. ১৯ (বিমান দৃষ্টিনা, গোরতানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	
তি. গো. ভ. ২০ (খুল, স্পেনের জাদুকর, বান্দের মুখোশ)	
তি. গো. ভ. ২১ (ধসর মেরু, কালো হাত, মৃতির হৃষ্ণা)	
তি. গো. ভ. ২২ (চিতা নিরন্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	
তি. গো. ভ. ২৩ (পুরানো কামান, গেল কোথায়, একিমুরো কর্পোরেশন)	
তি. গো. ভ. ২৪ (অপারেশন কক্ষবাজার, মাঝা নেকড়ে, প্রেতাজ্ঞার প্রতিশোধ)	
তি. গো. ভ. ২৫ (জিনার সেই হীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, পুণ্ডের শিকারী)	
তি. গো. ভ. ২৬ (আমেলা, বিষাঙ্গ, আকড, সোনার খোজে)	
তি. গো. ভ. ২৭ (এতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি)	
তি. গো. ভ. ২৮ (ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের হীপ)	
তি. গো. ভ. ২৯ (আরেক ফ্র্যান্কেলস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৫১/-
তি. গো. ভ. ৩০ (নৰকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফুর্মলা)	৫৮/-
তি. গো. ভ. ৩১ (মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৩২ (প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৬৩/-
তি. গো. ভ. ৩৩ (শয়তানের ধৰ্মা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নেট)	৬৫/-
তি. গো. ভ. ৩৪ (যুক্ত ঘোষণা, হীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৫৫/-

তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, ম্যাট্রিসডি, তিন বিঘা)	
তি. গো. ভ. ৩৬	(টেক্স, দক্ষিণ যাতা, প্রেট রবিনিয়োসো)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, প্রেট কিশোরিয়োসো, নির্বোজ সংরক্ষণ)	
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীর্ঘির দানো)	
তি. গো. ভ. ৩৯	(বায়ের ডয়, জলদস্যুর মোহুর, টাদের ছায়া)	
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশঙ্গ ল'কেট, প্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন আলিগেটর)	৬১/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ হিন্তাই, পিশাচকল্প্য)	
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, হৃদ্বেশী গোয়েন্দা)	
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, হৃদ্বেশী গোয়েন্দা)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসক্তান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদস্থল)	
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়ল উধাও, টাকার খেলা)	
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, ডক্টি রহস্য, নেকডের গুহা)	
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাতা)	
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মুক্তভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৬১/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের আভশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষবেকোর দেশে)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছের সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৫১/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গীয়, চাঁদের পাহাড়)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবগুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেক্ট্রনিক আতঙ্ক)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভুতের খেলা)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের ম্যায়া)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের অস্ত্রণা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৬০	(স্টকি বাহিনী, ড্রাইম ট্র্যাভেল, স্টকি শক্র)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোজে তি. গো.)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, বাড়ের বলে, মোমপশাচের জাদুবর)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রুলোর বৃক্ষ, সরাইবানায় ষড়যজ্ঞ, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ, হীরার কাতুজ, ড্রুলো-দুর্দে তিন গোয়েন্দা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৫	(বিডালের স্পুরগাধ+রহস্যভোনী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৬	(পাথরে বদ্দা+গোয়েন্দা জোবি+ক্লানি পশাচ)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৭	(ভুতে গাঢ়ি-হারানো কুকুর+গিয়েগুহার আতঙ্ক)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৬৮	(টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+স্টকি গোয়েন্দা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৬৯	(পাগলের ভুত্তধন+দুর্বী মানুষ+মুমির আতনাদ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৭০	(গাকে বিপদন+বিপদৈর গঁথ+ছবির জাদু)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭১	(প্রশাচবাহিনী+রহস্যের সকানে+পিশাচের ধাবা)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭২	(ভিন্দেশী গাঢ়কুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৭৩	(গুর্বীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভূত্যে ঘড়ি)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭৪	(কাঁওয়াই ছীপের মুর্বাশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউন্সিলে গন্ধোল)	৫১/-
তি. গো. ভ. ৭৫	(কালো ডাক+সিই নিকদেশ+ফ্যাট্টসিলাই)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৬	(মুখের মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+লিলিপুট-রহস্য)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৭	(চোপ্পাইন পোয়েন্দা+ছায়াসূচা+গীতাল ঘরে তিন গোয়েন্দা)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৭৮	(চোমামে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+মায়াশহর)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭৯	(শুকানো সেনানা+পশাচের ঘাটি+ত্যাগ মানব)	
তি. গো. ভ. ৮০	(মুখেশ পুরা মানুষ+অদশ্য রশ্মি+গোপন ডায়েরি)	
তি. গো. ভ. ৮১	(কালোপদার অঙ্গরাজে+ভয়াল শহর+সুমেরুর আতঙ্ক)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৮২	(বন্দুজ্যুর কবলে+গাঢ় চৰ+গুতুল-রহস্য)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৮৩	(ধৰ্মনিতে বিপদ+ওঞ্চা-রহস্য+কিশোরের নেটবুক)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৮৪	(মৃত্যুজহার বন্দি+বিষাক্ত ছোবল+স্টকি গাঢ়কুমার)	৪১/-

# খাবারে বিষ

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯২



মাঝপথে ।

‘খাইছে!’ বলল সে, ‘বৃষ্টি যা হচ্ছে না!'

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকাল পাশে বসা কিশোর পাশা ।

শুধু বৃষ্টি না, বাড়ো বাতাসও বইছে । ঝামঝাম ঝামঝাম অবিরত উইগুশীল্ডে আঘাত হেনে চলেছে বড় বড় ফোঁটা । আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের শিখা । বাজ পড়ল বিকট শব্দে ।

‘থামবে না । এরই মধ্যে বেরোতে হবে,’ মুসা বলল । ‘ভিজিটিং আওয়ারও শেষ হয়ে আসছে।’

ফারিহাকে দেখতে এসেছে ওরা । একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে । ইদানীং ওর সঙ্গে হন্দ্যতা গড়ে উঠেছে মুসার ।

চুপ করে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর ।

‘কি হলো, নাম না । ফারিহা অপেক্ষা করছে।’

‘করুক । বৃষ্টি যে হচ্ছে সেটাও নিশ্চয় বুঝতে পারছে।’ কার ওপর বিরক্ত হয়েছে কিশোর, বোঝা গেল না । সীটবেল্ট খুলল ।

‘আসলে মেয়েদেরকে তুমি দেখতে পারো না।’

‘কথাটা ঠিক না, মুসা । তবে ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান শুরু করে যখন, তখন আর ভাল্লাগে না । আর যখন কোন ব্যাপারে অহেতুক চাপাচাপি শুরু করে, না বুঝে।’

হেসে উঠল মুসা । ‘জিনার সহমনে বলে দেখ এসব কথা...’

‘বললে কি হবে? খেয়ে ফেলবে নাকি?’

জবাব দিল না মুসা । ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা । উইগুব্রেকারের হ্রত তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে । মাথা নিচু করে দিল দৌড় । কিশোরও বেরোল । দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে মুসার পিছু নিল ।

বারান্দায় উঠে উইগুব্রেকার খুলে ঝেড়ে পানি ফেলল । তারপর ভাঁজ করে হাতে নিয়ে রওনা হলো রুম নম্বর ১১১১-এর দিকে ।

চুকে দেখল বিছানায় শয়ে আছে ফারিহা ডিকটার । ফোনে কথা বলছে । এক

আঙুলে বার বার পেঁচাছে কোঁকড়া চুল। তিতি অন করা। মিউজিক শো চলছে। দেখে মনেই হয় না, মাত্র তিনদিন আগে অ্যাপেনডিস্স অপারেশন হয়েছে তার।

রকি বীচ হাই কুলে হাসিখুশি মিশুক মেয়ে বলে সুনাম আছে ফারিহার। মাস ছয়েক আগে হঠাৎ করেই মনে হয়েছে তার, মুসা খুব ভাল ছেলে। ওর সঙ্গে বৃন্দাবন করা চলে।

ওদেরকে চুকতে দেখে ফোনে বলল ফারিহা, ‘আজ রাখি, শেলি। মুসা আর কিশোর এসেছে...কি বললে?...কিশোর?...জানি না।’

নিজের নাম শুনে শূন্য দৃষ্টিতে একবার ফারিহার দিকে তাকিয়েই আরেক দিকে চোখ সরিয়ে নিল কিশোর।

‘ও তো সব সময়ই মেয়েদেরকে এড়িয়ে চলে,’ ফারিহা বলল। ‘আচ্ছা, দেখি জিঞ্জেস করে,’ কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিঞ্জেস করল, ‘শেলি কথা বলতে চায়। বলবে?’

চোক গিলল কিশোর। যত জটিল রহস্যই হোক, তাতে ঝাপিয়ে পড়তে ওর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যতই বড় হচ্ছে, বুঝতে শিখছে, অভিজ্ঞ হচ্ছে, ততই যেন মেয়েদেরকে আরও বেশি রহস্যময় মনে হচ্ছে ওর। ওদের কোন কিছুই যেন বোঝা যায় না। ‘না’ বলতে পারলেই খুশি হত কিশোর, তবু এভাবে মুখের ওপর না বলে দেয়াটা অভ্যন্তর। তাই হাত বাড়াল, ‘দাও।’

রিসিভার কানে ঠেকাল গোয়েন্দা প্রধান। ‘হালো। কিশোর পাশা বলছি।’

খিলখিল করে হাসল শেলি। ‘ঘাবড়ে গেছ মনে হয়? তারপর? চলছে কেমন?’

‘এই তো শুরু হলো ফালতু কথা!’ মনে মনে বলল কিশোর। জিঞ্জেস করল, ‘কি চলছে?’

‘বোকা নাকি? কেমন আছ জিঞ্জেস করছি, বুঝতে পারছ না?’

‘তাহলে কেমন আছি, সেটা সোজা করে জিঞ্জেস করলেই হয়।’

‘আ য়ার, জুলাই! তোমার সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি...’

‘তাহলে বলো কেন?’

হাসতে আরম্ভ করেছে মুসা আর ফারিহা। জানে, এরকমই একটা কিছু ঘটবে।

‘বলি কেন? এটা একটা কথা হলো...’

ঘামতে শুরু করেছে কিশোর। ঠিক এই সময় লাল চুলওয়ালা একজন নার্স উকি দিয়ে বলল, ভিজিটিং আওয়ার শেষ। বেরিয়ে যেতে হবে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন কিশোর। তাড়াতাড়ি রিসিভারটা ফিরিয়ে দিল ফারিহার হাতে। ফারিহা বলল, ‘শেলি, পরে কথা বলব। এখন রাখি...’

বলেই চলে গেছে নার্স। হঠাৎ ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। দু'জন আর্দালী আর দু'জন নার্স একটা চাকাওয়ালা বেড ঠেলতে ঠেলতে চুকল। সঙ্গে চুকলেন একজন ডাক্তার। লাফিয়ে সরে গেল কিশোর।

বেডটাতে একজন রোগী। একটা মেয়ে। কিশোরদেরই বয়েসী হবে। কালো কোঁকড়া চুল। সুন্দর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। জখম আছে। ব্যাণ্ডেজ লাগানো।

'ফারিহা,' ডাক্তার বললেন। 'তোমার নতুন রুমমেট।' রোগীকে ফারিহার পাশের বিছানাটায় শোয়াতে নার্সদের সাহায্য করলেন তিনি। বেহুশ হয়ে আছে রোগী।

'বেশি অসুস্থ?' ফারিহা জানতে চাইল।

'ওর জখমগুলো সুপারফিশিয়াল মনে হচ্ছে,' শান্তকষ্টে বলল কিশোর। 'আমার ধারণা, কনকাশন আর মাইল্ড শক থেকে সেরে উঠছে।'

হা হয়ে গেছেন ডাক্তার। অবাক হাসি ফুটল মুখে। 'ডাক্তারি পড়ছ নাকি?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'তবে অবসর সময়ে যে কোন বই হাতের কাছে পেলে পড়ে ফেলি।'

নার্সেরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। মেয়েটার হাতে স্যালাইনের সূচ তুকিয়ে দিয়েছে। স্যালাইনের সঙ্গে আরও নানারকম ওষুধ মিশিয়ে দিতে লাগল। কাজ শেষ করে সরে দাঁড়াল। চার্টে নোট লিখে দিতে লাগলেন ডাক্তার।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

'অ্যাস্ট্রিডেন্ট করেছে,' ডাক্তার জানালেন। 'কাউন্টলাইন ড্রাইভে। ও কিছু না। এ রকম রাতে অ্যাস্ট্রিডেন্ট করবেই। দিনের বেলাতেই করে বসে, যে ভাবে বেপরোয়া চালায় আজ কালকার...'

ডাক্তারের কথা শেষ হওয়ার আগেই আবার দরজায় উঁকি দিল লাল চুলওয়ালা সেই নার্স। কিশোর আর মুসার দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল, 'যাওনি এখনও! বললাম না ভিজিটিং আওয়ার শেষ।'

'শনেছি তো,' বিরক্ত হয়েই বলল মুসা।

'তাহলে যাচ্ছ না কেন? দারোয়ানকে খবর দেব?'

ফারিহার দিকে তাকাল মুসা। 'চলি, ফারিহা। কাল আবার আসব। রাতে ইচ্ছে করলে ফোন কোরো। কিশোরদের বাড়িতেই থাকছি আজ।'

নার্সের দিকেও নজর নেই কিশোরের, মুসা আর ফারিহার দিকেও না। সে তাকিয়ে রয়েছে নতুন রোগীর দিকে।

'অ্যাই, এসো,' ডাকল মুসা। 'কি দেখছ?'

'চার্টে নাম লিখে গেছেন ডাক্তার। জুন লারসেন। কে ও?'

'আমি কি জানি? চলো। ওই নার্সটা যদি এসে দেখে এখনও যাইনি...  
চলো।'

মেয়েটা কে মিনিটখানেক পরেই জেনে গেল দু'জনে। এলিভেটরের দিকে চলেছে। এই সময় বিশালদেহী একজন মানুষ হস্তদণ্ড হয়ে বেরিয়ে এলেন ওটার ডেতর থেকে। ছুটে গেলেন নার্সরা যেখানে বসে সেদিকে। সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন লাল চুলওয়ালা নার্সের ডেক্সের সামনে। মাথা ঝুঁকিয়ে প্রায় মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মেয়ে কোথায়? কোন ঘরে?'

'আরে এ তো হার্বার্ট লারসেন!' চিনে ফেলেছে কিশোর। 'চিকেন!'

'হ্যা,' মুসাও চিনতে পেরেছে। 'দি চিকেন কিং! মুরগীর রাজা!'

লাল, সাদা, নীল রঙের বিচিত্র সমাহার পোশাকে। বেশির ভাগ সময়েই যা

পরে থাকেন সেই জগৎ স্যুট। এই পোশাকে টিভিতেও দর্শকদের দেখা দিয়েছেন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রায় সবাই চেনে তাকে। হাজার হাজার বার দেখেছে টিভির পর্দায়। যে কোন চ্যানেল খুললেই কোন না কোন সময় চোখে পড়বেই বিজ্ঞাপনটা। ওখান থেকেই তার ডাক নাম হয়ে গেছে চিকেন। আগের ‘দি’ এবং পরের ‘কিং’ বাদ দিয়ে দিয়েছে লোকে।

‘জুন লারসেন...হার্বার্ট লারসেন,’ বিড়বিড় করছে কিশোর। ‘জুন নিশ্চয় লারসেনের মেয়ে।’

‘রুম ওয়ান ওয়ান ওয়ান, মিস্টার লারসেন,’ নার্স বলল।

‘ওটা কি লাকি রুম?’ লারসেন বললেন, ‘আমি চাই, আমার মেয়ে লাকি রুমে থাকুক। যেটাতে কোন রোগী মারা যায়নি। কোথায় ওটা? কোন দিকে? কোন ঘরটা?’

ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। তাঁর জন্যে খারাপই লাগল কিশোরের। এগিয়ে গেল নার্সের ডেক্সের কাছে। মিস্টার লারসেন, ওই যে ওই ঘরটা।’

লারসেন যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। কিশোরকে ক্ষুদ্রই মনে হলো তাঁর কাছে, যদিও সে-ও কম লম্বা নয়। তুরু কুচকে তাকালেন কিশোরের দিকে, ‘তুমি শিওর?’

‘হ্যাঁ, এই মাত্র দেখে এলাম। ওঘরে আমাদের এক বঙ্গুও আছে। জুন এখন ঘুমিয়ে।’

কিছুটা যেন অস্তি পেলেন চিকেন কিং। সোয়েটশার্টের পকেট থেকে দুটো কুপন বের করে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘নাও। দুটো টিকেট। আমার দোকানে গেলে ফ্রী খেতে পারবে চিকেন। আমার নিজের তৈরি সোনালি সঙ্গে চুবিয়ে। খেলে ভুলবে না।’

নিতে দ্বিধা করছে কিশোর।

‘আরে নাও নাও, তাড়া আছে আমার,’ জোর করে কুপন দুটো কিশোরের হাতে গুঁজে দিলেন লারসেন। ‘তোমরা ভাল সংবাদ দিয়েছ। সেজন্যেই দিলাম। আমি তো ভেবেছিলাম মরেই গেছে! থ্যাঙ্ক ইউ।’

বিশাল শরীর নিয়ে বেশ দ্রুতই মেয়ের ঘরের দিকে ছুটলেন লারসেন। সেদিকে তাকিয়ে থেকে কুপনগুলো একটানে ছিঁড়ে ফেলল কিশোর। বাধা দিতে গেল মুসা। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। ‘হায় হায়, এ কি করলে!’

‘গত হণ্টায় ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, মনে নেই? পেটের অসুখের জন্যে? ভাজাভুজি খেতে মানা করে দিয়েছেন।’

‘সে তো তোমাকে দিয়েছেন। আমাকে নয়।’

‘এখানে আমার তোমার বলে কোন কথা নেই।’ পেটের জন্যে যেটা খারাপ, সবার জন্যেই খারাপ।’

যুক্তি খুঁজে না পেয়ে চুপ হয়ে গেল মুসা। তবে এত ভাল একটা খাবার এভাবে নষ্ট করা হলো বলে মনে রেগেই গেল কিশোরের ওপর।

আবার বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠল দু’জনে। স্যালভিজ

ইয়ার্ডে রওনা হলো।

‘অ্যাক্সিডেন্টটা কি করে ঘটল জানতে পারলে হত,’ কিশোর বলল।

কিছু বলল না মুসা। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে। কিশোরের মনে কিসের খেলা চলছে ভাল করেই বুঝতে পারছে সে। পেয়ে গেছে রহস্য।

ইয়ার্ডে চুকল গাড়ি। সোজা এসে ওয়ার্কশপে চুকল দু'জনে। টেলারের ডেতরে তো পুরানো হেডকোয়ার্টার আছেই, ওয়ার্কশপটাকেও এখন আরেকটা হেডকোয়ার্টার বলা যায়। নানা রকম আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সাজিয়েছে কিশোর। এককোণে একটা ডেক্সের ওপর রাখা একটা অ্যানসারিং মেশিন। চুকেই আগে ওটার কাছে এগিয়ে গেল সে। বোতাম টিপতেই মেসেজ টেপে শোনা গেল রবিনের পরিচিত হাসি হাসি কষ্ট, ‘ফারিহাকে দেখতে যেতে পারলাম না। সরি। বস চলে গেছে শহরের বাইরে। নতন আরেকটা ব্যাও চেক করতে গিয়েছিলাম। অফিসে ফিরে হাসপাতালে যাব ভাবছি, এই সময় ফোন করল এমিলি। ও আজকে দাওয়াত করেছিল, পার্টিতে, ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন চাপাচাপি শুরু করল, না গিয়ে আর পারলাম না। জানোই তো ওর অবস্থা। ওকে কি কুরে ঠেকানো যায়, বলো তো কিশোর? তোমার কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করে দেখ, কোন একটা পরামর্শ দিতে পারে কিনা, আচ্ছা, কাল দেখা হবে।’

‘ট্যালেন্ট এজেন্সিতে বড় বেশি সময় দিছে রবিন,’ গানের কোম্পানিটার কথা বলল কিশোর, যেটাতে পাটটাইম চাকরি নিয়েছে নথি-গবেষক।

‘হ্যাঁ,’ মুচকি হাসল মুসা। ‘আরেকটা চাকরিতেও বড় বেশি সময় নষ্ট করছে আজকাল। মেয়েদের পেছনে।’ রবিনটা যে এমন হয়ে যাবে, কল্পনাই, করতে পারিনি।’

‘কি আর করা যাবে?’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কিশোর। ‘এটা আমেরিকা। যে দেশের যা সমাজ। ও তো আর আমার মত নয় যে মেয়েদের সঙ্গে ডেটিং অপছন্দ করবে...’

‘তোমাকেই বা কে মানা করেছে?’

‘করেনি। তবে আমার এসব ভাল লাগে না। একটা ব্যাপারেই কষ্ট হয়, রবিনকে আর আগের মত পাছি না আমরা।’

‘কই, পাছি না কোথায়? তিনি গোয়েন্দার কাজের সময় তো ঠিকই এসে হাজির হয়। আমি একটা কথা লিখে দিতে পারি, দেখ, ট্যালেন্ট এজেন্সিতে বেশিদিন টিকবে না ও। ব্যাপারটা সাময়িক। ও আবার ফিরে যাবে লাইব্রেরিতে, বইয়ের জগতে।’

‘তাই যাওয়া উচিত। যেখানে যাকে মানায়।’

আর কথা বাড়াল না। কিছু কাজ আছে ওদের। ছোট একটা যন্ত্র মেরামত করতে বসে গেল কিশোর। ওটা দিয়ে ইলেক্ট্রনিক লক কম্বিনেশন পড়া সম্ভব-কিছু যন্ত্রপাতি এন্দিক ওদিক করে নিলে, কিশোরের অন্তত সে রকমই ধারণা। ওকে বিরক্ত করল না মুসা। একটা ফুঁয়েল ইনজেক্টরের স্প্রেয়ার পরিষ্কারে লেগে গেল। ওর গাড়ির জন্যে কাজে লাগবে।

বেশিক্ষণ চূপ করে থাকতে পারল না। কথা বলতে বলতে কাজ করে চলল দু'জনে। কিশোরের একটা গাড়ি দরকার, সে কথা আলোচনা করল কিছুক্ষণ। আরও খানিকক্ষণ আফসোস করল রবিনকে আগের মত করে পাছে না বলে। এক সময় চলে এল চিকেন হার্বার্ট লারসেনের কথায়। জুন লারসেনের দুর্ঘটনার ব্যাপারটা এখনও মাথায় ঘুরছে কিশোরের। পুরোপুরি জানতে পারেনি বলে খুঁতখুঁত করছে মন্টা।

হঠাৎ বাজল টেলিফোন। চমকে দিল দু'জনকেই। ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় মধ্যরাত। এত রাতে কে করতে পারে, বিশেষ করে শুক্রবারের স্নাতে?

পুরানো একটা সুইভেল চেয়ারে বসেছে কিশোর। ওটাকে ঘুরিয়ে ফোনের দিকে হাত বাড়াল। 'হালো, তিন গোয়েন্দা।'

'কিশোর, ফারিহা বলছি। তোমাদের স্পীকারের সুইচ দিয়ে দাও। দু'জনকেই শোনাতে চাই।'

'ফারিহা,' টেলিফোন লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সুইচ অন করতে করতে মুসাকে জানাল কিশোর। আরও একটা বিশেষ নতুন ব্যবস্থা করেছে সে, যাতে এপাশে যতজন থাকবে, সবাই ওপাশের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।

মুসাও তারই মত অবাক হলো। জিজ্ঞেস করল, 'ফারিহা, কি হয়েছে? এত রাতে?'

আবার সেই অনুভূতিটা হলো কিশোরের, রহস্যের গুরু পেলে যেমন হয়। তবে নিশ্চিত হতে পারছে না।

'অদ্ভুত একটা কাণ করছে জুন,' জবাব দিল ফারিহা। 'ঘুমের মধ্যে গোঙাছে, আর বিড়বিড় করে কথা বলছে।'

'ওরকম অ্যাক্সিডেন্টের পর প্রলাপ বকাটাই স্বাভাবিক,' কিশোর বলল।

তা ঠিক। তবে যা বলছে, তাতে ভয় লাগছে আমার। বলছে, হাজার হাজার, লাখ লাখ লোক মারা যাবে! বার বার বলছে একই কথা।'

চূপ হয়ে গেল কিশোর আর মুসা। জবাব দিতে পারছে না।

ফারিহা বলছে, 'এই শেষ নয়। ও বলছে, মুরগীতে বিষ মিশিয়ে দেয়া হয়েছে! এটা ঠিক না! এটা অন্যায়! এমন ভঙ্গিতে বলছে, যেন নিজের চোখে বিষ মেশাতে দেখেছে। ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকছে বলে মনেই হয় না!'

মৃদু শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'সাংঘাতিক কথা!'

ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে কিশোর বলল, 'কি, বলেছিলাম না? আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে?'

'বলেছ। কিন্তু কে জানত, চিকেন কিৎ আমার প্রিয় খাবারে বিষ মেশাচ্ছেন?'

## দুই

'অ্যাই, শুনছ?' কিশোরের ওয়ার্কশপে স্পীকারে ভেসে এল ফারিহার গলা। 'আছ নাকি ওখানে?'

আছে ঠিকই, তবে জিভ যেন জড়িয়ে গেছে। কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে। কতবার খেয়েছে চিকেন কিংগের রেস্টুরেন্টে? শতবার? হাজার বার? কিশোরই খেয়েছে এতবার, খাবারের প্রতি যার ঝৌক নেই তেমন। আর মুসা যে কতবার খেয়েছে তার তো হিসেবই করতে পারবে না। চোখে ভাসছে, টিভির পর্দায় দেখা হার্বার্ট লারসেনের চেহারা। চেহারাটাকে নিষ্পাপ করে তুলে নিরীহ কঢ়ে বলেন; আমার মুরগী সেরা মুরগী। খেয়ে খারাপ বলতে পারলে পয়সা ফেরত।

‘চিকেন লারসেন... খাবারে বিষ মেশায়...?’ বিড়বিড় করছে মুসা। বিশ্বাস করতে পারছে না। আনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে চলেছে। ‘আমার বিশ্বাস হয় না!’

‘হওয়ার কথাও নয়,’ কিশোর বলল। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার চিঞ্চিত ভঙ্গিতে। ‘চাচী প্রায়ই বলে, আপাতদৃষ্টিতে যেটা ঠিক মনে হবে সেটা ঠিক না-ও হতে পারে। কেন একেবারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছি আমরা?’

‘মানে?’

‘মানে, চিকেন লারসেনকে দোষ দিছি কেন আমরা? ঘোরের মধ্যে তাঁর কথাই বলছে জুন, কি করে জানছি? নাম তো আর বলেনি। অন্য কারও কথাও বলে থাকতে পারে, যে খাবারে বিষ মেশাচ্ছে। মন্ত্র একটা শক খেয়েছে সে। নানারকম ওষুধ দেয়া হচ্ছে। ওষুধের কারণেও দুঃস্বপ্ন দেখে অনেক সময় রোগী। হ্তে পারে ব্যাপারটা পুরোই দুঃস্বপ্ন।’

‘অ্যাই, শোনো,’ ফারিহা বলল। ‘জুনের মুখের কাছেই নিয়ে যেতে পারতাম। তাহলে নিজের কানেই শনতে পারতে। কিন্তু কউটা অতদূর যায় না। যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে যাচ্ছি।... শোনো। শনতে পাচ্ছ?’

‘মাথা নাড়ল মুসা।

কিশোর বলল, ‘না। কি বলে?’

‘আবার সেই একই কথা,’ ফারিহা বলল। ‘বলছে, না না, দিও না... লোক মারা যাবে! ওকাজ কোরো না!’

‘ও-কে,’ কিশোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ‘কাল সকাল এগারোটায় জুনের সঙ্গে কথা বলব। ভিজিটিং আওয়ার স্টার্ট হলেই চলে আসব। দেখা যাক, ঘুম ভাঙ্গে কিনা, কিছু বলতে পারে কিনা স্বপ্নের ব্যাপারে।’

‘ভালই হয় এলে। তবে আমি বাজি রেখে বলতে পারি, রহস্য একটা আছেই। পেয়ে যাবে।’

‘কাল সকালে দেখা হবে, ফারিহা,’ মুসা বলল।

লাইন কেটে দিল কিশোর।

সে রাতে ভালমত ঘুমাতে পারল না কিশোর। ভাবছে, কোন লোকটা লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিষ খাওয়াতে চায়? কেন? চিকেন লারসেন? নাকি কোন খেপাটে সন্ত্রাসী, যার দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে জুন? নাকি লারসেনের ব্যবসার ক্ষতি করার জন্যে কেউ বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে মুরগীর মাংসে তৈরি তার বিখ্যাত খাবারগুলোতে?

রাত একটায় রবিনকে ফোন করল কিশোর। পেল না বাড়িতে। তখনও খাবারে বিষ

কেরেনি।

দুটোয় আবার করল। এইবার পেল। সব কথা জানিয়ে বলল, সকালে যেন হাসপাতালে হাজির থাকে।

কিশোরের ফোন পাওয়ার পর রবিনেরও ঘূম হারাম হয়ে গেল। সে-ও ভাবতে লাগল একই কথা, কে এ রকম পাইকারী হারে মানুষ মারতে চায়?

ফারিহাত ঘুমোতে পারছে না। জেগে রয়েছে বিছানায়। কান পেতে রয়েছে আর কিছু বলে কিনা শোনার জন্যে। যতবারই গুড়িয়ে ওঠে জুন, সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে সে, 'জুন, কে? কে মুরগীতে বিষ মেশাচ্ছে বলো তো?' কিন্তু জবাব দেয় না জুন।

মরার মত ঘুমিয়েছে কেবল মুসা। তার কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি।

পরদিন সকালে জানালা দিয়ে যখন হাসপাতালের ঘরে রোদ এসে পড়েছে, তখন সেখানে পৌছল কিশোর আর মুসা।

প্রথমেই লক্ষ্য করল কিশোর, ফারিহাকে ঝান্ত দেখাচ্ছে। ঘরে ফুলদানীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে, আর তাতে অনেক ফুল। জুনের বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে একটা স্টাফ করা মুরগী, মাথায় সোনালি মুকুট। পর্দা টেনে ধিরে দেয়া হয়েছে জুনের বিছানা।

পর্দা টানা জায়গাটার দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'জুন কোথায়?' এখনি ওর সঙ্গে কথা বলে রহস্যটার একটা সমাধান করে ফেলতে চায়। 'আর কেউ আছে?'

'শশশ!' ঢোঁটে আঙুল রেখে কিশোরকে আন্তে কথা বলতে ইঙ্গিত করল ফারিহা। ফিসফিসিয়ে বলল, 'শধু জুন। ঘুমিয়ে আছে।'

এই সময় ঘরে ঢুকল রবিন।

'সরি। দেরি হয়ে গেল। গাড়িটা ট্রাবল দিচ্ছিল।' পুরানো ফোন্টওয়াগনটা বিক্রি করে দিয়ে আরেকটা গাড়ি কিনেছে রবিন। লম্বা, একহারা শরীর। গায়ের কটন সোয়েটারটা খুলে গলায় পঁচিয়ে রেখেছে। কয়েক বছর আগেও সে ছিল রোগাটে, হালকা পাতলা এক কিশোর। পায়ে চোট পেয়েছিল। পাহাড়ে চড়তে গিয়ে ভেঙে ফেলেছিল হাড়। সেটা বড় যন্ত্রণা দিত মাঝে মাঝে। এখন সব সেরে গেছে।

অনেক বদলে গেছে রবিন। লম্বা হয়েছে। গায়ে মাংস লেগেছে। চেহারায় চাকচিক্য। ধোপদুরস্ত পোশাক পরে। চাকরি করে বার্টলেট লজের ট্যালেন্ট এজেন্সিতে। কারাতের ট্রেনিং নিচ্ছে। ওকে দেখলে কেউ এখন কল্পনাই করতে পারবে না এই রবিন মিলফোর্ডই পার্ট টাইম চাকরি করত রকি বীচের লাইব্রেরিতে, আর বইয়ে মুখ গুঁজে থাকত। রকি বীচ হাই স্কুলে মেয়েমহলে রবিন এখন একটা পরিচিত প্রিয় নাম।

'কোথায় আমাদের কেস?' হেসে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ডানা মেলে উড়ে গেল না তো চিকেন প্রিসেস?'

'কেস ওই পর্দার আড়ালে,' মাথা নেড়ে পর্দাটা দেখিয়ে দিল মুসা। 'ওর সঙ্গে

কথা বলতে পারিনি আমরা।'

'চেষ্টা করলে কিশোর পারবে,' হেসে বলল রবিন। 'তবে যুক্তি দেখাতে গেলে মুখ খুলবে কিনা...'

'খোলার অবস্থাতেই নেই এখন,' নিচু গলায় বলল ফারিহা। 'অন্তত শান্ত তো হয়ে আছে। কাল রাতে যা করেছে না! কয়েকজন লোকও এসেছিল দেখা করতে।'

'রাত দুপুরে!' অবাক হলো কিশোর। 'লাল চুলওয়ালা ওই নার্সের চোখ এড়াল কিভাবে?'

শ্বাগ করল ফারিহা। 'রহস্যময় ব্যাপার, তাই না?'

'কারা ওরা?'

ঘণ্টায় ঘণ্টায় এসেছে চিকেন লারসেন। গোটা দুই ছীন কুপনও দিয়েছে আমাকে।'

'সবাইকেই খালি কুপন বিলাছে। আর কে এসেছে?'

টম হামবার নামে একটা সুন্দর লোক।

'নাম জানলে কি করে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'কেন, গোয়েন্দা কি শুধু তোমরাই?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল ফারিহা। 'জিজ্ঞেস করেছিলাম। জুনের বয়ফ্রেণ্ড ছিল এক সময়। তোর চারটের দিকে এসেছিল সে। জুনের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। যেন পাহারা দিচ্ছিল ওকে। তারপর তোরবেলা এল আরেকজন। নাম বলল হেনো তানজামিলা। জুনের ক্লেজ হোটেলের নাকি রুমমেট সে।'

'হঁয়ে,' মাথা দোলাল কিশোর। 'ওর কথা ভুলে যেতে পারি আমরা।'

'কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'কারণ, জুন বলেছে লোকটা খাবারে বিষ মেশাছে। আর ওই টমকে নিয়েও মাথাব্যথা নেই আমার। একজন ডৃতপূর্ব বয়ফ্রেণ্ড লাখ লাখ লোক মারার প্ল্যান করবে বলে মনে হয় না।'

'প্রতিশোধ নিতে চাইলেও না?'

'লাখ লাখ লোকের ওপর কিসের প্রতিশোধ নেবে?'

'আগেই তর্ক শুরু করে দিলে,' বাধা দিয়ে বলল ফারিহা। 'চার নম্বর রহস্যময় লোকটার কথা তো এখনও শোনোইনি।' কঠিন্বর যতটা সম্ভব খাদে নামিয়ে রাখার চেষ্টা করছে সে।

জুনের বিছানা ঘিরে টানানো পর্দার দিকে তাকাল চারজনে। যেন শিওর হতে চাইছে, জুন জেগে গেছে কিনা। তারপর লোকটার কথা বলতে লাগল ফারিহা, 'চার নম্বর ভিজিটরটি একজন লোক বটেন! ভীষণ বদমেজাজী। বয়েস তিরিশ মত হবে। বেশ তাগড়া শরীর। একটা আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট গায়ে দিয়ে এসেছিল। আমার ওপর চোখ পড়তেই জ্যাকেটের কলার তুলে নিয়ে মুখ আড়াল করে ফেলল। হতে পারে, চেহারাটা বেশি কুৎসিত, সে জন্যেই দেখাতে চায়নি।'

'নাম জিজ্ঞেস করেছে?' মুসা জানতে চাইল।

'করেছি। শয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চুপ থাকতে বলল। ধরক দিয়ে

বলল, আমি ওর নাম জেনে কি করব? তারপর জুনের বিছানার চারপাশের পর্দাটা টেনে দিল যাতে আমি কিছু দেখতে না পারি।'

'তারপর?' জিজেস করল কিশোর।

'নানারকম খুটুরখাটুর শব্দ শুনলাম। মনে হলো, জুনের ওপাশে যতগুলো ড্রয়ার আছে সব খুলে খুলে দেখেছে।'

'তাড়াহুড়ো করে, না আস্তে আস্তে?'

'তাড়াহুড়ো করে।'

হাসল কিশোর। 'তারমানে আন্দাজে কিছু করতে আসেনি। যা করতে এসেছে, জেনে বুঝেই এসেছে। কি খুঁজছিল, জানে।'

'কিন্তু পায়নি। খালি হাতে ফেরত যেতে দেখেছি।'

পায়চারি শুরু করল কিশোর। 'জুন না জাগলে আর কিছুই জানা যাবে না।'

'আর জাগলে যেন ভিজিটিং আওয়ারে জাগে,' মুসা বলল মুখ বাঁকিয়ে। 'নইলে যে নার্সের নার্স। একেবারে দজ্জাল। একটা মূহূর্তও আর থাকতে দেবে না আমাদেরকে।।'

জুনের পর্দার কাছে গিয়ে উকিবুকি দিতে আরম্ভ করল রবিন। 'অবস্থা খুব একটা খারাপ লাগছে না। খবরের কাগজগুলো মন্তব্য করছে, বেঁচে যে আছে এটাই ভাগ্য। অ্যাক্সিডেন্টে গাড়িটার নাকি সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে,' ঘুরে দাঁড়াল সে। 'দুর্ঘটনার জায়গাটা দেখেছ?'

মাথা নাড়ল কিশোর। একভাবে পায়চারি করে চলেছে। এই সময় একগোছা ফুল নিয়ে ঘরে চুকল লাল চুলওয়ালা নার্স।

প্রথমে ফারিহার দিকে তাকাল সে, তারপর এক এক করে তিন গোয়েন্দার দিকে। 'তিনটে ছেলে!' ফারিহার দিকে আবার তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'এত বস্তু জুটিয়েছ কেন? রোগ না সারিয়ে আরও তো বাড়াবে। এতজনে দেখতে আসার কোন দরকার আছে?' জুনের বিছানার কাছে ফুলগুলো রেখে দরজার দিকে এগোল সে। বেরোনোর আগে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আবার আসব আমি,' যেন হ্মকি দিয়ে গেল।

'কেন আসবে?' নার্স বেরিয়ে যাওয়ার পর বিড় বিড় করে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল মুসা।

'ইন্টারেসেটিং,' রেখে যাওয়া ফুলগুলো দেখতে দেখতে বলল রবিন। 'হেনরি অগাস্টাস পাঠিয়েছে।'

'তাতে ইন্টারেসেটিংের কি হলো?' মুসা জিজেস করল।

কারণ, অগাস্টাস রেস্টুরেন্টের মালিক সে। চিকেন লারসেনের প্রতিযোগী।'

'তৃতীয় জানলে কি করে? তোমার আর কিশোরের কাছে তো কোন রেস্টুরেন্টেরই কোন মূল্য নেই।' আগের রাতে কুপন ছিঁড়ে ফেলার পর থেকেই বিরক্ত হয়ে আছে মুসা। রাগটা ঝাড়ল এখন।

হেসে ফেলল রবিন। 'মনে হচ্ছে তোমার খাওয়ায় বাদ সেধেছে কিশোর? ফ্রী কুপন দিয়ে গিয়েছিল নাকি চিকেন লারসেন?'

‘দিয়েছিল,’ কিশোর জানাল। ‘আজেবাজে জিনিস খেয়ে পেট নষ্ট হয়। সে জন্যে ফেলে দিয়েছি। আর কেউ কিছু মুফতে খেতে দিলেই খেতে হবে নাকি?’

শব্দ করে হাসল রবিন। মুসার রাগের কারণ এখন পরিষ্কার। ওর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘না, রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে হেনরির সঙ্গে পরিচয় হয়নি। অগাস্টাস রেস্টুরেন্টের শুভ উদ্বোধনী দিনে একটা ব্যাণ্ড পার্টি পাঠাতে হয়েছিল আমাকে। আমিও গিয়েছিলাম সঙ্গে। টাইম যখন দিয়েছিল তার অনেক পরে এসেছিল হেনরি। ওকে ছাড়া কাঞ্চ শুরু করা যায়নি। ঝাড়া চারটে ঘন্টা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল আমাদের।’

‘শুরুর মেয়েকে ফুল পাঠাল কেন কিছু আন্দাজ করতে পারো?’

‘ওরকম করেই থাকে হেনরি। ব্যবসার কোন ট্রিকস হবে। তবে লোকটাকে বোধহয় তোমারও পছন্দ হবে না। শুনেছি, হেনরি আর চিকেন একজন আরেকজনের ছায়া দেখতে পারে না। লারসেন মরে গেলে তার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হত না। মুখেও বলে সেকথা। লারসেন অতটা খারাপ লোক নন। মুখে কিছু বলেন না বটে, তবে অন্তরের ইচ্ছা একই হবে।’

‘যাক,’ বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতে ঘুসি মারল মুসা। ‘সন্দেহ করার মত কয়েকজন পাওয়া গেল।’

‘তা গেল,’ বলল কিশোর। ‘কিন্তু কোন অপরাধ তো ঘটেনি। সন্দেহ করে কি হবে?’

এই সময় দরজা খুললেন চিকেন লারসেন। ঘরে এত লোক দেখে যেন বরফের মত জমে গেলেন। তবে এক সেকেণ্ডের জন্যে।

তাঁর মুখের দিকে তাকাল কিশোর। গোলগাল চেহারা? চোখের কোণে কালি কেন? মেয়ের জন্যে দৃশ্টিভায়? নাকি উন্মাদের দৃষ্টি? পাগলের চোখেও ও দৃষ্টি দেখেছে সে। খাবারে বিষ মিশিয়ে লাখ লাখ মানুষকে মেরে ফেলার কথা তার মেয়ে বলে ফেলেছে বলেও দৃশ্টিভা হতে পারে। কোনটা?

দরজায় দাঁড়িয়েই তিনি বললেন, ‘আমি আমার মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই। সুযোগ পাব?’

অনিষ্টা সত্ত্বেও বেরোতে হলো তিনি গোয়েন্দাকে। ‘চলে এল হলঘরে। চারপাশে একবার চোখ বোলাল কিশোর। তারপর হলের মাঝে নার্সরা যেখানে বসে সেদিকে এগোল। ডেক্সের পেছনে মাত্র একজন নার্স রয়েছে। সেই লাল চুলওয়ালা মহিলা। তার নেমট্যাগে লেখা রয়েছেঃ মারগারেট ইলারসন, আর এন।

‘শুনুন,’ মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর। ‘কাল রাতে এখানে কে ডিউটিতে ছিল বলতে পারবেন?’

‘অবাক কাণ্ড! ভুরু কুঁচকে ফেলল মারগারেট, তুমি জিজ্ঞেস করার কে? শুনতে চাও? আমি ছিলাম। আমি। আরেকজন যার ডিউটিতে থাকার কথা, সে হঠাৎ করে বিয়ে করে বসেছে। কাজেই দিনরাত এখন আমাকে ডিউটি দিতে হচ্ছে। একটানা চবিশ ঘন্টা।’

হাসল কিশোর। তাতে উত্তেজনা মিশে আছে। ‘তাই নাকি। তাহলে তো জুন খাবারে বিষ

ଲାରସେନକେ ଯାରା ଯାରା ଦେଖିତେ ଏସେହେ ସବାର କଥାଇ ବଲତେ ପାରବେନ । ଓର ବାବା ବାଦେ ଆର ଯେ ତିନଙ୍ଜନ ଏସେଛିଲ ।'

ମାଥା ନାଡ଼ିଲ ମାରଗାରେଟ । 'ନା । ରୋଗୀର ପାରିବାରିକ ବ୍ୟାପାରେ ବାଇରେର ଲୋକେର ନାକ ଗଲାନୋ ନିଷେଧ ।'

ଆଲାପ ଶେଷ । ଯହିଲାର ଚୋଥ ଦେଖେଇ ସେଟୋ ଆନ୍ଦାଜ କରତେ ପାରଲ କିଶୋର । ଏକଟାନା ଡିଉଟି ଦିଯେ ଝାନ୍ତ ହେଁ ଆହେ ମାରଗାରେଟ । ମୁଖ ଗୋମଡ଼ା କରେ ରେଖେଛେ । ତାହାଡ଼ା କଥା କମ ବଲା ହୁଭାବ । ମେଜାଜ ଭାଲ ଥାକଲେବେ ବଲତ ନା । ଏଥିନ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନାଇ ଓଠେ ନା । ଜୋରେ ଏକଟା ନିଃଶ୍ଵାସ ଫେଲେ ଆରେକ ଦିକେ ତାକାଳ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରାପ୍ରଧାନ ।

ଏଗିଯେ ଏସେହେ ରବିନ । ଲାଲଚେ ଚାଲେ ହାତ ବୁଲିଯେ ବଲଲ, 'ମ୍ୟା'ମ, ବ୍ୟାପାରଟା ଜରୁରୀ ।'

କଡ଼ା ଚୋଥେ ତାକାଳ ମାରଗାରେଟ । ବିନିମୟେ ମିଟି ଏକଟା ହାସି ଦିଲ ରବିନ । ତାରପର ଭଦ୍ର କଷ୍ଟେ ବଲଲ, ଟ୍ୟାଲେନ୍ଟ ଏଜେଞ୍ଚିଟେ ଯେ ଭାବେ ମକ୍କେଲଦେର ପଟାୟ ସେଭାବେ, ଚରିଶ ଘଣ୍ଟା ଡିଉଟି ! ଏ ତୋ ଅମାନବିକ । ନାହ୍, ଆପନାର ଜନ୍ୟ ମାୟାଇ ଲାଗଛେ ଆମାର ।'

ଚୋଥେର ଦୃଷ୍ଟି ସାମାନ୍ୟ ନରମ ହଲୋ ମହିଳାର । ରବିନେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଯେନ ସିନ୍କାନ୍ତ ନେଯାର ଚେଷ୍ଟା କରଛେ, ଭାଗିଯେ ଦେବେ ନା କଥା ବଲବେ । ଏତ ଭାଲ ଏକଟା ଛେଲେର ସଙ୍ଗେ ଦୂର୍ବ୍ୟବହାର କରା ଉଚିତ ହବେ ନା ଭାବେଇ ବୋଧହୟ ଶେଷେ ବଲଲ, 'ତିନଙ୍ଜନ ତୋ ନୟ, ଦୁଃଜନ ଏସେଛିଲ । ଏକଟା ଛେଲେ, ଆର ଏକଟା ମେଯେ ।'

'କେନ, ଆମି ଜ୍ୟାକେଟ ପରା ଲୋକଟା ?' ଜାନତେ ଚାଇଲ କିଶୋର । 'ଆସେନି ?'

ବିଶ୍ୱଯ ଫୁଟଲ ମାରଗାରେଟେର ଚୋଥେ । 'ଆମି ସାଫ ମାନା କରେ ଦିଯେଛିଲାମ, ଚୁକତେ ପାରବେ ନା । ଆର ବୋଲୋ ନା ! ଲୋକଟାକେ ଦେଖଲେଇ ଗା ଶିରଶିର କରେ । ଉୟାପୋକା ଦେଖଲେ ଯେମନ କରେ !'

'କେନ ?' ରବିନେର ପ୍ରଶ୍ନ ।

'ଦେଖିତେଇ ଜାନି କେମନ । ଏକେର ପର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଚଲଲ । ଜବାବ ଦିତେ ଦିତେ ମାଥା ଖାରାପ ହେଁ ଯାଓୟାର ଜୋଗାଡ଼ ଆମାର । ଆର କି ସବ ପ୍ରଶ୍ନ !'

'ଯେମନ ?' କିଶୋର ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ ।

'ଯେମେଟା କି ବାଁଚବେ ? ଯେନ ମରେ ଗେଲେଇ ଖୁଶି ହୟ । ଓର ଜିନିସପତ୍ରଗୁଲୋ କୋଥାଯ ରେଖେଛେ, ଏକଥାଓ ଜାନତେ ଚାଇଲ । ଆରଓ ନାନା ରକମ କଥା । ଲାରସେନ ପରିବାରର ଲୋକ ବଲେ ମନେ ହଲୋ ନା ଓକେ ।'

'ଚେହାରାଟା ଦେଖେଛେ ଭାଲ କରେ ?' ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ ରବିନ ।

ମାଥା ନାଡ଼ିଲ ମାରଗାରେଟ । 'ଲୋକେର ମୁଖେର ଦିକେ କଥନୋଇ ଭାଲ କରେ ତାକାଇ ନା ଆମି । କେବଳ ତାର ଜ୍ୟାକେଟ ଆର କଥାଗୁଲୋ ମନେ ଆହେ । ବଦମେଜାଜୀ ଯେ ଏଟୁକୁଣ୍ଡ ବୁଝାତେ ପେରେଛି । ତବେ ତାର ଚେହାରା ବଲତେ ପାରବ ନା ।'

'ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପନାକେ ।'

ସରେ ଏଲ ତିନ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ର । କିଶୋର ବଲଲ, 'ଧରା ଯାକ, ଲୋକଟାର ନାମ ମିଟାର ଏକୁ । ଏଥି ଏହି ଏକ୍ସକ୍ରିପ୍ଶନ ବିଶେଷ ସୁବିଧେର ଲାଗଛେ ନା ଆମାର । ସନ୍ଦେହ ଜାଗାନୋର ମତ ଚରିତ । ଜୁନ ହୟତେ ଜାନତେ ପାରେ ଲୋକଟାର ଆସଲ ପରିଚୟ । ଚଲୋ, ଝମେ ଯାଇ ।'

দেখি, জাগল কিনা।'

'অ্যাই, ছেলেরা,' ওদের কথা শুনে ফেলেছে মারগারেট। 'জুনের অবস্থা কিন্তু খারাপ। ঘূম দরকার। ওর জাগতে সময় লাগবে।'

তাহলে আর গিয়ে লাভ নেই। অহেতুক বসে থাকা। তার চেয়ে কাজের কাজ যদি কিছু করা যায় সেই চেষ্টা করল ওরা। মুসা রয়ে গেল হাসপাতালে। ফারিহাকেও সঙ্গ দেবে, জুনের কাছে কারা কারা আসে দেখবে, আর ওর ঘূম ভাঙে কিনা খেয়াল রাখবে। কিশোর আর রবিন চলল রকি বীচ পুলিশ স্টেশনে, চীফ ইয়ান ফ্রেচারের সঙ্গে কথা বলতে।

আরেকটা ফোর্ডওয়াগনই কিনেছে রবিন। গোবরে পোকার মত এই গাড়িগুলোই যেন তার বিশেষ পছন্দ। তার বক্সব্য, এই গাড়ি নাকি পথেঘাটে বক্ষ হয়ে বিপদে ফেলে না। যাই হোক, সেটা পরীক্ষার ব্যাপার। এই গাড়িটার রঙও আগেরটার মতই, লাল। সে বসল ড্রাইভিং সীটে। পাশের প্যাসেজার সীটে বসল কিশোর।

থানায় পৌছতে বেশিক্ষণ লাগল না। চীফ আছেন। ছেলেদের সঙ্গে দেখা করার ফরসত আছে তাঁর আপাতত। ওরা তুকে দেখল, লাধু প্যাকেট খুলছেন তিনি। চিকেন লারসেনের হাইড চিকেন।

'খাবে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'থ্যাংকস,' বলে হাত বাড়াল রবিন। তুলে আনল সোনালি মাখন মাখানো এক টুকরো মাংস।

কিশোরের দিকে তাকালেন চীফ। 'নাও?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল কিশোর। খামচে ধরেছে চেয়ারের হাতল। যেন বিষ মাখানো খাবার খেতে দেখছে দু'জনকে।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলেন ফ্রেচার। 'কোন কারণ ছাড়া তো নিচয় আসনি। কি কেস?' একটা রান তুলে নিয়ে কামড় বসালেন তিনি। চিবাতে লাগলেন আরাম করে।

'জুন লারসেনের অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারে জানতে এলাম,' জবাব দিল কিশোর।

'ওতে কোন রহস্য নেই,' মুখ ভর্তি মুরগীর মাংস নিয়ে কথা বলায় স্পষ্ট হচ্ছে না কথা। কাজেই গিলে নিলেন চীফ। 'বৃষ্টির মধ্যে কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছিল। পাহাড়ী পথে এরপর যা হবার তাই হয়েছে।'

'অস্বাভাবিক কিছু নেই এর মধ্যে?'

দুটো প্রশ্ন জেগেছে আমার মনে। তবে অনেক দুর্ঘটনার বেলাতেই এটা ঘটে। অপরিচিত একজন ফোন করে খবরটা দিল। ওই লোকটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি আমরা। অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটতে দেখে থাকতে পারে। তাতে কোন রহস্য নেই। কিন্তু নাম বলল না কেন? আরেকটা ব্যাপার। দুই সেট চাকার দাগ ছিল। একসেট জুনের গাড়ির। সোজা রাস্তা থেকে নেমে গেছে। আরেকটা সেট ছিল তাঁর পাশে। যেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, তার কাছ থেকে আরও খানিকটা নিচে

নেমে গেছে।'

কি ঘটেছিল, অনুমান করার চেষ্টা করল কিশোর। দুটো গাড়ি আসছিল। একটা আগে, আরেকটা পেছনে। একটা জুনের গাড়ি। অন্যটা কার? নিচের ঠোটে চিমটি কাটতে আরম্ভ করল সে। ভিন্ন একটা দৃশ্য ফুটতে শুরু করেছে মনের পর্দায়।

'স্যার,' ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল সে, যেন নিজেকেই বোঝাল। 'একটা সঙ্গাবনার কথা কি ভেবেছেন আপনি? এমনও তো হতে পারে, জুন লারসেনকে তাড়া করেছিল কেউ?'

## তিনি

'তাড়া করেছিল?' কোন্ত ড্রিংকের গ্লাসটা তুলে নিয়েছিলেন চীফ, আস্তে করে নামিয়ে রাখলেন আবার সেটা। 'কি ভাবছ তুমি, কিশোর, বলো তো? অতি কল্পনা করছ না তো?'

'একটা সঙ্গাবনার কথা বললাম, স্যার, হতেই তো পারে,' সামনে ঝুকল কিশোর। 'ধৰ্মন, পাহাড়ী পথ ধরে নামছেন আপনি। জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। আপনার সামনের গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছলে গেল। রাস্তা থেকে সরে গিয়ে পড়তে শুরু করল। আপনি তখন কি করবেন?'

চীফ বলার আগেই বলে উঠল রবিন, 'অবশ্যই ব্রেক করব, যত জোরে পারি। থামানোর চেষ্টা করব আমার গাড়িটা। কিড করে যতটা যাওয়ার যাবে গাড়ি, তারপর থেমে যাবে।'

'যেখানে দ্বিতীয় সেট চাকার দাগ দেখেছি সেখানে,' রবিনের সঙ্গে একমত হলেন চীফ।

'তারপর কি করবে?' রবিনকে প্রশ্ন করল কিশোর।

'তারপর পিছিয়ে নিয়ে যাব আমার গাড়িটাকে। যাতে ওটাও আগেরটার মত পিছলে পড়তে না পারে। এবং তারপর যাব আগের গাড়িটার কি অবস্থা হয়েছে, লোকজন বেঁচে আছে কিনা দেখার জন্যে।'

'ঠিক তাই,' সন্তুষ্টির হাসি হাসল কিশোর। 'দ্বিতীয় গাড়িটা কি তা করেছে? সাহায্য করতে গেছে জুনকে? বেঁচে আছে কিনা অন্তত সেটুকু দেখার চেষ্টা কি করেছে?'

'না,' স্বীকার করলেন চীফ। 'যা প্রমাণ পেয়েছি, তাতে ওরকম কিছু করেনি। পথের পাশে নরম মাটি ছিল। বৃষ্টিতে ভিজে কাদা হয়ে গিয়েছিল। ওখানে চাকার দাগ পাইনি। জুতোর দাগ পাইনি। কেউ নামলে জুতোর দাগ পড়তাই। আমার বিশ্বাস, প্রথম গাড়িটাকে পড়তে দেখে গাড়ি থামিয়েছিল বটে দ্বিতীয় গাড়িটা, তবে চূপ করে বসে ছিল ওটার আরেহী।'

'তাহলে কে সেই মানুষ?' কিশোরের প্রশ্ন। 'যে একটা গাড়িকে পড়ে যেতে দেবেও সাহায্যের হাত বাড়ায়নি? বেচারা ড্রাইভারের কি হলো, তা পর্যন্ত দেখার

চেষ্টা করেনি?’ নিজেই জবাব দিল প্রশ়ঙ্গলোর, ‘হতে পারে, সেই লোক জুন লারসেনকে তাড়া করেছিল। গাড়িটা পড়ে যাওয়ায় খুশিই হয়েছিল। মেয়েটা মরেছে না বেঁচে আছে সেটা দেখারও প্রয়োজন বোধ করেনি।’

‘ভাল বলেছ,’ চীফ বললেন। ‘তথ্য-প্রমাণ কিছু দেখাতে পারবে?’

‘সেই চেষ্টাই করব,’ উঠে দাঁড়াল কিশোর। ‘দেখি, বের করতে পারি কিনা। রবিন, এসো।’

দরজার কাছে যাওয়ার আগেই ওদেরকে ডাকলেন চীফ। ‘বেশি কষ্ট করার দরকার নেই। জুন বেঁচেই আছে। ও জেগে গেলেই ওর মুখ থেকে সব শুনতে পারব আমরা।’

ঠিকই বলেছেন চীফ। কি ঘটেছে জানার জন্যে তদন্তের প্রয়োজন নেই। কেউ তাকে অনুসরণ করছিল কিনা, হয়তো লক্ষ্য করেছে জুন। আর তাড়া করে থাকলে তো কথাই নেই। এমনও হতে পারে, ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে ওর গাড়ি। হতে পারে, যে ফেলেছে, সেই লোকই খাবারে বিষ মিশিয়ে লাখ লাখ লোককে মারার ফন্দি করেছে।

সব প্রশ্নের জবাবই হয়তো আছে জুনের ঘুমন্ত মাথায়। এখন শুধু তার ঘুম ভাঙার অপেক্ষা। তারপরই জবাব পেয়ে যাবে তিন গোয়েন্দা।

কিন্তু আসল কথাটা হলো, জাগার পর সত্যি কথাগুলো বলবে তো জুন? যদি তার বাবা এসবে জড়িত থাকেন? বলবে? বাবাকে বাঁচানোর জন্যে মুখ বুজে থাকবে না?

থানা থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল দুই গোয়েন্দা। বিদে টের পেল কিশোর। সে কথা বলল রবিনকে।

‘ভুল করলে তো না খেয়ে,’ রবিন বলল। ‘উক্তার তো কত কথাই বলবে। কত কিছু নিষেধ করবে। সব শুনলে কি চলে?’

‘বলাটা সহজ,’ মুখ কালো করে বলল কিশোর। ‘পেটের যে কি অবস্থা হয়েছিল আমার, তোমার হলে বুঝতে। কি কষ্টাই যে করেছি! এখন খাবার দেখলেই বিষ মনে হয় আমার।’

‘পেট যখন আছে, ফুড পয়জনিং হবেই। সবারই হয়। তাই বলে কি খাওয়া হচ্ছে দেব?’

‘তা কি দিয়েছি নাকি? বেছে বেছে খাচ্ছি। আর এতে বেশ ভালই লাগছে আমার। পেটে আর কোন অশান্তি নেই।’

‘আচ্ছা, বাদ দাও ওসব কথা। তোমার যা ইচ্ছে খেয়ো। এখন কি করব, বলো।’

‘কাজ একটাই করার আছে। কোন লোকটা জুনকে ফলো করেছিল, তাঁকে খুঁজে বের করা। কাল রাতে হাসপাতালে যে তিনজন দেখতে এসেছিল তাদের একজনও হতে পারে।’

‘টম, হেনা, আর মিষ্টার এক্স, এই তিনজনের একজন?’

‘হ্যাঁ। হেনরি অগাস্টাসের ব্যাপারেও খোজ নিতে হবে আমাদের, লারসেনের

খাবারে বিষ

শক্ত যখন। হেডকোয়ার্টারে ফিরে কম্পিউটারেই সেটা করার চেষ্টা করব। জিনিসটা যখন কিনলামই, কাজে লাগাই। ডাটাসার্ভ খোঁজ করে ওদের বিজনেস ফাইলগুলো বের করে নেব। দেখি, হেনরি আর তার রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে কি তথ্য দেয় কম্পিউটার। ওদের ডাটাবেজ হলো দি ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল। তথ্য জানাতেও পারে।'

'তুমি তো কম্পিউটার নিয়ে বসবে। আমি...'

'জানার চেষ্টা করবে, কাল রাতে হাসপাতালে জুনকে দেখতে আসার আগে কোথায় কি করেছে টম।'

'মাপ চাই। সময় নেই আমার। এজেন্সিতে যেতে হবে।'

'বেশ। তাহলে মুসাকে ফোন করে বলো, ও-ই চেষ্টা করুক। অহেতুক ফারিহার সঙ্গে বসে বসে বকবক করার চেয়ে একটা কাজ অন্তত করুক।'

'বেশ। হেন আর মিষ্টার এক্সের ব্যাপারে কি হবে?'

'হেনার ব্যাপারে আমার মাথাব্যথা নেই,' কিশোর বলল। 'ওর কোন মোচিভ আছে বলে মনে হয় না। তবু, ওকেও একবার ফোন করব সময় করে। আর মিষ্টার এক্সেকে এভাবে খুঁজে বোধহয় বের করতে পারব না। সে এসবে জড়িত থাকলে এক সময় না এক সময় দেখা আমাদের হয়েই যাবে।'

অনেক খিদে পেয়েছে কিশোরের। শুড়ণ্ড করছে পেটের ভেতর। রবিনকে অনুরোধ করল সুপারমার্কেটে নিয়ে যেতে। কিছু ফল কিনল কিশোর। গাঢ়িতে এসে বসে খেতে শুরু করল। ইয়ার্ডের দিকে গাঢ়ি চালাল রবিন। কিশোরকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে গোম তার কাজে। অফিসে গিয়ে মুসাকে ফোন করে জানাল কিশোর কি করতে বলেছে।

বিশেষ শুরুত্ব দিল না মুসা। কাজেই ফারিহার কাছ থেকে উঠতে উঠতে অঙ্ককার হয়ে গেল। তখন আর টমের ঠিকানা খুঁজে বের করার সময় নেই। অত অঙ্ককারে কে একটা গোবেচারা বয়ক্রেণ্ডের ঠিকানা খোজার মত ফালতু কাজ করতে যায়? রোববারের আগে আর কাজটা করতে পারল না মুসা। গাঢ়ি এনে রাখল লরেল স্ট্রীটে, ২৮ নম্বর বাড়ির সামনে, যেখানে বাস করে টমাস হামবার।

যদি বীচের কয়েক মাইল উত্তরে মেলটনের শান্ত সুন্দর পরিবেশে বাড়িটা। পথের পাশে একসারি সাদা কাঠের বাড়ি। সামনে চওড়া বারান্দা আর ছোট আঙিনা।

টমাসদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরানো বনেভিল কনভারটিবল গাঢ়ি। বারান্দার রেলিঙের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে সোনালি চুলওয়ালা এক তরুণ। পরনে রঙচটা নীল জিনস, গায়ে সাদা টি-শার্ট। মুসা আঙিনায় চুক্তেই লাফ দিয়ে রেলিং থেকে নামল সে।

'এসো!' চিৎকার করে ডাকল সে। এক হাত সামনে বাড়ানো, আরেক হাত পিঠের পেছনে। 'দিনটা মাটি হতে বসেছিল আমার! তুমি আসাতে সেটা আর হলো না!' মুসা বারান্দার কাছাকাছি যেতেই পেছনের হাতটা সামনে চলে এল। শক্ত করে ধরা একটা মোটর সাইকেলের চেন।

ব্যাপার কি? গতি বেড়ে গেল মুসার হৃৎপিণ্ডের। হঠাৎ করে, কোন কারণ ছাড়াই একটা উন্নাদ হামলা করতে আসছে কেন তাকে! চেনের একটা মাথা হাতে পেঁচানো, আরেক মাথা ঝুলছে সাপের লেজের মত। স্থির হয়ে গেছে মুসা। কারাতের কৌশল ব্যবহার করবে? না পিছিয়ে যাবে?

‘এবার শুধু তুমি আর আমি,’ লোকটা বলল। ‘এই তো চেয়েছিলে, তাই না?’  
বলেই শপাং করে বাঢ়ি মারল কাঠের রেলিঙে।

না, কারাতের কথা ভুলে যাওয়াই উচিত। ওই চেনের এক বাঢ়ি মাথায় লাগলে সাতদিন হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে। পিছাতে শুরু করল সে।

‘শিক্ষা আজ ভাল করেই দিয়ে দেব!’ চিংকার করে উঠল আবার লোকটা। লাফিয়ে বারান্দা থেকে আঙিনায় নামল। বেশি বড় শরীর না। অর্থাৎ গায়েগতরে মুসার চেয়ে ছোট। খাটোও, স্বাস্থ্যও খারাপ। কিন্তু চিংকার করছে গলা ফাটিয়ে, আর মাথার ওপরে তুলে বন্ধন করে ঘোরাছে চেনটা।

‘আপনি ভুল করছেন,’ মুসা বলল। সে পিছাছে আর লোকটা এগোচ্ছে। লোকটার পায়ে চামড়ার বুট। গরিলার মত বাঁকা করে রেখেছে কাঁধ।

‘আপনি কি ভাবছেন বুঝতে পারছি না,’ মুসা বলল আবার। ‘আমি এসেছি ট্যামস হামবারের খোঁজে,’ মারিয়া হয়ে উঠেছে সে। ‘আমি জুন লারসেনের বন্ধু।’

থমকে গেল কালো বুট। থেমে গেল চেনের পাক।

‘সত্যি বলছ?’ লোকটা বলল।

‘কসম,’ মাথা ঝোকাল মুসা। সতর্ক রয়েছে। লোকটা হঠাৎ আক্রমণ চালালে যাতে ঠেকাতে পারে।

‘সরি,’ চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফোঁস করে ছাড়ল লোকটা। টিল হয়ে গেল যেন সমস্ত শরীর। ‘আমিই ট্যামস হামবার। জুলিয়ে খাচ্ছে আমাকে। চুরি করে বাঢ়িতে চুকে পড়ে ওরা। ভবয়ুরে। একটা লোক তো শাসিয়েই গেছে সুযোগ পেলেই আমার গাড়িটা চুরি করে নিয়ে যাবে।’

রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা ব্যবহারে বনেভিলটা দেখাল টম।

ওটার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। অবশ্যে হেসে রসিকতা করল, ‘এমনিতেই ওটা দিয়ে দেয়া উচিত। হাহ, হাহ! চাকা তো বসে গেছে। আর যে হারে তেল লিক করছে...’

‘ব্যাটারিও ডাউন হয়ে আছে দুই হণ্ডা ধরে,’ যোগ করল টম। হাসছে সে-ও। ‘তবু, ওদেরকে নিতে দেব কেন? কেড়ে রেখেছি অনেক কষ্টে। ব্যাটারা হাড়-মাস জ্বালিয়ে দিয়েছে আমার। কি বলছি বুঝতে পারছ?’ বারান্দার রেলিঙের দিকে চোখ পড়তে বলল, ‘রেলিংটারই সর্বনাশ করলাম!...হ্যাঁ, জুনের সঙ্গে কি করে পরিচয় হলো তোমার, বলো তো?’

‘আসলে, পরিচয় হয়নি এখনও,’ সত্যি কথাটাই বলল মুসা। ‘আমার বান্ধবী আর ও একই রূমে রয়েছে হাসপাতালে।’

‘ও, হ্যাঁ, দেখেছি একটা মেয়েকে,’ মুসাকে ঘরের ভেতরে ডেকে নিয়ে এল টম। চেন ঘোরাছে না। রাগও দূর হয়ে গেছে চেহারা থেকে। ওকে দেখতে আর

তয়কর লাগছে না তখনকার মত। বরং ভদ্র, শাস্তি একজন কলেজের ছাত্রের মতই লাগছে। ভেতরে আসবাবপত্রের চেয়ে পোষারই বেশি।

‘একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম,’ মুসা বলল। ‘শুক্রবার রাতে অত দেরি করে হাসপাতালে গিয়েছিলেন কেন?’

‘খবরটাই পেয়েছি দেরিতে। জুনের রুমমেট হেনা ফোন করে আমাকে জানাল জুন অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। কয়েক মাস হলো ওর সঙ্গে আর ততটা দেখা হয় না, ঘনিষ্ঠতা নেই। তবু, একসময় তো ছিল, সেই সুবাদেই গেলাম দেখতে। হঁশ ফিরেছে ওর?’

‘না। বেহঁশ ঠিক বলা যায় না, নার্স তাই বলল। গভীর ঘুম বলা যেতে পারে। ডাক্তারের কথা, অনেক বেশি ঘুম দরকার এখন ওর।’

একটা মুহূর্ত আড়চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে রইল টম। হঠাৎ করেই যেন মনে পড়ল, যার সঙ্গে কথা বলছে সে পুরোপুরি অপরিচিত তার। ‘একটা কথা জিজ্ঞেস করি, জুনকে যদি না-ই চেনো, তাহলে এসব প্রশ্ন করছ কেন?’

‘ফারিহা, আমার গার্লফ্্রেণ্ড বলল, অত্যুত একটা কিছু ঘটছে। সেটারই তদন্ত করছি। চিকেন হার্বার্ট লারসেনকে চেনেন?’

‘তাকে চিনব না। জুনের সঙ্গে আমার গোলমালটা বাধানোর জন্যে সে-ই তো দায়ী।’

‘মানে? আপনাকে পছন্দ করতেন না তিনি?’

‘কি করে করবে? সারাক্ষণই তর্ক বেধে থাকলে কি আর পছন্দ করে কেউ? আমি নিরামিষ ভোজী। মাছ খাই না, মাংস খাই না, মুরগীও ভাল লাগে না। খাবার জন্যে প্রাণী হত্যা আমার মতে অপরাধ। আর বেচারা প্রাণীগুলোকে খুন করে যাবা ব্যবসা করে তারা তো রীতিমত অমানুষ। লাগত এসব নিয়েই। শেষ দিকে তো আমাকে দেখলেই জুলে উঠত লারসেন। আন্তে আন্তে এসব নিয়ে জুনের সঙ্গেও কথা কাটাকাটি শুরু হলো আমার। শেষে যখন বলল, গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বাপের ব্যবসা দেখবে জুন, ব্যস, হয়ে গেল। সব খতম। কাটাকাটি।’

‘আরেকটা কথা। ভোর রাত চারটের সময় আপনি হাসপাতালে চুকলেন কি করে? চুক্তে দিল?’

‘নার্সকে মিথ্যে বলেছি আমি। বলেছি, জুনের সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট হয়েছে, এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল টম। ‘কথাটা সত্যি হলে খুশিই হতাম।’

শেষ বিকেলে রবিন আর কিশোরকে তদন্তের ফলাফল জানাল মুসা। স্যালভিজ ইয়ার্ডে রয়েছে তিনজনে। রবিনের ফোক্সি ওয়াগনের ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে সে। কিছু জিনিস খারাপ হয়েছে, যার ফলে গোলমাল করছে ইঞ্জিন, সেটাই দেখছে আর কথা বলছে। ফ্যান বেল্টটা প্রায় বাতিল হয়ে গেছে। বদলানো দরকার। পুরানো বাতিল মালের অভাব নেই ইয়ার্ডে। অন্য একটা ইঞ্জিনের বেল্ট খুঁজে বের করে নিয়ে এসেছে মুসা। লাগিয়ে দিয়ে দেখল চলে কিনা। চলছে। অন্তত আগেরটার চেয়ে ভাল। আঙুল দিয়ে টেনেটুনে দেখে বলল, ‘শ’ দুই মাইল চালাতে পারবে। তারপর চিল হয়ে যাবে। রবিন, নতুন একটা কিনে নিয়ো।’

ওসব ফ্যান বেল্টের কথার ধার দিয়েও গেল না এখন কিশোর। বলল, 'আমার কাছে সব চেয়ে আকর্ষণীয় লাগছে যে ব্যাপারটা, তা হলো, টমের একটা গাড়ি আছে।'

'কিশোর,' রবিন বলল। 'মাঝে মাঝে এত দুর্বোধ্য লাগে না তোমার কথা, কি বলব। মুসা বলছে এক কথা, তুমি চলে গেলে আরেক কথায়। কেন, কারও গাড়ি থাকতে পারে না?'

'মাথায় কথা রাখতে পারো না, সে জন্যেই তোমাদের কাছে এত কঠিন লাগে। কেন, ভুলে গেলে, জুনের গাড়িটাকে তাড়া করেছিল আরেকটা গাড়ি?'

'টমকে বাদ দিয়ে রাখতে পারো। ওর গাড়িটার চলারই ক্ষমতা নেই। টায়ারগুলো বসা। ব্যাটারি ডাউন হয়ে আছে দুই হঙ্গা ধরে।'

'সত্যি কথা না-ও তো বলতে পারে?'

'বলেছে,' জোর দিয়ে বলল মুসা। 'কারণ আমারও সন্দেহ হয়েছিল। তাই ওর প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেছি।'

'ও। তার পরেও আরেকটা ব্যাপার বাকি থেকে যায়। লোকটার মেজাজ ভীষণ খারাপ। তোমাকে যে চেন নিয়ে মারতে এসেছিল, সেটাই তার প্রমাণ।'

আগ করল মুসা। ড্রাইভিং সীটে গিয়ে বসল। ইঞ্জিনের থ্রটল পরীক্ষা করার জন্যে ইগনিশনে মোচড় দিল। মিনিট খানেক ঠিকমতই 'ওঞ্জন' করল ইঞ্জিন, তারপরে বিচ্ছ্র একটা শব্দ করল, মনে হলো বলছে: হঞ্চা-হঞ্চা-গ্যাক!

'এ রকম করছে কেন?' রবিনের প্রশ্ন। হেসে বলল, 'ইঞ্জিনটাকে জিজেস করো তো, এ কথার মানে কি?'

'বলতে চায়, আমাকে কিনে ভুল করেছ। বেচে দিয়ে আরেকটা কেন। আমি বুড়ো মানুষ, আর পারি না।'

'অনুরোধ করো না, আর কটা দিন যেন আমাকে একটু সাহায্য করে। আর কিছু পয়সা জমিয়ে নিই। ওকে মুক্তি দিয়ে দেব।'

'চেষ্টা করলে কিছুটা ভাল হয়তো করা যায়,' মুসা বলল। 'তবে সময় লাগবে। আপাতত এভাবেই চালাও আগামী হঙ্গায় দেখি। তার পর? আমার কথা তো বললাম। কিশোর, হেন তানজামিলা আর হেনরি অগাস্টাসের ব্যবর কি?'

হাসল কিশোর। 'হেনাকে ফোন করেছিলাম। অ্যাস্ক্রিপ্টেটা যখন হয়, তখন আরও ছ'জন লোকের সঙ্গে এলিভেটরে আটকা পড়েছিল। চমৎকার অ্যালিবাই। তবে হেনরি অগাস্টাসের ব্যাপারটা চমকে দেয়ার মত। ব্যবসায়ে চিকেন লারসেনের সব চেয়ে বড় প্রতিপক্ষ সে। দি ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল বলছে, এই কিছুদিন আগে চিকেনের পুরো ব্যবসাটা কিনে নিতে চেয়েছিল হেনরি।'

'তাই? আচর্য!' অবাক হলো রবিন। 'তাহলে তো রাস্তা থেকে ফেলার কথা লারসেনকে। তার মেয়েকে ফেলতে যাবে কেন?'

'জানি না,' গাল চুলকাল কিশোর। 'অন্য ভাবে শাস্তি দিতে চেয়েছে হয়তো লারসেনকে। কিংবা ওর মেয়েকে মেরে ফেলে মন ভেঙে দিতে চেয়েছে। যাতে ব্যবসা নিয়ে আর মাথা না ঘামায় লারসেন।'

খাবারে বিষ

‘লারসেনের মুরগীতে হেনরিই বিষ মেশাচ্ছে না তো?’

‘না-ও হতে পারে। চিকেন নিজেই মেশাতে পারে। আর আরেকজন চরম সন্দেহভাজন লোক তো রয়েই গেছে। সেই লোকটা, যে হাসপাতালে চুকে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছিল। ফারিহাকে নাম বলেনি।’

এই সময় হেডকোয়ার্টারে ফোন বাজতে আরম্ভ করল। ধরতে গেল মুসা।

‘তিন গোয়েন্দা। মুসা আমান বলছি,’ স্পীকারের সুইচ অন করে দিল সে।

ফারিহা ফোন করেছে হাসপাতাল থেকে। মাত্র তিনটে শব্দ উচ্চারণ করল সে। আর তা-ই তিন গোয়েন্দাকে গাড়ির দিকে ছুটে যেতে বাধ্য করার জন্যে যথেষ্ট। সে বলেছে, ‘জুনের ঘূর্ম ভেঙেছে।’

## চার

রবিনের ফোক্সওয়াগনে করে হাসপাতালে ছুটল তিন গোয়েন্দা। ভট্টট ভট্টট করে কোনমতে চলল গাড়ি। যতটা স্পীড দেয়া সম্ভব দেয়ার চেষ্টা করল রবিন। পথে তিনবার বন্ধ হলো ইঞ্জিন। নেমে নেমে ঠিক করতে হলো মুসাকে।

হাসপাতালের সামনে গাড়ি থামতেই লাফিয়ে নেমে পড়ল কিশোর। দিল দৌড়। তার পেছনে ছুটল অন্য দু’জন। অ্যাঞ্জিলিনেটের রাতে কি ঘটেছিল, আজ জানতে পারবে জুনের মুখ থেকে।

‘অ্যাই, যাচ্ছ কোথায়! থাম!’

তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। সেই লাল চুল নার্স, মারগারেট ইলারসন।

‘সরি, যেতে পারবে না,’ আজ আর কর্কশ ব্যবহার করল না। হাসলও মদু। ‘মেয়ের সঙ্গে রয়েছেন মিস্টার লারসেন। ডাক্তার পরীক্ষা করছেন জুনকে। তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে,’ রবিনের দিকে তাকাল। ‘খারাপ না লাগলে আমার এখানেই এসে বসতে পারো।’

হলের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। পাঁচ মিনিট কাটতেই যেন পাঁচটা বছর লাগল। তারপর দশ মিনিট। এই অপেক্ষা যেন পাগল করে দেবে তাকে।

আর বসে থাকতে পারল না। ‘এককোণে নিচু একটা টেবিলে কিছু পত্রপত্রিকা পড়ে আছে। এগিয়ে গেল সেগুলোর দিকে।

‘এত তাড়া কিসের তোমাদের?’ নার্স জিজ্ঞেস করল।

‘আছে। অ্যাঞ্জিলিনেটের ব্যাপারে জানতে চাই,’ ঘূরে দাঁড়িয়ে জবাব দিল কিশোর।

‘কিছুই বলতে পারবে না ও। মনে করতে পারবে না। অ্যামনেশিয়ায় ভুগছে।’

অ্যামনেশিয়া! ওই একটি শব্দই যেন হাজার টনী পাথরের মত আঘাত করল কিশোরকে। এত আশা, এত প্রতীক্ষা, সব যেন নিমেষে অর্থহীন হয়ে গেল।

অবশ্যে জুনের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন লারসেন। বাইরে এলেন

না, দরজায়ই দাঁড়ালেন। পরনে গাঢ় লাল জগিং স্যুট, হলুদ টাইপ দেয়া। বুকের কাছে আঁকা কমলা রঙের মুরগী।

'হাই, হ্যাঁ,' মেয়েকেই বললেন বোৰা গেল। 'কাল আবার আসব। বাড়ি নিয়ে যাব তোকে। কিছু ভাবিসনে। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হেসে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন লারসেন। হাসিটা মুছে গেল পরক্ষণেই। আনমনে বিড়বিড়' করে কি বললেন। মেয়েকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই বোধহয় হাসি হাসি করে রেখেছিলেন মুখ। তিন গোয়েন্দার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটিবারের জন্যেও ফিরে তাকালেন না।

'কি বলছেন শুনতে পারলে হত,' নিচু গলায় বলল মুসা।

'কি যে করি জাতীয় কিছু বললেন বলে মনে হলো,' আন্দাজ করল রবিন।

'চলো,' জুনের ঘরের দরজার দিকে রওনা হলো কিশোর।

বিছানায় উঠে বসেছে জুন। বয়েস উনিশ-বিশ হবে। পিঠে বালিশ টেস দেয়া। এলোমেলো চুল। অনেক সময় একটানা ঘুমানোয় ফুলে আছে মুখ। তবে বড় বড় নীল চোখজোড়া স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার।

'এসেছে,' মুসার দিকে তাকিয়ে যেন ওই একটি শব্দেই হাঁশিয়ার করে দিতে চাইল ফারিহা। রবিন আর কিশোরও বুঝল ওর ইঙ্গিত। জুনের দিকে ফিরল সে, 'জুন, এই হলো আমাদের তিন গোয়েন্দা। ও কিশোর পাশা...ও মুসা আমান, আর ও হলো রবিন মিলফোর্ড।'

'হাই,' খসখসে নিষ্পৃহ কষ্টে বলল জুন। 'তোমাদের কথা অনেক শুনেছি।'

হেসে জিজেস করল রবিন, 'এখন কেমন লাগছে?'

'আর কেমন। মনে হচ্ছে দালানের তলায় চাপা পড়েছিলাম। একটা হাড়ও আন্ত নেই। সারা গায়ে ব্যথা। বাবা যে কাল কি করে বাড়ি নিয়ে যাবে কে জানে।'

'ও কিছু না। ঠিকই যেতে পারবে। কাল সেরে যাবে, দেখ।'

এসব কথা ভাল লাগছে না কিশোরের। আসল কথায় যেতে চায়। কিছুটা অধৈর্য ভঙ্গিতেই ফারিহার বিছানার পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে বসল জুনের বিছানার পাশে। 'তোমার অ্যাঞ্জিলেন্টটার কথা জানতে এসেছিলাম।'

'ফারিহা বলেছে, তোমরা আসবে। তবে আগেই একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমার অ্যামনেশিয়া হয়েছে।'

'কিছুই মনে করতে পারছ না?'

'শেষ কথা মনে করতে পারছি, দু'দিন আগে সকালে আমার বেড়ালটাকে খাইয়ে বাবার অফিসে গিয়েছিলাম। আর কিছু মনে নেই। তবে ডাক্তার ভরসা দিয়েছে এই স্বৃতিবিদ্রূপ সাময়িক। শীত্রি আবার সব মনে করতে পারব। যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে স্বৃতি।'

'আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারি,' রবিন বলল। 'অনেক সময় কথা মনে করিয়ে দিলে মনে পড়ে যায় এসব অবস্থায়।'

'তাহলে অ্যাঞ্জিলেন্টের কথা কিছুই মনে করতে পারছ না?' কিশোর তাকিয়ে রয়েছে জুনের মুখের দিকে। 'তোমার বাবার অফিসে কি জন্যে গিয়েছিলেন?'

‘কলেজ থেকে সবে ব্যবসার ওপর ডিগ্রী নিয়েছি,’ জুন জানাল। ‘তাই বাবার ব্যবসাটায় ঢোকার চেষ্টা করছি। এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেক ডিপার্টমেন্টে ঘূরে বোৰার চেষ্টা করছি। যতই বই পড়ে শিখে আসি না কেন, হাতে কলমে কাজ করাটা অন্য জিনিস।’

‘গত শুক্ৰবাৰে শেষ কোন ডিপার্টমেন্টে চুকেছিলে, কিশোৱ জিজ্ঞেস কৰল, ‘মনে কৰতে পাৰো?’

‘না।’

‘ঘূমেৰ ঘোৱে দুঃহৃদয় দেখে কিছু কথা বলেছ। মনে কৰতে পাৰো?’

মাথা নাড়ল জুন।

রবিন আৱ মুসাৱ দিকে তাকিয়ে কিশোৱ বলল, ‘চলো, বাইৱে গিয়েই কথা বলি।’

হলে বেৱিয়ে এল তিনজনে। ভৌতা গলায় কিশোৱ বলল, ‘কোন লাভ হলো না।’

‘ফারিহা আশা দিয়েছে,’ মুসা বলল। ‘হবে।’

‘হবে না। বসে বসে টেলিভিশন দেখা ছাড়া আৱ কিছু কৰার থাকবে না ওৱ।’

আমাৱ তো এখন মনে হচ্ছে, কোন রহস্যই নেই,’ নিৱাশ কষ্টে বলল কিশোৱ। ‘ফারিহাৰ কথাই আৱ বিশ্বাস কৰতে পাৰছি না।’

‘ও এমনিতেও বাড়িয়ে কথা বলে,’ ফস কৰে বলে বসল রবিন।

ৱেগে গেল মুসা। ‘ওৱ মাথায় আমাৱ চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি। কথা খুব ভাল মনে রাখতে পাৱে। কয়েক মাস আগেও কোন মেয়ে কোন পোশাকটা পৱেছিল, কোন লিপস্টিক লাগিয়েছিল, ঠিক বলে দিতে পাৱে।’

‘খুব ভাল,’ আৱেক দিকে তাকিয়ে বলল কিশোৱ। ‘যদি কোনদিন তিন গোয়েন্দা বাদ দিয়ে তিন ফ্যাশন ডিজাইনাৰ হয়ে যাই, তাহলে ওকে আমাৱেৰ সহকাৰী কৰে নেব।’

ভূৰু কুঁচকে কিশোৱেৰ দিকে তাকিয়ে রইল মুসা।

‘রাগ কোৱো না,’ ওকে বোৱানোৰ চেষ্টা কৱল কিশোৱ। ‘জুন একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট কৱেছে। মাথায় গোলমাল হওয়াটা স্বাভাৱিক। ঘূমেৰ ঘোৱে প্ৰলাপ বকাটা আৱও বেশি স্বাভাৱিক। এখন তো ধৰেছে অ্যামনেশিয়ায়। ওৱ প্ৰলাপ বিশ্বাস কৰে রহস্য খুঁজতে যাওয়াটা কি ঠিক?’

‘কেন, তোমাৱ অনুভূতি কি এখন অন্য কথা বলছে...’

‘অ্যাই, রাখ রাখ,’ হাঁটাৎ সিৱিয়াস হয়ে গেছে রবিন। ‘একটা কথা...’

অবাক হয়ে তাৱ দিকে তাকাল কিশোৱ। ‘কী?’

‘একটা কথা খেয়াল কৱোনি? অ্যাক্সিডেন্টেৰ দিনেৰ কথা শুধু মনে কৰতে পাৱছে না জুন। কেন পাৱছে না? কেন একটা দিন স্মৃতি থেকে মুছে গেল?’

তাই তো! ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল কিশোৱ। তবে মনোযোগ দিতে পাৱল না। চেঁচিয়ে কথা বলছে নাৰ্স মাৰগারেট, ‘আমাৱ কাজ আপনি কৱবেন? হাসলেন। এক ঘণ্টায়ই কান দিয়ে ধোঁয়া বেৱোতে আৱস্থা কৱবে।’ কানে রিসিভাৱ

ঠেকিয়ে মাথা কাত করে কাঁধ উঁচু করে রিসিভারটা ধরে রেখেছে সে। দুই হাত মুক্ত রেখেছে কাজ করার জন্যে। কিছু ফর্মে স্ট্যাম্প দিয়ে সীল মারছে। ‘আপনি আমাকে বিরক্ত করে ফেলেছেন, বুবলেন। আধ ঘণ্টা পর পরই জিজ্ঞেস করছেন জুন কেমন আছে। আরও তিরিশজন রোগী আছে এখন আমার হাতে। সবার আঘাতেরাই যদি এভাবে ফোন করত, এতক্ষণে পাগলা গারদে পাঠাতে হত আমাকে। কেমন আছে জানতে চাইছেন তো? বলতে পারব না। হাসপাতালে এসে দেখে যান।’

রেগে গেছে মারগারেট। চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়। ওপাশের কথা শুনতে শুনতে আরও রেগে গেল, ‘ডাক্তারকেই জিজ্ঞেস করুন। ধরুন।’ খটাস করে রিসিভারটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গটমট করে হেঁটে রওনা হলো।

‘জুন কেমন আছে, এতবার জিজ্ঞেস করছে কেন?’ দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর।

‘কারণ, বেশি উদ্বিগ্ন,’ জবাব দিল মুসা।

‘উদ্বেগটা কি জুনের অসুখের কারণে? না সে মুখ খুলেছে কিনা জানার জন্যে?’ কিশোর গলা পরিষ্কার করল কিশোর। ‘মিষ্টার এক্সেন্ডার হতে পারে।’

‘এক কাজ করো না,’ পরামর্শ দিল রবিন। ‘গলার স্বর তো নকল করতেই পার। কথা বলো ওর সঙ্গে। লোকটার কষ্টস্বর চিনে রাখো। ডাক্তার হয়ে যাও।’

‘ঐঝিক বলেছি।’ দুই শাফে টেবিলের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল সে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল নার্স আসছে কিনা। তারপর রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলল, ‘হালো, ডেন্টার পাশা বলছি।’ হঠাৎ করেই যেন অনেক বেড়ে গেছে তার বয়েস, ভারি হয়ে গেছে কষ্টস্বর, কারও বাবারও বোৰাৰ সাধ্য নেই, তার বয়েস চল্পিশের কম।

‘কই, এ নাম তো শুনিনি?’ ওপাশ থেকে জবাব এল। মস্ণ কষ্ট। মাঝবয়েসী একজন মানুষ। দ্রুত কথা বলে। ‘এ হাসপাতালে ওই নামের ডাক্তার আছে?’

‘তাহলে আমি এলাম কোথাকে? নতুন এসেছি। আপনি জুন লারসেনের খৌজ নিতে চাইছিলেন তো মিষ্টার...’

কিশোর আশা করেছে, নামটা বলবে লোকটা। বলল না। জিজ্ঞেস করল, ‘ও কেমন আছে?’

‘ঘনিষ্ঠ আঘাত ছাড়া এ খবর কাউকে জানানো নিষেধ। আপনি ওর কে হন?’

এক মহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দিল লোকটা, ‘আমি ওদের পারিবারিক বন্ধু।’

‘ঘনিষ্ঠ?’

‘দেখুন, এত প্রশ্ন করছেন কেন? আমি একটা সহজ কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, জুন কেমন আছে?’

‘হঁশ ফিরেছে। বিপদ কেটেছে।’

‘ও,’ লোকটা খুশি হয়েছে না শক্তি হয়েছে বোৰা গেল না ঠিকমত। তবে

উদ্বিগ্ন হয়েছে বলে মনে হলো কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, ‘কিছু বলতে হবে জুনকে? কি নাম বলব?’

‘না, কিছু বলতে হবে না, ডষ্টের। থ্যাক্ষ ইউ,’ লাইন কেটে গেল ওপাশ থেকে।

‘কি বলল?’ কিশোরকে চুপ হয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করল মুসা।

‘তেমন কিছুই বলল না,’ আস্তে করে রিসিভারটা ডেঙ্কে রেখে দিল আবার কিশোর।

তরুণ একজন ডাঙ্কারকে নিয়ে ফিরে এল নার্স। রিসিভার কানে ঠেকিয়েই মুখ বিকৃত করে ফেলল। ‘রেখে দিয়েছে! লোকটার মাথা খারাপ!’

দুই সহকারীকে নিয়ে সরে এল কিশোর। নিছু গলায় বলল, ‘নাহ, রহস্য একটা আছে, মানতেই হচ্ছে! কিছু একটা ঘটছে! কি, সেটাই বুবতে পারাছি না!’

‘তার মানে কেসটা ছাড়ছ না?’ হেসে বলল রবিন। ‘আরেকট হলৈই হতাশ করেছিলে আমাকে। কোন রহস্যের সমাধান না করে ছেড়ে দেবে কিশোর পাশা, ভাবাই যায় না।’

‘ছাড়ব একবারও বলিনি। মনে হয়েছিল, কোন রহস্য নেই। এখন ভাবছি, ভয়ানক কোন বিপদ ঝুলছে জুনের মাথার ওপর। সেটা জানতে হবে যে ভাবেই হোক। ওর কাছাকাছি থাকতে হবে আমাদের।’

তবে থাকাটা সম্ভব হলো না। তিনজনেরই কিছু না কিছু কাজ আছে। বসে থাকে না ওরা কেউই। মুসা আবার গাড়ির ব্যবসা শুরু করেছে। তবে গাড়ি বেচাকেনার চেয়ে মেরামতের দিকেই নজর দিয়েছে বেশি। নিক ওকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছে ইঞ্জিনের ব্যাপারে (গাড়ির জাদুকর দ্রষ্টব্য)। ওর পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের করভেট গাড়িটার ইগনিশন নাকি ঠিকমত কাজ করছে না, মেরামত করে দেবে কথা দিয়েছে সে। বিনিময়ে অবশ্যই পারিশ্রমিক নেবে।

রবিনকে যেতে হবে ট্যালেন্ট এজেন্সিতে। একটা ক্লাব একটা রক ব্যাণ্ড চেয়ে পাঠিয়েছে। সেটা পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

আর কিশোর কথা দিয়েছে মেরিচাটীকে, পাশের বাড়ির মিসেস ব্যালানটাইনকে বাগানের ঘাস কাটায় সাহায্য করবে। মিসেস ব্যালানটাইন মেরিচাটীর বাঙ্কবী। কিশোর আগ্রহী হয়েছে অবশ্য অন্য কারণে। ওই মহিলারও পেটের চিরকালীন অসুখ আছে। কি কি খেলে ভাল থাকেন, বলতে পারবেন কিশোরকে।

কাজেই সেদিন আর জুনের কাছে থাকা হলো না কারোরই।

পরদিন সকালে হাসপাতালে মুসাৰ সঙ্গে দেখা হলো কিশোরের। আগেই এসে বসে আছে মুসা। কারণ, ফারিহাকে সেদিন ছেড়ে দেয়ার কথা। আর জুনের বাবা বলেছেন, মেয়েকে এসে নিয়ে যাবেন সেদিনই।

হাসপাতাল ছাড়তে নারাজ ফারিহা। কারণ, জুনের প্রলাপ রহস্য ভেদ করার প্রবল আগ্রহ। কিন্তু থেকেও লাভ নেই। জুন তো আর থাকছে না। তাছাড়া ভাল হয়ে গেলে হাসপাতালই বা ওদেরকে রাখবে কেন?

জুনের শরীর অনেক ভাল হয়েছে। তবে স্থৃতি ফিরে আসেনি। বিছানায় বালিশ টেস দিয়ে বসে বাবার আসার অপেক্ষা করছে সে। বকবক করছে, 'বাবাকে তো চিনি। আসবে সেই জগৎ স্যুট পরেই। আজ হয়তো দেখা যাবে গরিলা সেজেই এসেছে। ওরকম রোমশ পোশাকও অনেক আছে তার। ব্যাণ্ড পার্টি ন নিয়ে এলেই বাঁচি। সব কিছুতেই বাড়াবাঢ়ি করা স্বভাব।'

দশ মিনিট পর দরজায় দেখা দিলেন লারসেন। 'হাই, খুকি, চিনতে পারছ আমাকে?' হেসে জিজেস করলেন। বাদামী জগৎ স্যুট পরেছেন। একটা প্লাস্টিকের তীর চুকিয়ে রেখেছেন চুলের মধ্যে। ওই লোকটাও পাগল, মনে হলো মুসার।

'বাবা,' জুন বলল। 'না চেনার কোন কারণ নেই। মাত্র চরিশটা ঘণ্টা মনে করতে পারছি না আমি। বিশ বছর নয়। নিশ্চয় চিনতে পারছি তোমাকে। যা আনতে বলেছিলাম এনেছ?'

হাতে করে একটা ছোট স্যুটকেস নিয়ে এসেছেন লারসেন। মেয়ের সামনে এনে রাখলেন সেটা। খুলু জুন। নীল সিঙ্কের একটা পাজামা বের করে তুলে ধরে বলল, 'এটা কি?'

'কি আবার, পাজামা,' হাসি হাসি গলায় বললেন লারসেন। 'নীল ব্লাউজটাও নিয়ে এসেছি। দেখ। এগুলো আনতেই তো বলেছিলি, নাকি?'

'যেটাতে বলেছিলাম সেটাতে খৌজোনি,' হেসে বলল জুন। 'অন্য ওয়ারড্রো থেকে এনেছ। এই কাপড় পরে বাইরে বেরোনো যায়? তুমিই বলো?'

চোখের সানগ্লাসটা ঠেলে কপালে তুলে দিলেন লারসেন। মেয়ের হাত থেকে নিলেন পাজামাটা। 'কেন, পরা যাবে না কেন? এ জিনিস পরে পার্টিতেও যেতে পারিস। স্বচ্ছন্দে। খারাপটা কি দেখলি?'

'মা বেঁচে থাকলে তোমার মাথায় হাতুড়ির বাঢ়ি মারত এখন। এ জিনিস পরে বাইরেই বেরোয় না মেয়েরা। আর পার্টিতে যাওয়া!'

'কেন, অসুবিধেটা কি? শরীর ঢাকা থাকলেই হলো,' বলতে বলতে ফারিহার দিকে চোখ পড়ল লারসেনের। তুড়ি বাজিয়ে বললেন, 'ব্যস, মিটে গেল ঝামেলা। ওর একটা কাপড় পরে নিলে পারিস। এই মেয়ে, একশো পনেরো হবে না তোমার ওজন?'

থ হয়ে গেল ফারিহা। 'আপনি জানলেন কি করে?'

'জানব না মানে? তিরিশ গজ দূর থেকেও যে-কোন মুরগী দেখলে বলে দিতে পারি ওটার ওজন। আর তুমি তো মানুষ। তোমার পোশাক জুনের লাগবেই। একই গড়ন।'

'বাবা,' অস্বস্তি বোধ করছে জুন। 'চুপ করো তো। ফারিহা, কিছু মনে কোরো না। বাবার ধারণা, দুনিয়ার সবাই এক। কেউ কিছু মনে করে না,' আবার বাবার দিকে ফিরল। 'বাবা, এটা তোমার অফিসের ইন্টারকমের বোতাম নয়, যে টিপে যা বলবে তাই হয়ে যাবে।'

'আমি কিছু মনে করিনি,' হেসে বলল ফারিহা। 'নাও না। লাগলে নাও আমার একটা কাপড়। অনেক আছে স্যুটকেসে। পরে ফেরত দিয়ে দিয়ো।'

‘আচ্ছা!’ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন জুন। তার বাবার আনা পোশাকগুলো পরে  
বেরোনোর কথা ভাবতেই মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল তার। স্যুটকেসের ডালা বঙ্গ  
করল। ‘কিছু মেকআপও ধার দিতে হবে। পারবে? আমার আকরাজান আমার  
মেকআপ বক্সটা আনতেও ভূলে গেছেন,’ নেমে পড়ল বিছানা থেকে। বাবাকে  
এসে জড়িয়ে ধরে চুম্ব খেলো গালে। ‘তোমার তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি, বাবা।  
তোমার অ্যামনেশিয়া হলো কি করে?’

বোকার হাসি হাসলেন বাবা। ‘আমারটা চিরকালের, জানিসই তো…তোর মা  
এ জন্যে কত বকাবকি করত…’

‘জানি।’

নিজের স্যুটকেসটা বয়ে জুনের এলাকায় নিয়ে এল ফারিহা। বিছানায় নামিয়ে  
রেখে বলল, ‘নাও, যা ইচ্ছে বেছে নাও।’

‘অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। বাড়ি গিয়েই ফেরত পাঠিয়ে দেব।’

‘অত তাড়া নেই। যখন খুশি দিয়ো।’

‘অ্যাই, শোন, জুন বলল।’ আমি জানি বাড়ি গিয়ে কি করবে বাবা। দুদিনের  
মধ্যেই একটা পার্টি দেবে। আমার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার জন্যে উৎসব।  
এক কাজ করো না, তোমরাও চলে এসো। সবাইকেই দাওয়াত,’ তিনি গোয়েন্দার  
কথাও বলল সে। ‘পার্টিটা দারুণ হবে, আমি এখনই বলে দিতে পারি। তোমার  
কাপড়গুলো তখনই নিয়ে যেয়ো।’

‘আচ্ছা।’

‘খারাপ লাগল না তো? এসে নিয়ে যেতে বললাম বলে?’

‘আরে না না, কি যে বলো। বরং খুশি হয়েছি। সত্যি।’

হাসতে গিয়েও চেপে রাখল কিশোর। অতি অগ্রহিটা প্রকাশ করল না। মনে  
মনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যাওয়ার জন্যে। চিকেন কিং লারসেনের বাড়িতে  
দাওয়াত পাওয়ার সৌভাগ্য হবে, লোকটাকে আরও কাছে থেকে দেখতে পাবে,  
কল্পনাই করেনি কোনদিন। কিছুটা দেখেছে যদিও এই হাসপাতালে, আরও অনেক  
কিছু দেখা বাকি। জুনের পার্টিতে যাওয়ার চেয়ে ভাল সুযোগ আপাতত আর কিছু  
হতে পারে না।

## পাঁচ

বিছানার কিনারে বসে পায়ে মোজা টেনে দিল কিশোর। লারসেনের বাড়িতে আজ  
পার্টির দাওয়াত। অস্বস্তি লাগছে তার। জটিল রহস্যের তদন্ত করতে হবে বলে  
ভয়টা, তা নয়, ভয় হলো এ ধরনের পার্টিতে অনেক ধরনের মানুষের সমাগম হবে।  
তাতেও খারাপ লাগত না। কিন্তু পার্টিটা একটা মেয়ের। তাতে ছেলেরা যেমন  
আসবে, তেমনি আসবে মেয়েরাও। ওদের সঙ্গে এমন সব কথা বলতে হবে  
অদ্বার খাতিরে, এমন আচরণ করতে হবে, যা সে করতে চায় না। মোটকথা  
ন্যাকামি এবং ভণিতা তার ভাল লাগে না।

উঠে গিয়ে ওয়ার্ড্রোব থেকে একটা উজ্জ্বল রঙের পোলো শার্ট বের করে গায়ে দিল। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের সুন্দর চেহারা এখন ওর জন্যে বিরক্তির কারণ। কোঁকড়া কালো চুল। গভীর কালো চোখে কেমন এক ধরনের মায়া, যেন স্বপ্ন ভরা। এই চোখের দিকে তাকিয়েই মেয়েরা...ধূর! আর ভাবতে চায় না!

আগে মোটামুটি সহজভাবেই মিশতে পারত মেয়েদের সঙ্গে। ইদানীং যতই বড় হচ্ছে, কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে ওর স্বভাব। ভাল অভিনেতা সে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় শুরু করল। ধরা যাক, একটা মেয়ে এসে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল ওর সঙ্গে। বলল, ‘এই যে, কিশোর পাশা। তোমার সঙ্গে পরিচিতি হওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশি হলাম। তুমি খেয়াল করোনি। কিন্তু গত আধ ঘণ্টা ধরে তোমাকে লক্ষ করছি আমি।’

‘কে বলল লক্ষ করিনি? আমি সব দেখি। আমার চোখে কিছুই এড়ায় না, জবাব দেবে কিশোর।

‘একটা চিকেন নেবে?’ সৌজন্য দেখিয়ে কাগজের প্লেটে করে চিকেন লারসেনের একটা বিশেষ খাবার বাঢ়িয়ে ধরল মেয়েটা।

‘না, ধন্যবাদ,’ আয়নার দিকে তাকিয়ে কল্পিত মেয়েটাকে বলল কিশোর। ‘আমি খাব না। আজেবাজে জিনিস খেতে মানা করে দিয়েছে ডাক্তার।’

‘তাই নাকি? তোমার ওপর ভক্ষ বেড়ে যাচ্ছে আমার,’ হাসি দিয়ে বলল মেয়েটা। ‘এ রকম মনের জ্বারওয়ালা মানুষ আমার ভাল লাগে।’

তার মানে কিশোরকেও ভাল লাগে, এটাই বোঝাতে চাইল মেয়েটা। ধরা যাক, তখন জিঞ্জেস করল, ‘তুমি কি জুনের বন্ধু?’

‘আসলে, আমি এসেছি খাবারে বিষ মেশানোর একটা ঘটনার তদন্ত করতে।’

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মেয়েটার। ‘মানে!’ উত্তেজিত কষ্টে বলল সে। ‘তুমি গোয়েন্দা! কোনু খাবারে বিষ মিশিয়েছে?’

‘এখনও হয়তো মেশানি। হয়তো মেশানোর পরিকল্পনা করেছে। সম্ভবত মুরগীতে।’

আরও অবাক হয়ে গেল মেয়েটা। ‘সর্বনাশ! কঠিন একটা প্রশ্ন করে বসল, ‘কেন মেশাবে? লক্ষ লক্ষ লোককে কে, কি কারণে মারতে চাইছে?’

‘জবাবটা এখনও জানি না। হতে পারে হেনরি অগাস্টাস লারসেনকে ব্যবসা থেকে তাড়াতে চাইছে। ওরকম আরও হাজারটা কারণ থাকতে পারে। কোনটা যে ঠিক, এখনও বলতে পারছি না।’

‘তোমার অনেক বুদ্ধি,’ কিশোরের কল্পনায় বলল মেয়েটা।

‘জানি। অনেকেই বলে সে কথা।’

‘গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে তো অনেক বিপদে পড়তে হয়। পিস্তল চালাতে জানো? কারাতে, জুড়ো এসব...’

‘কিছু কিছু আগ্রেয়ান্ত্র চালাতে পারি। জুড়ো শিখছি। পুরোপুরি শেখা হয়নি এখনও।’

খাবারে বিষ

‘কিন্তু হয়ে তো যাবে,’ থেমে গেল মেয়েটা। দাঁত দিয়ে নখ কাটল। তারপর আসল কথাটা জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার কোন গার্লফ্রেণ্ড আছে?’

এই রে! সেরেছে! আমতা আমতা করে বলল কিশোর, ইয়ে...মানে...’  
‘কিশোর! তোমার হলো?’

চমকে বাস্তবে ফিরে এল কিশোর। ফিরে তাকাল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রবিন। নেভি বু কাপড়ে লাল স্ট্রাইপ দেয়া পোলো শার্ট গায়ে। পরনে ধৰধৰে সাদা প্যান্ট। সুন্দর লাগছে ওকে।

‘কার সঙ্গে কথা বলছিলে?’ গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

‘কারও সঙ্গে না,’ জবাব দিল কিশোর। ‘কেসটা পর্যালোচনা করছিলাম,’ লাল হয়ে গেছে মুখ।

কোন চিন্তা মাথায় থাকলে একা একা কথা বলে কিশোর, ভাবনাগুলোই বিড়বিড় করে ভাবে, জানা আছে রবিনের। তাই আর এ নিয়ে মাথা ঘামাল না।

বেল এয়ারে চিকেন লারসেনের বিরাট বাড়ি। আগেই হাজির হয়ে গেছে মুসা আর ফারিহা। কিশোরদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

‘বাড়ি দেখেছ!’ দুই বন্ধুকে দেখেই বলে উঠল মুসা। ‘গেট থেকে পুল পর্যন্ত যেতেই বাস লাগবে! আরিকবাপরে বাপ!’

তিনতলা বিশাল বাড়িটায় আটচলিংশটা ঘর। আইভি লতায় ছাওয়া দেয়াল। কত কোটি কোটি ডলার কামিয়েছেন চিকেন কিং, বাড়িটা দেখলেই আন্দাজ করা যায়। আরেকটা জিনিস স্পষ্ট, কি ব্যবসা করে টাকা কামিয়েছেন তিনি। সর্বত্র মুরগীর ছবি। যেখানে সুযোগ মিলেছে, মুরগীর ছবি আঁকা হয়েছে। যেখানে আঁকার জায়গা নেই, যেমন লনে; সেখানে রবারের মুরগী বানিয়ে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে।

বাড়ির পেছনে পুলের ধারে পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। ছেলে-বুড়ো মিলিয়ে কম করে হলেও দুশো জন তো হবেই। পুলটার চেহারাও বিচিত্র। মুরগীর আকৃতিতে তৈরি। তার পাশে ফ্রাইড চিকেন খেতে খেতে হাসাহাসি করছে একদল ছেলেমেয়ে।

‘আমরা কিন্তু এখানে শুধু মজা করতে আসিনি,’ ফিসফিস করে বন্ধুদেরকে বলল কিশোর। ‘ফারিহা, গোয়েন্দা হওয়ার খুব শখ তো তোমার। টেনিং নিতে শুরু করো। যা বলব ঠিক তাই করবে। জুনের কাছ থেকে কাপড়গুলো নেবে না, ভুলে যাওয়ার ভান করে থাকবে। তাতে আরেকবার ওর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবে।’

‘আচ্ছা,’ ঘাড় কাত করে বাধ্য মেয়ের মত বলল ফারিহা। ‘চলো, জুনের কাছে যাই। তোমরা যে এসেছ দেখা করা দরকার।’

ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল চারজনে। সবার হাতেই কাগজের প্লেট। এমন ভঙ্গিতে খাচ্ছে, যেন জীবনে এই প্রথম মুরগীর স্বাদ পেয়েছে। এই আরেকটা জিনিস বিরক্ত লাগে ওর। মানুষগুলো এমন করে কেন? পোশাক-আশাকে তো কাউকেই দরিদ্র বলে মনে হচ্ছে না। তার পরেও অন্যের বাড়ির থাবার পেলে এমন

হ্যাঙ্গামো করে! বিরক্তিতে নাক কুঁচকাল সে।

‘কিশোর,’ রবিন বলল। ‘একটা অস্তত থাও। একটাতে তো আর মরে যাবে না।’

রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ঠাণ্টা করছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। মাথা নাড়ল, ‘না, খাব না।’

‘তুমি আসলেই একটা গৌয়ার...’

‘হাই,’ খানিক দূর থেকে বলে উঠল একটা মেয়ে। কিশোরদেরই সমবয়সী। খাটো করে ছাঁটা বাদামী চুল। এক হাতে মুরগীর পেটে, আরেক হাতে খালি একটা কাপ, সোডা ওয়াটার ছিল, খেয়ে ফেলেছে। আঁতকে উঠেছিল কিশোর, তাকেই ডাকছে ভেবে। যখন দেখল রবিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা, হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

‘তুমি আসার পর থেকেই তোমাকে দেখছি,’ রবিনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল মেয়েটা।

রবিনও হাসল। ‘তোমাকে তো চিনলাম না?’

চোখ কপালে তুলল মেয়েটা। ‘হায় হায়, বলো কি! আমাকে চেনো না? আরে আমি, আমি, ভাল করে দেখো তো চিনতে পারো নাকি?’

ব্যস, শুরু হয়ে গেছে ন্যাকামি। বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

কিন্তু রবিন দিব্যি হেসে চলেছে। মেয়েটার কথার জবাব তার মত করেই দিচ্ছে।

মরুকগে! একটা লাউঞ্জ চেয়ারে বসে পড়ল কিশোর। চিকেন লারসেনকে দেখতে লাগল। নাইট ক্লাবের কমেডিয়ানের মত আচরণ করছেন বিশালদেহী মানুষটা। একটু পর পরই গমগম করে উঠছে তাঁর ভারি কষ্ট। হা হা করে হাসছেন। পুলের পানির ওপর দিয়ে যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সে হাসি।

হঠাৎ আরেকটা কষ্ট কানে আসতেই ঘট করে সেদিকে ফিরল কিশোর। ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। সাদা স্যুট পরা একটা মানুষ, নিজের পরিচয় দিচ্ছে সোনালি চূলওয়ালা এক মহিলাকে। একটা বিজনেস কার্ড বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘আমি ফেলিস্ট্র আরোলা।’

‘নোরা অরলিজ,’ মহিলা নিজের নাম বলল।

‘ভালই হলো দেখা হয়েছে,’ লোকটা বলল।

যতই শুনছে ততই নিশ্চিত হচ্ছে কিশোর, এই কষ্ট সে শুনেছে। চিনতে পারছে।

কথায় কথায় নোরা জিজ্ঞেস করল, লোকটা কি করে।

‘মার্কেট রিসার্চ। কিছু বিশেষ খাবার চালানোর চেষ্টা করছি। খেয়ে দেখবেন? দেব? খুব ভাল লাগবে।’

‘দিন। এতই যখন বলছেন।’

কাগজে মোড়ানো ছোট একটা ক্যাণ্ডি বের করে দিল আরোলা।

ভাল করে দেখার জন্যে উঠে দাঁড়াল কিশোর।

‘অদ্ভুত নাম! মিরাকল টেস্ট!’ মোড়কে লেখা নাম পড়ে বলল মহিলা।

‘আমাদের কোম্পানির নতুন আবিষ্কার,’ আরোলা বলল হেসে।

মোড়ক খুলল নোরা। চকলেট রঙের একটুকরো মিষ্টি খাবার। তাতে মাখন মেশানো। দেখতে পাচ্ছে কিশোর।

‘কিন্তু ক্যাণ্ডি যে আমি খাই না?’ নোরা বলল।

‘ভয় নেই,’ অভয় দিয়ে বলল আরোলা। ‘এতে ক্যালোরি বাঢ়বে না। জিরো ক্যালোরি। ওই যে মিরাকল কথাটা লেখা আছে না, খামোকা নয়। খেয়েই দেখুন।’

মহিলার হাত ধরে প্রায় জোর করে ক্যাণ্টি তার মুখে ঠেলে ‘দিল আরোলা। ‘খান। বুঝবেন, না খেলে কি স্বাদ মিস করতেন।’

অবশ্যে কামড় দিয়ে ছোট একটুকরো ভেঙে মুখে পুরল নোরা। ‘বাহ! দারণ তো।’

খাবার লোভে নয়, কি এমন মজা সেটা বোঝার জন্যে জিভ প্রায় বেরিয়ে পড়ল কিশোরের। রহস্যময় লাগছে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করল আরোলা। একটা বিজনেস কার্ড আর একটা ক্যাণ্ডি কিশোরের হাতেও গুঁজে দিল সে।

মোড়ক খুলে মুখে পুরে দিল কিশোর। মস্তুণ, মাখন মাখন এক ধরনের স্বাদ।

‘কেমন লাগছে?’ ভুক্ত নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

‘তিনি ধরনের স্বাদ একসঙ্গে,’ জবাব দিল কিশোর। ‘চকলেট, মার্শম্যালো আর মিট। সত্যিই ক্যালোরি নেই? কি করে সম্ভব?’

‘সম্ভব। ফ্রেজারটাই আসল। মিরাকল টেস্ট কি আর সাধে বলা হয়েছে। ক্যালোরি ছাড়া ক্যাণ্ডি, সাংঘাতিক আবিষ্কার, কি বলো?’

বড় বড় হয়ে গেছে কিশোরের চোখ। সত্যিই চমৎকার স্বাদ। তারপর বলছে ক্যালোরি ফ্রী। কি করে সম্ভব? এতই আগ্রহী হয়েছে সে, আরোলার কষ্টস্বরের কথাই ভুলে গেল ক্ষণিকের জন্যে।

ওর কোন সন্দেহ নেই, এই লোকই ফোন করেছিল হাসপাতালে। নার্সকে বিরক্ত করেছিল। বার বার জুনের খবর জানতে চেয়েছিল।

‘তোমার কার্ড নেই নিশ্চয়?’ কিশোরকে জিজ্ঞেস করল আরোলা। ‘সমবদ্ধার খানেওয়ালা তুমি, বুঝতে পারছি। তোমাকে টেস্ট করিয়ে ভাল করেছি। নামঠিকানা জানা থাকলে ভাল হত।’

হেসে উঠল মহিলা। ‘ওর আর কি কার্ড থাকবে? টিনএজার। হাই স্কুলে পড়ে বোধহয়। ব্যবসা-ট্যবসা কি আর করে?’

কে বলেছে কার্ড নেই?—কথাটা প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল কিশোরের। সামলে নিল সময়মত। আর যাকেই দিক, এই মুহূর্তে ফেলিঙ্গ আরোলাকে তিনি গোয়েন্দার কার্ড দেয়ার কোন ইচ্ছে তার নেই। সতর্ক হয়ে গেলে লোকটা তার কোন প্রশ্নেরই জবাব দেবে না। অনেকগুলো প্রশ্ন করার ইচ্ছে আছে কিশোরের। এই যেমন, কেন হাসপাতালে ফোন করেছিল? কেন রহস্যময় আচরণ করেছে ফোনে? জুন আর লারসেনের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

এই সময় সেখানে এসে হাজির জুন। আরোলার হাত ধরল। ‘আরেকটা ক্যাপ্টি দিন। এত ভাল ভাবিইনি। একটাৰ পৰি একটা যে খেতে চাইব, একথা কিন্তু একবাৰও বলেননি।’

তাকে আরেকটা ক্যাপ্টি দিল আরোলা। কিশোৱকে দেখিয়ে বলল, ‘ওৱা ও ভাল লেগেছে। ও খুব সমবাদার, বুঝে গেছি...’

‘থামুন থামুন,’ তাড়াতাড়ি হাত তুলল জুন। ‘ওকে আপাতত পাৰেন না। কাজে লাগাতে চান তো? হবে না। কাৰণ এখন ওকে আমি দখল কৰেছি। ওকে আৱ ওৱ দুই বন্ধুকে। ওৱা তিন গোয়েন্দা। আমাকে সাহায্য কৰছে। অ্যাঞ্জিলেটেৰ দিন কি কি ঘটেছিল আমাৱ, বেৱ কৰাৰ চেষ্টা কৰছে।’

ভেতৱে ভেতৱে চমকে গেলেও মুখটাকে স্বাভাৱিক রাখল কিশোৱ। তাৱ পৰিচয় ফাঁস কৰে দিয়ে মন্ত ক্ষতি কৰেছে জুন।

‘তাই নাকি?’ কিশোৱেৰ দিকে তাকিয়ে চোখ সৰু সৰু হয়ে এল আরোলাৰ। ‘তোমাকে দেখে কিন্তু কিছুই মনে হয়নি।’

মুসা আৱ বিবনকে এখন দৰকাৱ। জলদি। কোন ধৰনেৰ একটা সূত্ৰ পেতে যাচ্ছে কিশোৱ, সেটা কি, এখনও বুবতে পাৱছে না অবশ্য।

উঠে দাঁড়াল কিশোৱ। আরোলাকে ‘এক্সকিউজ মি’ বলে রওনা হলো ভিড়েৰ ভেতৱে দিয়ে, দুই সহকাৱীৰ খৌজে। ‘মুৱগী পুলেৱ’ ঠোটেৱ কাছে জটলা কৰছে কিছু লোক, তাৱ মাৰখানে যেন কিং হয়েই মাথা উঁচু কৰে দাঁড়িয়ে আছেন চিকেন কিৎ লারসেন। সবাৱ মাথাৰ ওপৰ নিয়ে চোখে পড়ছে তাৱ মাথা। পড়বেই। সাড়ে ছয় ফুট লঘা মানুষ খুব কমই আছে। চট কৰে চোখে পড়াৰ আরেকটা কাৰণ তাৱ পোশাক। উজ্জ্বল কমলা রঙেৰ জগিং সৃষ্টি, বুকেৱ কাছে এম্ব্ৰয়ড়াৱি কৰে আঁকা রয়েছে একটা মুৱগী।

‘বললাম তো জানি না,’ প্ৰায় চিৎকাৱ কৰে কথা বলছেন লারসেন। ‘ছাড়া পেলেই কেন যে রাস্তা পেৱিয়ে আৱেক দিকে দৌড় দিতে চায় মুৱগীৱা, এ রহস্য আমিও ভেদ কৰতে পাৱিনি,’ তাৱপৰ হহ হহ হ কৰে জোৱে জোৱে হাসলেন তিনি। কি মজা পেল শ্ৰোতাৱা ওৱাই জানে, হো হো কৰে হাসতে লাগল।

‘মিষ্টাৱ চিকেন,’ একজন বলল। ‘আছা বলুন তো, মাথন মাখানো মুৱগীৰ মাংসেৰ কেক নিয়ে কৰে গোলমালটা হয়েছিল?’

‘উনিশশো ছিয়াশিতে,’ সঙ্গে সঙ্গে জবা৬ দিলেন লারসেন। ‘ওৱকম থাৰার সহ্য কৰতে পাৱছিল না আসলে লোকে, বেশি রিচ...’

‘ছিয়াশি নয়, পঁচাশি,’ ফস কৰে বলে বসল কিশোৱ। জবা৬টা মুখে এসে গেছে, না বলে পাৱল না। ‘আপনাৰ ভুল হয়েছে, স্যাৱ।’

একসঙ্গে সবগুলো মুখ ঘুৱে গেল কিশোৱেৰ দিকে। চিকেন লারসেন সহ।

‘আমাৱ মনে আছে,’ আবাৱ বলল কিশোৱ। ‘সে বছৱই আপনি একটা ফোয়াৱা বানিয়েছিলেন। তাৱ পাশে হোস পাইপেৰ ব্যবস্থা কৰেছিলেন। আপনাৱ রান্না কৰা মুৱগী খাওয়াৰ পৰি বাঢ়াৱা যাতে পানি ছিটিয়ে মজা কৰতে পাৱে।’

‘তুমি তো একটা জিনিয়াস হে!’ এগিয়ে এলেন লারসেন। ভালুকেৱ থাৰার থাৰারে বিষ

মত বিশাল থাবায় চেপে ধরলেন কিশোরের হাত।

‘ঁৰাকাতে গিয়ে কিশোরের মনে হলো, ওই হাত নাড়ার সাধ্য তার নেই।

‘তোমার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল, বুঝতে পারছি,’ লারসেন বললেন। ‘এক কাজ করো না। আমি কি কি করেছি, সেই ইতিহাসগুলো তুমিই বলে দাও। সবাই শুনুক। আমিও শুনি। নিজের পুরাণে দিনের কথা শুনতে ভালই লাগে মানুষের।’

‘বেশ,’ ছেটে কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। ‘উনিশশো ছিয়াশি সালে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই অয়েলে চিনি মিশিয়েছিলেন আপনি। আপনার বেস্টুরেন্টের সামনে দিয়ে লঘা একটা মূরগীর মিছিল পার করিয়েছিলেন। মূরগীগুলোর গলায় ঝুলছিল লাল রঙের মলাটের টুকরো। তাতে সোনালি অক্ষরে লেখা ছিলঃ চিকেন লারসেনের জন্যে আমি সব করতে রাজি।’

‘নাহ, এই ছেলেটাকে আমি পালকপুত্র করে নেব! জনতার দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করলেন লারসেন। চেঁচিয়ে ডাকলেন মেয়েকে, ‘জুন, তোর একটা নতুন ভাই জোগড় করেছি!’

মুরগীর ইতিহাস নিয়ে যখন আলোচনায় মগু কিশোর আর লারসেন, মুসা আর ফারিহা তখন জুনের সঙ্গে আলাপ করছে। পুলের নিচু ডাইভিং বোর্ডের ওপাশে রয়েছে ওরা।

‘দাক্রুণ পাঠি দিয়েছ,’ ফারিহা বলল। ‘এতো লোক! কারা ওরা?’

‘জানি না। কোথেকে দাওয়াত করে এনেছে বাবা, বাবাই জানে, ‘জতো খুলে পানিতে পা ডোবাল জুন।’ যাকে পায় তাকেই দাওয়াত করে বসে বাবা, কিংবা ফ্রী কুপন দিয়ে দেয়, ব্রাবাই এরকম। আমি হয়েছি ঠিক উল্টো। ভালমত না জেনে না বুঝে কিছু করতে পারি না। এই স্মৃতিবিভ্রমের ব্যাপারটা খেপিয়ে দিচ্ছে আমাকে। কেবলই মনে হয়, কেন মনে করতে পারি না! লোকে এসে সাজ্জনা দিয়ে বলেঃ তুমি ভাল হওয়ায় খুশি হয়েছি। যারা বলে তাদেরকে চিনতে পারি না। অসহ্য লাগতে থাকে।’

‘লম্বা একটা লোককে দেখেছ কখনও, মনে পড়ে?’ মুসা জিজ্ঞেস করল।  
‘কুঁসিত চেহারা। আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট পরে?’

মাথা নাড়ল জুন। ‘নাহ। কেন?’

‘তোমাকে ওর কথা বলতেই ভুলে গেছি,’ ফারিহা বলল। ‘আমরা ওর নাম রেখেছি মিট্টার এক্স। যে রাতে তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সে রাতে হাসপাতালে তোমার ঘরে এসেছিল সে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, লোকটা তোমার অপরিচিত। হওয়ার কারণ আছে। আর একটিবারও আসেনি সে এরপর।’

ভুক্ত কুঁচকে গেল জুনের। চোখে ভয় দেখা দিল বলে মনে হলো মুসার।

‘থাক অসব কথা,’ হাত নেড়ে বলল সে। ‘তোমার গাড়িটার কি অবস্থা, জুন? আমি ইঞ্জিনের কাজ জানি। চাইলে আমার সাহায্য নিতে পারো।’

‘আমার গাড়ি? সোজা ওটাকে জাংকইয়ার্ডে পাঠিয়ে দিয়েছে বাবা। একবার চোখের দেখাও দেখতে দেয়নি আর আমাকে। তার ধারণা, অপয়া গাড়ি।’

‘অ্যাক্সিডেন্টের দিন যা ঘটেছিল কিছুই মনে করতে পারছ না?’ ফারিহা

জিজ্ঞেস করল।

‘না। দিন গেলে হয়তো মনে পড়বে। আগামী ইপ্পোয়ও পড়তে পারে।’

সেদিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে ফিরে কিশোরের ওয়ার্কশপে আলোচনা করতে বসল তিন গোয়েন্দা। মুসা আর রবিন পিজা চিরুছে। কিশোর এক টুকরো ফ্রুটকেক নিয়ে এসেছে ফ্রিজ থেকে, মেরিচাচীর তৈরি। তাতে পেটের ক্ষতি হবে না।

‘হাসপাতালে ঘন ঘন ফোন না হয় করলাই ফেলিঙ্গ আরোলা,’ মুসা বলল একসময়। ‘তাতে কি?’

‘ওর বলার ধরনটাই পছন্দ হয় না আমার,’ স্যুইভেল চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। ‘সেজন্যেই সন্দেহটা জেগেছে।’

‘বেশ, তার ব্যাপারে খোঁজখবর নেব আমরা,’ রবিন বলল। লম্বা চুমুক দিল কোকাকোলার বোতলে। ‘তো, কাল তাহলে যাছ চিকেন লারসেনের ওখানে?’

‘যেতে তো বলেই দিয়েছে,’ কিশোর বলল। ‘পালকপুত্রাই প্রায় করে নিয়েছে পার্টিতে। আমিও যতটা সম্ভব খাতির জমিয়েছি। কায়দা করে অনুমতি আদায় করে নিয়েছি, তাঁর রিসার্চ ল্যাব আর মেইন অফিসে ঢোকার।’

‘কি পারে বলে মনে হয়?’ মুসার প্রশ্ন। ‘বিষের বাক্স?’ আঙুলে লেগে থাকা মাথান চেটে খেতে লাগল সে।

‘কি পাব জানি না। সব নির্ভর করে কতটা গভীরে ঢোকার সুযোগ পাব। আমরা, কতখানি দেখতে পাব, তার ওপর।’

‘যেতে পারলে খুবই ভাল হত,’ রবিন আফসোস করল। ‘কিন্তু...’

‘পারছ না, এই তো? ট্যালেন্ট এজেন্সিতে যেতে হবে। তা যাও।’

‘অজ্ঞাল আর আমাকে দিয়ে কিছু কাজ হচ্ছে না তিন গোয়েন্দাৰ,’ জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। ‘ভাবছি এজেন্সিৰ চাকরিটা ছেড়েই দেব...’

‘তাড়াহড়ো করে সিদ্ধান্ত নিয়ো না। দেখাই যাক না, কি হয়?’

খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এল তিনজনে। ওয়ার্কশপ বন্ধ করে দিল কিশোর। রবিন আর মুসাকে এগিয়ে দিতে চলল লোহার বিশাল গেটের দিকে। ওদের গাড়িগুলো পার্ক করা রয়েছে ওখানে। লালচে হয়ে এসেছে আকাশ। তবে বেশিক্ষণ সে রঙ থাকল না।

‘অ্যাই, দেখো,’ হাত তুলল মুসা। ‘রাস্তার ওপারে! বুকের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো রঙের পোরশে কনভারটিবল। ‘কম করে হলেও যাট হাজার ডলার দাম। দুর্দান্ত জিনিস।’

গাড়ি দেখছে না কিশোর, তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। বনেটের ওপর ঝুঁকে রয়েছে যে। শান্ত কষ্টে বলল, ‘দেখেছ। আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট। আমাদের মিষ্টার এক্সও ওই পোশাকই পরেছিল...’

তাই তো! গাড়ির দিকেই নজর ছিল কেবল মুসার, আর কোনদিকে নয়। বরফের মত জমে গেল যেন সে। একটা মূহূর্ত। পরক্ষণেই দৌড় দিল সেদিকে।

পায়ের শব্দ শুনেই বোধহয় ফিরল লোকটা। মুসাকে দেখেই বনেট নামিয়ে

গিয়ে টান দিয়ে খুলল ড্রাইভিং সীটের পাশের দরজা।

‘অ্যাই, শুনুন! দাঁড়ান!’ চেঁচিয়ে বলল মুসা।

কিশোর আর রবিনও ছুটতে শুরু করেছে তার পেছনে।

কিন্তু থামল না আর্মি জ্যাকেট পরা লোকটা। তাড়াতাড়ি গাড়িতে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রঁওনা হয়ে গেল।

চোখের পলকে ঘুরে গেল মুসা। ছুটল তার নিজের গাড়ির দিকে। একটানে দরজা খুলে ভেতরে বসেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। সাঁই সাঁই করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে তুলে নিয়ে এল-রাস্তায়। পিছু নিল পোরশের।

‘চল বেটা, জলদি কর, নিজের শিরোকোকে অনুরোধ করল মুসা। ‘ওটাকে ধরা চাই। পালাতে না পারে।’

কিন্তু মোড়ের কাছে পৌছে ব্রেক চেপেই বোকা হয়ে গেল সে। কিছুই হলো না। কাজ করছে না ব্রেক। প্যাডাল চেপে অথবাই পাস্প করে চলেছে সে, কিন্তু চাপ লাগছে না কোন কিছুতে।

পঞ্চাশ মাইল তুলে ফেলেছিল গতিবেগ। তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি সামনের চৌরাস্তার দিকে। ট্র্যাফিক পোষ্টের লাল আলো জুলছে।

## ছয়

একটা মুহূর্তের জন্যে প্যাডাল চাপা বন্ধ করছে না মুসা। কাজ তো করা উচিত! সে নিজে সব কিছু চেক করে। ব্রেক ফ্লাইড ঠিক আছে কিনা নিয়মিত দেখে।

কিন্তু, কথাটা সত্যি, ব্রেক কাজ করছে না। কোনমতই চাপ দিচ্ছে না চাকায়। গতিরোধ করার চেষ্টা করছে না। পথটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ফলে গতি তো কমছেই না, আরও বাড়ছে। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চৌরাস্তায় গিয়ে পড়বে। ভাগ্য ভাল হলে কোন গাড়ির গায়ে গুঁতো না লাগিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। তবে লাগার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ লাল আলো জুলছে তার দিকটায়। অন্যদিকের গাড়িগুলো চলাচল করছে। ওগুলোর চালকদের জানার কোনই উপায় নেই যে মুসার গাড়ি ব্রেক ফেল্ট করেছে।

মুসার মনে হচ্ছে তার গলার ভেতরে একটা আস্ত আপেল চুকিয়ে দেয়া হয়েছে। বেরও করতে পারছে না, গলা দিয়ে নামাতেও পারছে না। ঘেমে ভিজে গেছে হাতের তালু।

কিন্তু মাথাটা এখনও ঠাণ্ডাই রেখেছে। ভেজা তালু দিয়ে চেপে ধরল গিয়ারশিফট নব। একটানে নামিয়ে নিয়ে এল ফোর্থ গিয়ার থেকে সেকেণ্ড গিয়ারে। গতি কমানোর জন্যে। ইতিমধ্যে সামনের পোরশেটা মোড় নিল গতি না কমিয়েই। রাস্তায় ঘষা খেয়ে আর্টনাদ তুলল টায়ার। ঘুরে গেল গাড়িটা। দ্রুত সরে যেতে লাগল।

গতি কমছে শিরোকোর, তবে যথেষ্ট নয়। চৌরাস্তাটা আর মাত্র একশো গজ দূরে। হস হস করে বেরিয়ে যাচ্ছে ওপাশের গাড়িগুলো। এপাশের হলুদ সিগন্যাল

এখনও জুলেনি।

জোরে হৰ্ন বাজিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করল একটা নীল হোগা।

ধপ ধপ করে লাফাছে মুসার হৎপিণ। গিয়ার আরও নিচে নামাল সে। তারপর চেপে ধরল হ্যাওব্রেক। একই সঙ্গে ডানে কাটল টিয়ারিং।

নিমেষে রাস্তা থেকে একটা শূন্য জায়গায় নেমে এল গাড়ি। কিছু বাড়িগুলি উঠবে ওখানে, তারই প্রস্তুতি চলছে। মাটি এবড়োথেবড়ো হয়ে আছে। তাতে আরও কিছুটা গতি কমল গাড়ির। লম্বা ঘাসের ভেতরে পড়ে আছে কয়েকটা সিমেন্টের স্ন্যাব, সেগুলোতে ধাক্কা লেগে থেমে গেল শিরোকো।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল। সীটবেল্ট বাঁধা না থাকলে উইঙ্গুলীলে গিয়ে বাড়ি লাগত মুসার মাথা।

মরতে মরতে বাঁচলাম! ভাবল সে। লম্বা দম নিতে লাগল নিজেকে শান্ত করার জন্যে। তারপর দরজা খুলে নেমে এল টর্চ হাতে। গাড়ির পাশে বসে পড়ে নিচে আলো ফেলে দেখতে লাগল ক্ষতিটা কোথায় হয়েছে। হ্যাম, তাহলে এই ব্যাপার! ব্রেকের ফ্রাইড লাইন কাটা! ইগনিশন থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা। তারপর ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরে। গোধূলি শেষ হয়ে অঙ্ককার নামতে আরম্ভ করেছে তখন। স্যালভিজ ইয়ার্ডে ফিরে চলল সে।

দুই ক্যান সোডা ওয়াটার গেলার পর অনেকটা শান্ত হলো মুসার কাঁপুনি। হেডকোয়ার্টারের টেইলারটা যে জঞ্জালের স্তুপের ভেতর লুকানো, তার বাইরে তিনটে পুরানো লোহার চেয়ারে বসেছে রবিন আর কিশোরের সঙ্গে।

‘যাক,’ কিশোর বলল। ‘অবশ্যে মিষ্টার এক্সের দেখা মিলল।’

‘ব্যাটা শয়তান,’ এখনও রাগ কমেনি মুসার। ‘ব্রেকের লাইন ও-ই কেটে রেখেছিল। এমন ভান করছিল, যাতে আমি ওকে ফলো করি। কিংবা আমরা সবাই করি। এবং করলেই গিয়ে বাড়ি খাই পাহাড়ে।’

‘তিনি গোয়েন্দার নাম মুছে যেত তাহলে। কিংবা দুই গোয়েন্দা হয়ে যেত একক্ষণে।’

‘আমি ভাবছি,’ রবিন বলল। ‘লোকটা কে? আমাদের পিছে লেগেছে কেন?’

‘আর কি করেই বা জানল, যে আমরা তদন্ত করছি?’ যোগ করল কিশোর।

‘এটা আরেক রহস্য। পার্টিতে কিন্তু দেখিনি ওকে।’

‘আর্মি জ্যাকেট পরা ওরকম কাউকে চেনে না জুন,’ মুসা বলল। ‘তারমানে...’

‘সে লারসেন পৈরিবারের কেউ নয়,’ কথাটা শেষ করে দিল কিশোর। ‘কারও হয়ে কাজ করছে।’

‘কার?’

জবাব দিতে পারল না কেউ। তিনজনেই প্রশ্নটা মাথায় নিয়ে ঘুমাল সে রাতে।

পরদিন সকালে ইয়ার্ডের গেটের বাইরে একটা অপরিচিত গাড়ি হৰ্ন দিতে লাগল, আর টেলিফোনটাও বেজে উঠল একই সঙ্গে। অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে কিশোর। ওসিলোক্ষোপ দিয়ে ওর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পরীক্ষা খাবারে বিষ

করছিল সে। ফোনের রিসিভার কানে ঠেকিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। একটা রহস্যের সমাধান হলো। অপরিচিত হন্টা মুসার গাড়ির। অচেনা, তার কারণ শিরোকোটা আনেনি মুসা। নিয়ে এসেছে আরেকটা, ওর মায়েরটা।

টেলিফোনটাও অবাক করল কিশোরকে।

‘কিশোর, আমি জুন লারসেন বলছি। আমার ব্রিফকেস!’

ইঙ্গিত কিংবা সঙ্কেত খুব ভালই বোঝে কিশোর, কিন্তু জুনের কথা তাজ্জব করে দিল ওকে। তবে সে প্রশ্ন করার আগেই জুন বলল, ‘এক ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠেছি আমি। তখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার ব্রিফকেসটা, পাছি না,’ লম্বা দম নিল সে। ‘এর আগে পর্যন্ত ওটার কথা ভুলেই ছিলাম। আজ ঘুম থেকে ওঠার পর মনে পড়েছে।’

উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। ‘তোমার স্মৃতি ফিরতে আরম্ভ করেছে।’

‘মনে হয়,’ জুন বলল। ‘যাই হোক, ব্রিফকেসটা পাছি না। কেন ওটা এত খুঁজছি তা-ও বুবতে পারছি না। তেতরে বোধহয় জরুরী কিছু ছিল।’

আমি আর মুসা তোমার আবার অফিসে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।’

‘অফিসেও ফেলে রেখে আসতে পারি। খুঁজতে যেতে চাইছিলাম, কিন্তু কদিন যেতে বারণ করে দিয়েছে বাবা। বলেছে রেন্ট নিতে। আচ্ছা, একটা কথা, শুক্রবারে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার আগে আমি কোথায় ছিলাম, বের করতে পারবে?’

ঠিক এই কাজটা করার কথাই ভাবছিলাম, মনে মনে বলল কিশোর। জুনকে বলল, ‘দেখি, খোজখবর করব। কখন কোথায় যাও, লিখেটিখে রাখার অভ্যাস আছে, ক্যালেন্ডারে? থাকলে ভাল হত। একটা সূত্র পেতাম।’

‘রাখি। নীল রঙের মরক্কো লেদারে মোড়া একটা সুন্দর ডায়েরীতে। ব্রিফকেসেই রাখি ওটা।’

গাড়ির হর্ন বাজাতে আরম্ভ করল আবার মুসা, তালে তালে, একটা বিশেষ ছন্দ সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

‘ঠিক আছে। ব্যাপারটা নিয়ে সব রকমে ভেবে নিই,’ কিশোর বলল জুনকে। ‘রাতে ফোন করব।’

‘আচ্ছা। আমারও কিছু মনে পড়লে জানাব তোমাকে,’ লাইন কেটে দিল জুন।

বাইরে বেরোল কিশোর। ততক্ষণে বনেট খুলে ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে পড়েছে মুসা। ইঞ্জিন সামান্যতম গোলমাল করলে সেটা দেখা এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার।

‘জুন ফোন করেছিল,’ কিশোর জানাল। ‘ওর ব্রিফকেসটা নাকি পাছে না। জরুরী কিছু ছিল বলে মনে হচ্ছে ওর।’

কিশোরের দিকে না তাকিয়েই মুসা বলল, ‘আমি শিওর, মিস্টার এক্স ওটাই খুঁজছিল হাসপাতালে।’

মুখ তুললে দেখতে পেত উত্তেজনায় চোয়াল ঝুলে পড়েছে কিশোর পাশার। ‘একটা সাজাতিক কথা বলেছ তো! মনেই হয়নি আমার।’

গাড়িতে উঠে বসল দু’জনে। রওনা হলো চিকেন লারসেনের স্যান

ফারনানদো ভ্যালির অফিসে। যাওয়ার পথে দেখতে পেল ঢালের নিচে তরাইয়ে  
তেমনি পড়ে আছে মুসার গাড়িটা।

একটা পেট্টেল স্টেশনে থামল মুসা। মেরিচাটীর বোনপো নিকি পাঞ্জকে ফোন  
করার জন্যে। যাকে এক ভীষণ বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল তিনি গোয়েন্দা। গাড়ির  
জানুকর বলা যায় লোকটাকে। দিন কয়েক হলো আবার ফিরে এসেছে রকি বীচে।  
গাড়ি মেরামতের একটা গ্যারেজ করার কথা ভাবছে এখানে। উঠেছে ম্যালিবু বীচে  
এক বহুর সঙ্গে একটা কটেজ ভাড়া করে। গরমকালটা কাটাবে এখানে, গাড়িটাড়ি  
মেরামত করবে, ব্যবসাটা জমে গেলে চিরস্থায়ীই হয়ে যাবে।

‘নিকিভাই?’ ফোনে বলল মুসা। ‘মুসা। আমার গাড়িটা একটু দেখবেন?’

‘কোনটা? শিরোকোটা?’

‘হ্যাঁ। গাড়িটা পড়ে আছে। তুল নিয়ে’ গিয়ে মেরামত করে নিন, কয়েক  
দিনের জন্যে চালাতে দেব। একটা গাড়ি আপনার দরকার বলেছিলেন না?’

নিকির সঙ্গে আলোচনা করে গাড়ির একটা ব্যবস্থা করে আবার গাড়িতে ফিরে  
এল মুসা।

চিকেন লারসেন করপোরেশনের পার্কিং লটে এনে গাড়ি ঢোকাল মুসা। জায়গাটা দেখে  
হাসি পেল দু'জনেই। এখানেও লারসেনের বিচ্ছিন্ন রুটিন নির্দর্শন স্পষ্ট। আধুনিক  
ছ'তলা একটা বাড়ি আর এক চিল্ড্রেন পার্কের মিশ্রণ যেন। ভিজিটরস গেটে তালা  
দেয়া। ঢোকার আগে অনুমতি নিতে হয়। ইন্টারকমে কথা বলতে গেল মুসা।  
মুরগীর আকৃতিতে তৈরি ইন্টারকম দেখে হাসি পেল। কেন চুকবে, প্রশ্ন করা হলে  
খাবারের অর্ডার দিল সে। চিকেন লারসেন রেন্টুরেন্টে ঢোকার কথা বলল। ভাবল,  
আগে ভেতরে চুকি তো, তারপর দেখা যাবে কোথায় যাওয়া যায়।

ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে হাঁ হয়ে খুলে গেল গেট। লাল-হলুদ রঙ করা বাড়িটার  
দিকে গাড়ি চালাল মুসা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা কাজ করেন লারসেন। চওড়া হাসি দিয়ে স্বাগত  
জানালেন ওদের। পরনে লাল জগিং স্যুট। কিশোরকে দেখেই বললেন, ‘একটা  
ধীধার জবাব দাও। বলো তো কোনু সালে পেশানো মুরগীর মাংসে গাজর মেশাতে  
আরঞ্জ করেছি?’

‘উনিশশো সাতাশি সালে। ছেট ছেট টিনে ভরে সাপ্লাই দিতেন।’

‘অ্যাই, কি বলেছিলাম। বলিনি, ছেলেটা পারবেই!’ কাছাকাছি যত লোক  
আছে সবাইকে শোনানোর জন্যে চেঁচিয়ে বললেন লারসেন। গলা তো নয়, মাইক।  
‘তুমি একটা পাগল, পুত্র, সন্দেহ নেই, তবে আমার মত পাগল। দাঁড়াও,  
আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ দিয়ে দিছি। তোমরা দু'জনে যে কোন সময় চুকতে  
পারবে। আমাদের এখানে সিকিউরিটি খুব কড়া,’ চাপড় মেরে কিশোর আর মুসার  
পিঠে স্টিকার লাগিয়ে দিলেন তিনি।

কিশোরের পিঠে কি লাগানো হয়েছে, দেখে মুসা তো থ। সন্দেহ হতে নিজের

পিঠেরটা দেখাল কিশোরকে। হো হো করে হেসে উঠল কিশোর। লেখা রয়েছেঃ ‘মুরগীর ঠোকর। জিজ্ঞেস করল, ‘আমার পিঠে কি?’ মুসা জানাল, ‘মুরগীর খামচি।’ ওদের সঙ্গে সঙ্গে লারসেনও হাসতে লাগলেন।

হাসি খামলে বললেন, ‘খেতে এসেছ বলে তো মনে হয় না। তা কি দেখতে এসেছ, বলো তো? মুরগী বেচে লাভ করা আমার প্রথম ডজারটা? ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছি। আমার অফিসে। আমার প্রথম স্তৰির ছবিটাও বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছি। হাহ হাহ হা!’

‘আসলে,’ কিশোর বলল। ‘অফিসগুলো দেখারই লোভ। আপনারটা। আরও কিছু। এবং বিশেষ করে জুনের নতুন অফিসটা।’

‘আমি দেখতে চাই খাবার কি করে বানানো হয়,’ মুসা বলল। ‘আর কি কি জিনিস দেয়া হয় মাংসের সঙ্গে।’

‘ও, আমার পাগল বিজ্ঞানীগুলোকে দেখার শখ তোমার?’ হাসলেন লারসেন। ‘বেশ। খাচা থেকে বের করার ব্যবস্থা করছি ওদেরকে। তারপর,’ কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। ‘একটা স্পেশাল খাবার দেব তোমাকে। চেখে দেখার জন্যে।’

ভয় পেয়ে গেল কিশোর। তাড়াতাড়ি বলল, ‘না না, আমি খাবারের কিছু বুঝি না! বুড়ো আঙুল দিয়ে মুসাকে দেরিয়ে বলল, ‘ওকে দেবেন।’

কিশোর আর মুসাকে প্রায় টেলতে টেলতে নিয়ে চললেন লারসেন। ‘আমার নতুন জিনিসটা দেখলে বুঝবে। বিশ্বাসই করতে চাইবে না। আমি নিজেই পারিনি। অথচ আমারই আবক্ষার।’

এলিভেটরে করে উঠে এল তিনজনে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন লারসেন। মাঝে মাঝে কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে খামছেন। এই সুযোগে যাকে পাছে তার সঙ্গেই কথা বলার চেষ্টা করছে কিশোর, জুনের অ্যাক্সেন্টের ব্যাপারে। একজন অ্যাকাউন্টেন্ট জানাল, সে সেদিন ওকে দেখেছে। তবে ত্রিফকেসের ব্যাপারে কিছু বলতে পারল না। কয়েকজন জানাল, কাজ শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় পার্কিং লটে জুনের মাসট্যাং গাড়িটা দেখেছিল। তবে জোরাল কোন সূত্র কেউই দিতে পারল না।

অবশ্যে দুই গোয়েন্দাকে মাটির তলার ঘরে নিয়ে এলেন লারসেন। বক্স কাচের দরজার ওপাশে বিশাল গবেষণাগার। ঢোকার অনেকগুলো দরজা। যারা চুকছে তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্যে ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থা রয়েছে। অপরিচিতজন কিংবা যাদের ঢোকার অনুমতি নেই তাদেরকে চুকতেই দেবে না। সাবধান বাণী লেখা রয়েছে দরজার কপালে।

একটা ইলেক্ট্রনিক বক্সে একটা প্লাষ্টিকের কার্ড চুকিয়ে দিলেন লারসেন। খুলে যেতে লাগল কাচের দরজা। মুসা আর কিশোরকে বললেন, ‘আমি যা বলব, সঙ্গে সঙ্গে তাই বলবে। কোড। হ্যাঁ, বলো, মুরগীর বাক্ষার কথা কাউকে বলব না।’

তোতাপাখির বুলি আওড়ানোর মত করে বলল দু’জনেই।

‘হ্যাঁ, হয়েছে,’ তারপর গলা চড়িয়ে ডাকলেন লারসেন, গমগম করে উঠল তার কষ্ট, কেঁপে উঠল যেন গবেষণাগারের কাচের দেয়াল, ‘ডন!’

এগিয়ে এল একজন বেঁটে, মোটা, টাকমাথা' লোক। চোখে গোল্ডরিম চশমা। গায়ে ল্যাবরেটরির সাদা পোশাক। পকেটে একসারি মুরগীর মডেল ঝোলানো, সামরিক বাহিনীর লোকে মডেল যেভাবে ঝোলায় সে ভাবে। কাছে এসে অনেকটা মিলিটারির মতই স্যালুট করল।

পরিচয় করিয়ে দিলেন লারসেন, 'ডন বারোজ,' বিশাল থাবা দিয়ে চাপড় মারলেন লোকটার পিঠে। বাঁকা হয়ে গেল লোকটা। 'কল্পনাই করতে পারবে না আমার এখানে আসার আগে কোথায় কাজ করত ডন।'

নিচয় ডিজনিল্যাণ্ডে, ভাবল মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'পেন্টাগন,' জবাব দিলেন লারসেন। 'ওয়াশিংটনে ছিল ওর ল্যাবরেটরি, পেন্টাগনের পাঁচ বুক দূরে। তাহলে পেন্টাগনই ধরা যায়, যদিও ওখানে কাজ করেনি। কাছাকাছি ছিল তো। হাহ হাহ।'

আসলে, পেন্টাগন রয়েছে ভারজিনিয়ার আরলিংটনে, পটোম্যাক নদীর ধারে। চুপ করে রইল কিশোর। ভুলটা ধরিয়ে দিল না।

কাছমাছু হয়ে গেছে বেচারা ডন। ভয়ে ভয়ে রয়েছে আবার কথন পিঠে আন্তরিকতার চাপড় পড়ে। একে একে গোয়েন্দারের নাম বলে গেলেন লারসেন। হাত মেলাল ডন। ঘেমে গেছে হাতের তালু। ঠাণ্ডা।

'ডন একজন সুগন্ধ বিশারদ,' লারসেন বললেন। 'আমার আর অ্যাও ডি-র হেড,' ভুক কোঁচকালেন তিনি। 'বুবলে না? রিসার্চ অ্যাও ডেভেলপমেন্ট। খুব ভাল কাজ জানে। আমি যা জানি তা-ও শেখাব। ওন্তাদ বানিয়ে ছেড়ে দেব। চিকেন ডন বারোজ হয়ে যাবে তখন। হাহ হাহ হা! ডন, ধর, ছেলেরা ড্রিপিং চিকেন খেতে চায়? দিতে পারবে?'

কিশোর আর মুসার দিকে তাকিয়ে সন্দেহ দেখা দিল ডনের চোখে। 'ওরা সিভিলিয়ান, স্যার?'

'তাতে কোন অসুবিধে নেই,' অভয় দিলেন লারসেন। 'কোন বছর সেই-খাবারটা বানিয়েছিলাম, যেটার নাম দিয়েছিলাম উইং অন আ স্ট্রিং? একটুকরো সাবানের ওপর দড়ি পড়ে থাকতে দেখে যে খাবারটা তৈরির ভাবনা মাথায় এসেছিল আমার?'

'নাইনটিন এইটি ফাইভ,' জবাব দিল ডন।

'তারিখ?'

মাথা নাড়ল ডন।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর, 'বাইশে জুন, উনিশশো পঁচাশি।'

'দেখলে তো?' হেসে বললেন লারসেন। 'কাকে নিয়ে এসেছি? ওকে আমি পালকপুত্র বানিয়েছি এ জন্যেই। জুনকেও বলে দিয়েছি। ছেলেটা একটা চলমান রেফারেন্স বুক। একেবারে কম্পিউটারের মেমারি।' ডনের দিকে তাকালেন, 'আর সন্দেহ নেই তো তোমার? যাও, ড্রিপিং চিকেন নিয়ে এসো।'

'যাচ্ছ, স্যার,' এবাব আর স্যালুট করল না ডন, তবে ভাব সাব দেখে মনে হলো করতে পারলেই খুশি হত। সেই সঙ্গে খটাস করে বুট টুকতে পারলে তো

আরও। তবে ঘুরে যখন রওনা হলো, সাধারণ মানুষের মত না হেঁটে শার্ট করে এগোল। ল্যাবরেটরির রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে চাবি বের করে তালা খুলল।

‘ড্রিপিং চিকেনটা কি জিনিস?’ জানতে চাইল মুসা।

‘বললে বুববে? আচ্ছা, বলি,’ লারসেন বুঝিয়ে দিলেন, ‘মুরগীর মাংস থেকে পুরোপুরি হাড় আলাদা করে ফেলে, মেশিনে পিষে ফেলা হয়। বিস্কুটের ওঁড়ো মশিয়ে ভেজে পুরো বাদামী করে ফেলে তার ওপর মাখিয়ে দেয়া হয় সোনালি রঙ করা মাখন। বুবলে?’

‘ছবি দেখতে পাচ্ছি,’ কিশোর জবাব দিল।

‘ছবি?’

‘ও কিছু না।’

‘আরও কিছু জিনিস মেশানো হয়,’ লারসেন বললেন। ‘যেগুলো বললেও বুববে না। কাজেই, থাক।’

‘আমার আর শোনারও দরকার নেই,’ জিভে পানি এসে গেছে মুসার।

‘আমার ওই নতুন খাবারে বিশেষ একটা জিনিস মেশানো থাকবে, প্রতিটি বড়ার মধ্যে,’ লারসেন বললেন। ‘লোকে মজা করে থাবে। তারপরই থাবে ধাক্কা। বুঝতেই পারবে না কিসে আঘাত করল ওদেরকে।’

খাওয়া লাগল না, কথাটা শুনেই ধাক্কা খেলো দুই গোয়েন্দা। ভীষণ চমকে গেল। ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। পরম্পরের দিকে তাকাল। এক মৃহূর্ত আগেও ড্রিপিং চিকেন খাওয়ার জন্যে লোভ ছিল দু'জনের। এমনকি কিশোরও ভাবছিল, পেট এখন ভাল হয়ে গেছে, থানিকটা খাবার চেখে দেখবেই। লারসেনের কথা শোনার পর ইচ্ছেটা উভে গেছে। লোকে কেন ধাক্কা থাবে? কেন বুঝতে পারবে না কিসে আঘাত করেছে ওদেরকে? আর খাওয়ার মধ্যে আঘাতের কথা আসে কেন? ড্রিপিং চিকেনে বিষ মেশানো হবে না তো?’

থাপে থাপে মিলে যাচ্ছে। নতুন একটা খাবার আবিষ্কার করেছেন লারসেন। তার পরপরই ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখল জুন। কাকতালীয় হতে পারে...কিন্তু কিশোরের মনে হতে লাগল, এই খাবারটাই জুনের আতঙ্কের কারণ। কোথাও একটা যোগাযোগ আছে। কানের পর্দায় যেন ভাসতে লাগল কিশোরেরঃ মুরগীতে বিষ মেশাচ্ছে সে! লাখ লাখ লোক মারা যাবে!

‘খান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল ডন, ‘খুব সুন্দর হয়েছে! আর বেশ গরম!’

‘এসো,’ দুই গোয়েন্দাকে বললেন লারসেন। ‘আমার গিনিপিগ বানাতে চাই তোমাদেরকে। তোমরাই প্রথম চেখে দেখো, কেমন হলো ড্রিপিং চিকেন।’

## সাত

চেখে অনেক আশা নিয়ে কিশোর আর মুসার দিকে তাকালেন লারসেন। যেন বোঝার চেষ্টা করছেন, ওদেরকে যে সশান্ত দেয়া হচ্ছে সেটা ওরা বুঝতে পারছে কিনা।

ঘড়ি দেখল মুসা। 'লাপ্টটাইম তো হয়নি এখনও।'

'ডাক্তার বলেছেন,' কিশোর বলল। 'কোন রকম রিচ ফ্লড না খেতে। ভাজাভূজি তো একেবারে বারণ। পেটের অবস্থা ভাল না আমার।'

'ওই ডাক্তার ব্যাটাদের কথা শনো না!' প্রায় গর্জে উঠলেন লারসেন। 'ওরা তো কত কথাই বলে। সব শুনলে না খেয়ে উপোষ্ঠ করে মরতে হবে রোগীকে। এসো। এখনও গরম গরম রয়েছে ড্রিপিং চিকেন। এই সুযোগ হারালে পরে পন্তবাবে... বুঝতে পারছ না, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তোমাদেরকে। কোথায় পাঠানো হবে।'

'ঠিকই পারছি! নরকে!' ভাবল মুসা।

তর্ক করে লাভ হবে না। সন্দেহ না জাগিয়ে লারসেনকে কোন কিছু বলেই নিরস্ত করা যাবে না এখন। কি আর করে? ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে এগোল দু'জনে।

একটা টে হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ডন। দুই গোয়েন্দাকে ইশারা করল তার অফিসের দিকে যেতে। সে এগোল সেদিকে। লারসেন গেলেন না। ডনকে বললেন, টেটা রেখেই যাতে চলে আসে। কাজ আছে।

ডনের অফিসে ঢুকল কিশোর আর মুসা। স্টেইনলেস স্টিল আর কাচের তৈরি সুদৃশ্য আধুনিক টেবিলে টে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল ডন। স্যান্ডউইচের মত দেখতে চমৎকার খাবার। গরম। ধোয়া উড়ছে।

'দেখতে তো খুবই ভাল,' কিশোর বলল।

'পাগল হয়ে গেলে নাকি?' মুসা বলল, 'ওগুলো বিষাক্ত! খাওয়া একদম উচিত হবে না। এক কাজ করি, পকেটে ভরে ফেলি।'

নিজের প্যান্টের দিকে তাকাল কিশোর। আঁটো জিনিস। পকেটে ঢোকানো যাবে না, আর জোরজার করে কোনমতে ঢোকালেও উঁচু হয়ে থাকবে। স্পষ্ট বোৰা যাবে। মাথা নাড়ুল, 'হবে না।'

'তাহলে? ওয়েষ্টবাক্সেটেও তো ফেলতে পারব না। দেখে ফেলবে।'

'উঁচু হয়ে থাকলেও পকেটেই ঢোকাতে হবে। আর কোন উপায় নেই। আমি পরেছি জগিং স্যুট, পকেটই নেই।'

'কাউচের নিচে ফেলে দিলে কেমন হয়?'

'তাতেও লাভ হবে না। যে হারে গন্ধ বেরোচ্ছে, ওরা গন্ধ পেয়ে যাবে। বের করে ফেলবে। পকেটেই রাখতে হবে। ঢোকাও। জলন্দি!'

আর কোন উপায় না দেখে পকেটেই ঢোকাতে বাধ্য হলো কিশোর। আঠাল ঝোলের মত জিনিস পকেটের কাপড় ভেদ করে পা বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করল।

'আমি দরজায় চোখ রাখছি,' মুসা বলল। 'তুমি খৌজ। দেখো, কিছু বেরোয় কিনা।'

বুঝতে লাগল কিশোর। জুনের ব্রিফকেসট। ডেক্সের পেছনে, নিচে, ড্রয়ারে, কোথাও পাওয়া গেল না। ফাইল কেবিনেটে তালা দেয়া। ওর ভেতরে দেখা গেল না।

ব্রিফকেস খোঁজা বাদ দিয়ে অন্য সূত্র মেলে কিনা দেখতে শুরু করল সে। ডনের ডেঙ্ক ক্যালেণ্ডারের পাতা ওল্টাতে গিয়ে দেখল একটা পাতা নেই, হয় দিন আগের তারিখের।

মুসা শুনে বলল, ‘সেদিন শুক্রবার। জুন যে দিনের কথা মনে করতে পারছে না, যে দিন অ্যাপ্রিলেট করেছে।’

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ‘যোগাযোগ আছে কিনা বের করা দরকার,’ এই সময় পায়ের শব্দ শুনতে পেল। এগিয়ে আসছে।

ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে কিশোরকে চুপ করতে ইশারা করল মুসা।

একটু পরেই ঘরে ঢুকল ডন। প্রথমেই তাকাল টের দিকে। শূন্য। ‘বেশ বেশ, খেয়েছ তাহলে? কেমন লাগল আমাদের ড্রিপিং চিকেন?’

‘ওই জিনিস জীবনে খাইনি,’ সত্যি কথাটাই বলল কিশোর।

‘আমাদের জেনারেল শুনে খুব খুশি হবেন,’ লারসেনের কথা বলল ডন। ‘একটা জরুরী কাজে চলে গেছেন। তোমাদেরকে বলতে বলেছেন।’

‘ড্রিপিং চিকেন কার আবিষ্কার? আপনার?’

‘না,’ মাথা নাড়ল ডন। ডেঙ্কের ওপাশে গিয়ে বসল। ‘এই একটা আইটেমের জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন জেনারেল। যেতে অনেক মানা করেছিলাম, শুনলেন না। বলেছি, চেষ্টা করলে এখানেই বানাতে পারব আমরা। সোজা আমাকে বলে দিলেন, তিনি বস, যা করার তিনিই করবেন। গেলেন ফেলিঙ্গ আরোলার কাছে, মিরাকল টেক্টের মালিক। অথচ আমরা দুজনে, চিকেন কিং আর কেমিক্যাল কিং মিলেই বানিয়ে ফেলতে পারতাম।’

‘তার মানে কি আছে এতে আপনি জানেন না?’ জিজেস করল মুসা।

নিশ্চয় জানি। গবেষণা করাই তো আমার কাজ। পরীক্ষা করে বের করে ফেললাম কি কি মেশানো হয়েছে। সেই কথা জানালাম জেনারেলকে। খুশি হয়ে আরেকটা মোরগ আমাকে পুরস্কার দিয়ে দিলেন জেনারেল,’ পকেটে ঝোলানো দশ নম্বর রূপার মুরগীটা দেখাল ডন। ‘তবে স্বীকার করতেই হবে, যা আছে সব ক্লাসিক জিনিস। তোমাদেরকে অবশ্যই বলব না। বিজনেস সিক্রেট।’

‘আমরা শুনতে চাইও না,’ কিশোর বলল। ‘যা দেখলাম তাতেই খুশি আমরা। চিকেন লারসেনের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটাই তো একটা সৌভাগ্য। কি বলো, মুসা? আট দিন আগেও তো আমরা চিনতাম না, তাই না?’

শূন্য দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। দেখল, কিশোরের নজর ডেঙ্ক ক্যালেণ্ডারের দিকে। ‘ভুল করলে। আট নয়, হয় দিন আগে,’ হাসল সহকারী গোয়েন্দা।

‘আট দিন,’ জোর দিয়ে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

‘ভুল,’ ডনের ডেঙ্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। ক্যালেণ্ডার উল্টে যে পাতাটা নেই সেইখানটায় এসে থামল। ছয়দিন। গত শুক্রবার। আমি শিওর...আরে, পাতাটা কোথায়?’

‘নেই,’ এমন ভঙ্গিতে বলল ডন, যেন জানাই আছে নেই যে। ‘মুদী দোকান

থেকে আনা জিনিসের লিষ্ট লিখে রাখি ক্যালেগারে। মাঝে মাঝে পাতা ছিঁড়ে সাথে করে নিয়ে যাই।'

'ঠিক আছে, যা দেখার দেখলাম,' কিশোর বলল। 'চলি। বাড়ি গিয়ে কাপড় বদলানো দরকার।'

হাসি চাপতে গিয়ে কেশে ফেলল মুসা। নিচয় কিশোরের কাপড়ে ছড়িয়ে পড়েছে রস, আঠা লাগছে চামড়ায়, ভীষণ অস্ত্রিকর। রসের রঙ এখন বাইরে থেকে দেখা না গেলেই হয়। পকেটের উচু জায়গাটা চেপে ধরে রেখেছে কিশোর।

বেরিয়ে এল দু'জনে। প্রথমেই ময়লা ফেলার যে ভ্রামটা পেল তাতে ফেলে দিল ড্রিপিং চিকেন। তারপর বাড়ি রওনা হলো।

সেই বিকেলে ছয় বাঞ্চ চীনা খাবার নিয়ে আসা হলো। চীনের দেয়ালের মতই যেন সাজিয়ে রাখা হলো কিশোরের ওয়ার্কশপে' বাঞ্চগুলো। তিনি গোয়েন্দাই হাজির। চিকেন লারসেনের অফিসে গিয়ে কি কি করে এসেছে রবিনকে বলছে মুসা, মাঝে মাঝে কথা জুগিয়ে দিচ্ছে কিশোর।

তারপর চলল খাবারে বিষ মেশানো নিয়ে আলোচনা।

'ড্রিপিং চিকেনে বিষ মেশানোর উদ্দেশ্যটা মোটামুটি আঁচ করা যায়,' রবিন বলল। 'তার পরেও চারটে প্রশ্ন থেকে যায়। কে মেশাল, কোথায় মেশাল, কখন মেশাল, কেন মেশাল? আরেকটা সম্ভাবনাও থেকেই যায়। হেনরি অগাস্টাস এতে জড়িত, এবং খারাপ কিছু করছে।'

'জুনের ব্রিফকেস্টা পেলে হত,' কিশোর বলল। 'কিছু না কিছু পাওয়া যেতই ওতে।'

'গত শুক্রবারে জুনকে কেউ দেখেছে বলেও বলল না,' মুসা বলল। 'একজন বুড়ো লোক বাদে। তবে তার কথাও বিশ্বাস করা যায় না। কথাবার্তা কেমন অগোছাল। ভুল করে একদিনের কথা আরেকদিন বলে দিয়েছে কিনা তাই বা কে জানে।'

'এই খাবার এনেছ কেন?' আচমকা প্রশ্ন করল রবিন।

'কেন, খেতে ইচ্ছে করে না বুঝি?' প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন দিয়েই সারল মুসা।

'কোনু রেস্টুরেন্ট থেকে?'

'যেটা থেকে সব সময় আনি। ডেই ডং।'

তাহলে আর বসে আছি কেন? খেয়ে ফেলি।'

একটা বাঞ্চ টেনে নিয়ে খুলল। খুলে একটা প্যাকেট হাতে নিয়েই স্থির হয়ে গেল।

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?' জানতে চাইল মুসা। 'ফরচুন কুকির বিজ্ঞাপন করেছে নাকি বড় বড় কথা বলে?'

মোড়কের কাগজটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। নীরবে বাড়িয়ে দিল মুসার দিকে।

হাতে লেখা একটা নোট। দেখার জন্যে কিশোরও ঝুঁকে এল। লেখা রয়েছেঃ

এইমাত্র যে খাবার খেলে, তাতে বিষ মেশানো থাকতে পারত।

এবার নেই। পরের বার থাকতেও পারে। কাজেই সাবধান! অন্তত  
চিকেন কিংবের খাবার থেকে দূরে থাকবে!

## আট

পড়ার পরেও অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। তাকিয়েই রয়েছে কাগজটার দিকে।  
তারপর হঠাৎ নড়ে উঠল কিশোর। প্রায় খাবলা দিয়ে তুলে নিয়েছে বাস্ত্রের বাকি  
দুটো ফরচুন কুকি। দুটোর মোড়কেই একই হঁশিয়ারি লেখা রয়েছে।

চিংড়ি মেশানো ফ্রাইড রাইসের বাস্ত্রটা টেনে নিয়েছিল রবিন, এই হঁশিয়ারি  
পড়ার পর ঠিলে সরিয়ে দিল টেবিলের কোণে। ‘থিদে গেছে! বিষ খেয়ে মরার  
চেয়ে না খেয়ে থাকা ভাল!’

টেলিফোনের দিকে হাত বাঢ়াল মুসা।

‘কাকে করবে?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘ডেই ডং রেস্টুরেন্ট। কার কাজ জানা দরকার।’

‘করা উচিত,’ রবিন বলল।

‘না,’ নিষেধ করল কিশোর। ‘দরকার নেই।’

‘কেন?’ মুসার প্রশ্ন।

‘কারণ আমি জানি কি ঘটেছে।’

‘কী?’

‘চুপ করে আছ কেন?’ অদৈর্ঘ্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিন।

‘রেস্টুরেন্টের কোন একজন ওয়েইটার ওই কাগজ দিয়ে কুকি মুড়ে দিয়েছে।  
এবং সেটা করেছে, কেউ একজন এসে তাঁকে পাঁচটা ডলার হাতে ওঁজে দিয়ে  
করতে বলেছে বলে। ওয়েইটারকে বলেছে, এটা একটা রসিকতা। ওয়েইটারও  
কিছু বুঝতে পারেনি। করে দিয়েছে কাজটা।’

‘তুমি কি করে জানলে?’ জিজ্ঞেস করল মুসা।

‘জানি, ব্যস। বিশ্বাস করতে পারো আমার কথা।’

‘নিচয় করি�...’ রবিন শুরু করল।

মুসা শেষ করল, ‘কারণ তোমার অনুমান সাধারণত ভুল হয় না। আরও<sup>১</sup>  
একটা ব্যাপার জানি, কথা লুকাতে তুমি ওস্তাদ।’

‘বেশ, দোষই যখন দিলে, বলেই ফেলি,’ কিশোর বলল। ‘আমি জানলাম,  
অর্থাৎ বুঝতে পারলাম, তার কারণ এ রকম রসিকতা আমিও করেছি। ফরচুন  
কুকিতে।’

‘কি লিখেছিলে?’ রবিন জিজ্ঞেস করল।

‘ভাল কথাই লিখেছিলাম। লোককে হাসানোর জন্যে। এটার মত হঁশিয়ারি  
নয়। বিষ খাওয়ানোর ভয় দেখাইনি লোককে।’ একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল  
কিশোর। ‘ভাবছি, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সাবধান করা হলো আমাদেরকে।  
প্রথমবার করল মুসার গাড়ির ব্রেক নষ্ট করে দিয়ে। আর এবার তো লিখেই হৃষকি

দিল। প্রথমে মনে করেছিলাম, ব্রেক নষ্ট করার ব্যাপারটার সঙ্গে খাবারে বিষ মেশানোর যোগাযোগ নেই। এখন মনে হচ্ছে, আছে। অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে, বিশ্বাস না করে আর পারা যাচ্ছে না। আরও সতর্ক থাকতে হবে। নজর রাখা হচ্ছে আমাদের ওপর।'

'যে-লোক এই কাজ করছে,' মুসা অনুমান করল। 'সে আর্মি ক্যামেফ্লেজ জ্যাকেট পরে, পোরশে কনভার্টিবল গাড়ি চালায়। ঠিক?'

'হলে অবাক হব না। আমাদের ব্যাপারে খৌজখবর রাখে সে।'

কিশোরের কথা শেষ হতে না হতেই ফোন বেজে উঠল। চমকে দিল তিনজনকেই। রিসিভার তুলে নিল কিশোর। কানে ঠেকিয়ে বলল, 'তিন গোয়েন্দার কিশোর পাশা বলছি।'

'তোমাকেই খুঁজছি!' অন্য প্রাণে গমগম করে উঠল একটা কষ্ট। 'চিকেন হার্বার্ট লারসেনের সঙ্গে কথা বলছ তুমি, পুত্র।'

রিসিভারের মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে দুই সহকারীকে ফিসফিস করে জানাল গোয়েন্দাপ্রধান, 'চিকেন!'

'কি জন্যে করেছে জিজ্ঞেস কর,' মুসা বলল। 'কুকির মোড়কের লেখাটার কথাটা জানে কিনা তা-ও জিজ্ঞেস কর।'

মাথা নেড়ে মুসাকে চূপ থাকতে বলল কিশোর।

'শোনো,' লারসেন বললেন। 'একটা সুখবর আছে তোমাদের জন্যে। কাল ড্রিপিং চিকেনের বিজ্ঞাপন তৈরি হবে। টিভিতে যাবে। চিকেন হিস্টরি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। হলে তোমাকে ছাড়া পারব না।'

নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন কিশোর। ঠিক এ রকম সুযোগই চাইছিল সে। চিকেন লারসেনের কাছাকাছি থেকে তাঁর ওপর নজর রাখতে পারে এমন কিছু।

'কখন? কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আল্টা ভিটা ড্রাইভের মালচিন মিস্ট্রি স্টুডিওতে। একটায়। সময়মত হাজির হয়ে যাবে আমার টিম।'

কেটে দেয়া হলো লাইন।

সেদিন অনেক রাতে, মুসা আর রবিন চলে যাওয়ার পর চিকেন লারসেনের বিজ্ঞাপনগুলো রেকর্ড করে রাখা একটা ডিডিও ক্যামেট চালিয়ে দেখতে বসল কিশোর। বড় একটা ডেক্সে বসেন তিনি। ওপরে জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো, খুবই অগোছাল। যেন একাধারে ওটা একটা অফিস, লাইব্রেরি আর গেম রুমের মিশ্রণ। নানা ধরনের বেশ কিছু বিজ্ঞাপন আছে। কিশোরের পছন্দ 'হেট আ হ্যামবারগার উইক' নামের বিজ্ঞাপনটা, যেটাতে একটা গরুর মুখে গলিত মাখন ছিটিয়ে দেন লারসেন। আরেকটা ভাল বিজ্ঞাপন আছে। সেটাতে ক্যামেরার দিকে সারাক্ষণ পিঠ দিয়ে থাকেন, কারণ তিনি বোঝাতে চান রেগে গেছেন, জন্মদিনের তারিখ ভুল করে ফেলেছেন বলে।

তবে তার সব চেয়ে পছন্দ, যেটাতে লারসেন দুটো নতুন ধরনের খাবার

পরিবেশন করেন। একটার নাম ক্র্যাকলিন ক্রাপ্তি, আরেকটা বার্নিং বারবেকু। লাস ভেগাস-এর এক মন্ত্রীর বিবাহবার্ষিকীতে ভোজ দেয়া হয়। তাতে আস্ত দুটো মুরগীকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রান্না করে টেবিলে সাজিয়ে দেয়া হয়। একটাকে পরানো থাকে বরের পোশাক, আরেকটাকে কনের। কাপড় দিয়ে নয়। মাথন আর খাবার উপযোগী অন্যান্য মালমশলা দিয়ে। সেখানে উপস্থিত থাকেন চিকেন লারসেন। নানা রকম মজার কথা বলেন।

টেপটা শেষ হয়ে গেলে ভিসিআর বক্ষ করে শুভে গেল কিশোর। কিন্তু অস্থির একটা রাত কাটাতে হলো। ভাবনার মধ্যে কেবলই ঘুরে ফিরে আসতে লাগল জুনের কথা। ঘোরের মাঝে কি বাবার কথাই বলেছিল সে? লারসেনই খাবারে বিষ মেশানোর পরিকল্পনা করেছেন? তিনিই যদি করে থাকেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ মারার সিদ্ধান্ত তিনি কেন নিয়েছেন?

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় একটায় বেভারলি হিলের কাছে মালচিন মিঞ্চ স্টুডিওতে হাজির হলো রবিন আর কিশোর। দুই মিনিট পরে মায়ের গাড়িটাতে করে এল মুসা আর ফারিহা।

‘এই দেখ,’ কিশোরকে বলল রবিন। ‘গাড়ি নেই দেখে তোমার কত অস্থিরতা। মুসারটা যে থেকেও নেই? খালি খালি তো গজগজ করো...’

‘ও তো ওর মায়েরটা নিয়ে এসেছে।’

‘তুমিও ইয়ার্ডেরটা নিয়ে আসতে পারো।’

‘ওই ভাঙা পিকআপ কে চালাতে যায়,’ এক মুহূর্ত চুপ থাকল কিশোর। ‘বেশ, মুসার গাড়িটা যতদিন ঠিক না হয়, চুপ থাকব। হলেই আবার শুরু করব।’

‘তোমাকে কে কিনে নিতে মানা করেছে?’

এই প্রশ্নটা করলেই চুপ হয়ে যায় কিশোর। কারণ সে যেভাবে যে জিনিস চায়, সেটা অল্প পয়সায় জোগাড় করা কঠিন। ও চায়, এমন একটা গাড়ি, যাতে অনেক ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি সাজানো থাকবে। গোয়েন্দাগিরির অনেক সুবিধে হবে। অর্ডার দিয়ে বানাতে হবে সে সব। অত টাকাও নেই, আপাতত কিনতেও পারছে না। কিন্তু ক্ষোভটা ঠিকই প্রকাশ করতে থাকে। কিংবা হয়তো ক্ষোভের মাধ্যমেই অটো সাজেশন দেয় নিজেকে, আর কিছুদিন ধৈর্য ধর, কিনব, কিনব!

স্টুডিয়োয় ঢোকার মুখে দেখা হয়ে গেল জুনের সঙ্গে। মাথায় একটা রূপার মুকুট পরেছে। আর মুকুটের ওপর অবশ্যই বসে আছে একটা রূপার মুরগী।

‘এসেছ,’ কিশোরকে দেখে হেসে বলল জুন। ‘বাবা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল। নতুন কোন খবর আছে?’

‘না। তবে কাল রাতে কিছু ফরচুন কুকি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাতে বুঝেছি, ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা।’

‘গুড়। আমার ব্রিফকেসটা যত তাড়াতাড়ি পারো বের করে দাও। ভেতরে কি ছিল এখনও মনে করতে পারছি না। তবে ওটা আমার চাই। মনে হচ্ছে ওটাতে জরুরী কিছু আছে।’

তারপর তিন গোয়েন্দা আর ফারিহাকে নিয়ে চলল স্টুডিওর কাছে ঘেরা একটা

অংশে, প্রোডাকশন বুদে। চিকেন লারসেনের অফিসের অনেকেই আছে ওখানে, ডন বারোজ সহ।

বিজ্ঞাপনের জন্যে সেট সাজানো হয়েছে। টেবিলে চিঠির স্তুপ, শুন্য কফির কাপ, রবারের মুরগী, রোস্ট করা মুরগীর ছবি—তত্ত্বাত্মক শ্রেণীর আর্টিস্ট দিয়ে আঁকানো হয়েছে ইচ্ছে করেই, আর হ্যালোডেইন চিকেন কষ্টিম পোশাক পরা জুনের শিশুকালের একটা ছবি।

অবশ্যে মাইক্রোফোনে পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেন্টকে ডাকলেন পরিচালক, 'আমরা রেডি। চিকেন লারসেনকে ডেকে আনাও। দেখো, মেকআপ হয়েছে কিনা।'

'মিনিটখানেক পরে চুকলেন লারসেন। পরনে লাল জগিং স্যুট, সাদা এবং নীল স্ট্রাইপ দেয়। ওপরের ঠোট আর নাক জুড়ে আটকানো রয়েছে রবারের তৈরি একটা মুরগীর ঠোট। হাতে রূপার তৈরি বড় একটা অ্যানটিকের টে, রূপার ঢাকনা দেয়। তীব্র আলোয় এসে সামান্য কুঁকড়ে গিয়ে বুদের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলেন।'

'আমার লোক আছে?' ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আছে, মিষ্টার লারসেন,' পরিচালক বললেন। স্যুইভেল চেয়ারে বসেই ঘুরে তাকালেন কিশোরের দিকে। চিকেন লারসেনের অফিশিয়াল টেন ইয়ার অ্যানিভারসারি টি-শার্ট গায়ে দেয়ানো হয়েছে তাকে। শার্টে একটা মুরগীর ছবি আঁকা, মাথার জায়গায় মুরগীর মাথার পরিবর্তে আকা হয়েছে লারসেনের মুখ।

'ডন বলেছে,' কিশোরকে বললেন লারসেন। 'ড্রিপিং চিকেনের স্যাম্পল খেয়ে খুব খুশি হয়েছে। আজ সবার জন্যেই প্রচুর পরিমাণে নিয়ে আসা হয়েছে।'

ফিসফিস করে মুসা বলল কিশোরের কানে, 'অত ভাল প্যান্টস পরে আসা উচিত হয়নি আজ।'

আরাম করে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিলেন লারসেন।

পরিচালক ঘোষণা করলেন, 'দয়া করে চুপ করুন সবাই। ড্রিপিং চিকেন। টেক ওয়ান!'

ক্যামেরার চোখের দিকে তাকিয়ে যেন চিডি দর্শকদের সঙ্গে কথা বলতে আরঝ করলেন লারসেন।

'বস্কুলা,' বলছেন তিনি। 'আমি, আপনাদের প্রিয় চিকেন লারসেন বলছি। আপনারা জানেন, অহেতুক আপনাদের সামনে হাজির হই না আমি। হই তখনই, যখন আপনাদের পকেট খালি করে আমার পকেট ভরানোর কোন একটা উপায় বের করে ফেলি। বিশ্বাস করুন, এই বার আগের চেয়ে অনেক বেশি খসাব আমি, কিছুতেই ধরে রাখতে পারবেন না। চাকা আবিষ্কারের সময় আমি সেখানে হাজির ছিলাম না। পেনিসিলিন আবিষ্কারের সময় ছিলাম না। এমনকি পেপার ক্লিপ জাতীয় জিনিসগুলো যখন আবিষ্কার হয়, তখনও সেখানে হাজির ছিলাম না। তিহাসের অসব বিস্ময়কর মৃহৃত্তগুলোতে আমার কোন প্রয়োজন পড়েনি। কিংবা যতো প্রয়োজন হয়েছিল, খবরও দেয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই খবর আমাকে বলতে আবারে বিষ

ভুলে গেছে আমার সেক্রেটারি। আর এই সন্দেহেই আমি তাকে চাকরি থেবে বিদেয় করে দিয়েছি। হাহ হাহ হা! তবে আজকে আমি আর শুধু ইতিহাস তৈরি করতেই যাচ্ছি না, ইতিহাসকে খেয়ে ফেলতে চলেছি।'

রূপার টের ওপর থেকে ঢাকনা ভারালেন লারসেন। ধোঁয়া উঠতে লাগল স্তুৎ করে রাখা ড্রিপিং চিকেন থেকে। খাবারের চেহারা দেখেই উহ আহ শুরু করে দিঃ প্রোডাকশন বুদের লোকেরা।

একটা স্যান্ডউচ তুলে নিয়ে মুখের কাছে নিয়ে গেলেন লারসেন। এগিয়ে গেল ক্যামেরা, কাছে থেকে ছবি তোলার জন্যে। ঢোক গিলল তিনি গোয়েন্দা সত্যিই কি তিনি খাবেন?

'সেই সভ্যতার গোড়া থেকেই যে কাজ করার চেষ্টা করে এসেছে মানুষ পারেনি, সেটাই সফল করেছি আমি। সৃষ্টি করেছি ড্রিপিং চিকেন। প্রতি কামড় খাবার রসময় করে তুলবে রসমাকে। আরও ব্যাপার আছে। প্রতিটি স্যান্ডউচে ভেতরে একটা বিশেষ জিনিস ভরে দিতে বলেছি আমার রাঁধনিকে। এমন কিছু, য লোকে কল্পনাই করতে পারবে না। দেয়া হয়েছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, দেখতে চাইছি, এখনই দোকানে ছুটছেন কেনার জন্যে। কিনে গপগণ করে গিলতে থাকুন। এই ভাবে...'

বলেই হাঁ করে বিরাট এক কামড় বসালেন লারসেন। বড় একটুকরে স্যান্ডউচ কেটে নিয়ে চিবাতে লাগলেন। রঙিন রস গড়াতে শুরু করল ঠোঁটের দুঁট কোণ থেকে। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে দরাজ হাসি হাসলেন।

'কাট!' চিৎকার করে আদেশ দিলেন পরিচালক। 'দারুণ হয়েছে!'

কয়েকটা আলোর উজ্জ্বলতা কমিয়ে দেয়া হলো। উত্তেজনা কমে গেল বুদে লোকের। ফারিহা বলল গোয়েন্দাদেরকে, 'ঐতিহাসিক একটা লেকচার দিলো লারসেন!'

কিন্তু ওর কথায় কান নেই তিনি গোয়েন্দার। স্টুডিওর কাচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে লারসেনের দিকে। চিবানো ড্রিপিং চিকেন গেলেননি তিনি মুখ থেকে বের করে ফেলে দিলেন ওয়েষ্ট বাক্সেটে।

মনে হলো, যেন তিনি জানেন বিষ রয়েছে ওই খাবারে। মানুষের শরীরে জন্যে ক্ষতিকর, মারাত্মক বিষ।

## নয়

টেলিভিশনের ব্যাপারে ভালই জ্ঞান আছে কিশোরের। বুঝতে পারছে, ড্রিপিং চিকেনের শুটিং শেষ হয়নি। তাই বলে এটাও ভাবেনি, আরও পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলবে। আরও বিশবার অভিনয় করলেন লারসেন। প্রতিবারেই বড় করে কামড় বসালেন স্যান্ডউচে, প্রতিবারেই পরিচালক 'কাট' বলার পর মুখ থেকে বের করে ফেলে দিলেন।

সব শেষ হওয়ার পর লারসেন চিৎকার করে বললেন, 'এসো, এবার পাঁ

হোক!' উপস্থিতি সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেন ড্রিপিং চিকেন চেথে দেখার জন্য। একপাশে একটা মাইক্রোওয়েভ রাখা আছে। খাবার গরম করে নেয়ার জন্য। টেকনিশিয়ান থেকে শুরু করে বুদ্ধি যত ধরনের লোক আছে সবাই ছুটে এল ওই খাবার খাওয়ার জন্য।

তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।

কেউ মারা গেল না। কারও পেট ব্যথা করল না, পেট চেপে ধরল না কেউ। বিষক্রিয়ার কোন লক্ষণই দেখল না। এক ধরনের গোঙানিই শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে, আহ উহ করছে লোকে, সেটা খাবারের স্বাদের কারণে।

ধীরে ধীরে ডেক্সের দিকে এগিয়ে গেল কিশোর, যেখানে রূপার টেতে রাখা আছে ড্রিপিং চিকেন। আর মাত্র দুটো স্যাগুটাইচ বাকি। একটা নেয়ার জন্য সবে হাত বাড়িয়েছে, কাঁধের ওপর দিয়ে রবিন বলল ফিসফিসিয়ে, 'কে কে স্যাগুটাইচ নেয়নি, লক্ষ্য করেছ?'

ঘূরে তাকাল কিশোর।

'ডন বারোজ আর চিকেন লারসেন,' রবিন বলল। 'কেন যাচ্ছে না?'

দ্বিধা করতে গিয়েই সুযোগটা হারাল কিশোর। অল্প বয়েসী এক মহিলা এগিয়ে এসে 'এক্সকিউজ মী' বলে সরিয়ে দিল তাকে, প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে নিল প্লেটের অবশিষ্ট দুটো স্যাগুটাইচ। 'ভাবছিলাম, একটা নিয়ে যাব, আমার এক বন্ধুর জন্য। কিন্তু এতই মজা, নিতে ইচ্ছে করছে না,' বলে কিশোরের মুখের ওপরই কাপড় বসাল একটাতে। আরেকটাও খাবে, বোৰা যাচ্ছে।

পরম্পরের দিকে তাকাল রবিন আর কিশোর। নিরাশার দৃষ্টিতে।

কোনমতে কঠস্বর শান্ত রেখে বলল, 'থাক, অত ভাবনা নেই। খেতে ইচ্ছে করলে যখন তখন গিয়ে লারসেনের রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে আসতে পারব।'

শেষ হয়ে আসছে পার্টি। বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। বন্ধ জায়গায় থেকে দম আটকে আসছিল, খোলা বাতাসে বেরিয়ে যেন বাঁচল। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে ফারিহা আর জুনের জন্য।

বেরিয়ে এল দু'জনে। কথা বলতে বলতে আসছে। কিশোরদের কাছে 'এসে ফারিহা তার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'আমি জুনদের বাড়িতে যাচ্ছি। কাপড়গুলোর জন্যে।'

এটো ভাল লাগল না কিশোরের। সে চায়, কোন একটা ছুতো রেখে দিক ফারিহা, যাতে দরকার পড়লেই জুনের ওখানে যেতে পারে। জুন আরেক দিকে ফিরতেই মাথা নেড়ে ফারিহাকে ইশারা করল সে। বুরুল মনে হলো ফারিহা। কারণ কিশোরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। তারপর গিয়ে উঠল জুনের গাড়িতে।

'গাড়ি বটে একখান,' মুসা বলল। 'চিকেনমোবাইল নাম রেখে দেয়া যায়।' অর্ডার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ক্যাডিলাক কনভারটিবলটা। হলুদ আর কমলা রঙের বডি। হড়ের ওপর বড় করে আঁকা রয়েছে মুরগীর ছবি আর চিকেন লারসেন রেস্টুরেন্টের নাম। সামনের গাড়িকে সরার জন্যে হৰ্ন টিপলেন লারসেন। কুকুরক-কুক করে মোরগের ডাক দিয়ে উঠল বাঁশিটা।

খাবারে বিষ

‘যাচ্ছেন কোথায়?’ কিশোরের প্রশ্ন।

‘হয়তো ডিনার খেতে,’ জবাৰ দিল মুসা।

‘মুসা, পিছু নেয়া দৰকাৰ,’ গাড়িটার দিকে তাকিয়েই রয়েছে কিশোর। ‘তুমি যাও। আমি আৱ রবিন ডন বারোজেৰ পিছু নেব। দেখি কে কোথায় যায়?’

মুসা রওনা হয়ে গেল। রবিনেৰ ফোক্সওয়াগনে উঠল কিশোর। ডন গাড়ি নিয়ে রওনা হতেই তাৰ পিছু নিল। ওৱা গাড়িটাও বিচ্ছি। লম্বা শৱীৱেৰ একটা লিঙ্কন টাউন কাৰ। দুই পাশে আঁকা লারসেন রেষ্টুৱেন্টেৰ মনোগ্রাম।

কয়েক ঘণ্টা ধৰে তাৰ পেছনে লেগেই রইল রবিন আৱ কিশোর। প্ৰথমে সাগৱেৰ ধাৱেৰ একটা রেষ্টুৱেন্টে গিয়ে ডিনার খেলোঁ ডন। একা। তাৰপৰ গেল শুগারলোফ ক্যানিয়নে পাহাড়েৰ কোলে তৈৰি একটা ছোট বাড়িতে। অনুকৰাব হয়ে গেছে তখন। আৱও বাড়িঘৰ আছে ওখানে। কিন্তু এত দূৰে দূৰে, দেখে মনে হয় ওখানে যাবা বাস কৱে তাৰা পড়শীদেৱ এড়িয়ে চলে। কিংবা নিঃসঙ্গ থাকতে ভালবাসে।

ডনেৰ বাড়িৰ নিচে পাহাড়েৰ উপত্যকায় গাড়ি রাখল রবিন। দু’জনেই ভাবছে, এৱপৰ কি কৱবে?

‘ভেতৱে তো চুকছে না,’ রবিন বলল। দু’জনেই গাড়ি থেকে নেমে একটা ঘন ঝোপে চুকে নজৰ রাখছে। ‘পেছনে চলে যাচ্ছে কেন?’

‘চলো, দেখি,’ উঠে দাঢ়াল কিশোর।

আৱেকটা মিনিট সময় দিল ওৱা ডনকে। তাৰপৰ এগোল। লম্বা ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে বাড়িৰ পাশ ঘুৱে সকু একটা পথ ধৰে চলল ডন যেদিকে গেছে। বাড়িৰ ভেতৱে অনুকৰাব। পেছন দিকে এসে দেখল, বাইৱেটা আলোকিত কৱাৰ ব্যবহৃ রয়েছে গাছেৰ ডালে বাৰ্ব ঝুলিয়ে।

‘বেড়া,’ দেখতে দেখতে বলল কিশোর। ‘আকাৰ-আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে ওপাশে সুইমিং পুল আছে।’

তাৰ কথা শ্ৰেণও হলো না, ঝপাং কৱে শব্দ হলো পানিতে ৰাঁপিয়ে পড়াৰ।

‘আয়, জলনি আয়,’ ডনেৰ গলা শোনা গেল। ‘ওৱকম কৱছিস কেন?.. ওয়ান...টু...গ্ৰী...নাম!’

আৱেকবাৰ ঝপাং শোনা গেল।

‘ওৱ সঙ্গে কৱা আছে?’ রবিনেৰ প্ৰশ্ন। তাকাল কিশোৱেৰ দিকে।

‘চলো, দেখি।’

মাথা ৰাঁকিয়ে সায় জানাল রবিন। এগোল দু’জনে। আস্তে কৱে গেট খুলে চুকে পড়ল ভেতৱে। একটা আউটডোৱ শাওয়াৰ আৱ স্বানেৰ উপযোগী ছোঁ একটা ঘৰ আড়াল কৱে রেখেছে পুলেৰ গভীৰতম অংশটা। পা টিপে টিপে ঘৰটা দিকে এগোল দু’জনে। পাশ থেকে উকি দিয়ে দেখাৰ ইচ্ছে।

হঠাৎ পুাটিকেৱ একটা হোস পাইপে পা বেধে গেল কিশোৱেৰ। হুমড়ি খেড়ে পড়ল। চোখেৰ পলকে আবিষ্কাৰ কৱে ফেলল দুই গোয়েন্দা, কাদেৱকে গোসু কৱাছিল ডন। প্ৰচণ্ড ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। পানিতে দাপাদাপি কৱে দ্রুত সাঁততে

উঠে এল কুকুরদুটো। যা তা কুকুর নয়। ডোবারম্যান পিনশার!

‘ধর! ধর!’ চিৎকার করে আদেশ দিল ডন। ‘নিশ্চয় চোর!’

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে গেটের দিকে ছুটল কিশোর। কনুই যে ছড়ে গেছে খেয়ালই করল না। ওর আগেই ছুটতে শুরু করেছে রবিন। ছুটছে আর চিৎকার করছে সাহায্যের জন্যে। কিন্তু কে শুনবে ওদের চিৎকার? সব চেয়ে কাছের পড়শী রয়েছে মাইলখানেক দূরে।

বাড়ছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ। গেটটা কোথায়? সরিয়ে ফেলল নাকি কেউ? আসলে, এতই ভয় পেয়েছে ওরা, সামনে কয়েক ফুট দূরের গেটটাও যেন চোখে পড়ছে না। ওদের মনে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে কেবল দৌড়েই চলেছে, পথের শেষ আর মিলছে না।

অবশ্যে গেটের কাছে পৌছল রবিন। কিশোর বেরোতেই ধাক্কা দিয়ে লাগিয়ে দিল ওটা। ডেতরে আটকা পড়ল কুকুরগুলো। একটা মুহূর্ত নষ্ট করল না ওরা। গাড়ির দিকে ছুটল।

এবারও আগে পৌছল রবিন। ড্রাইভিং সীটে বসেই ঠেলে খুলে দিল প্যাসেজার সীটের দরজা। কিশোর উঠে দরজা লাগানোর আগেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাতে শুরু করে দিল।

চলতে শুরু করল গাড়ি। ‘ওফ, বড় বাঁচা বাঁচলাম!’ এখনও হাঁপাচ্ছে রবিন।

কথা বলতে পারছে না কিশোর, এতই হাঁপাচ্ছে। মনে হচ্ছে বুকের খাচা ভেঙে বেরিয়ে পড়বে হৃৎপিণ্ডটা।

পুরোপুরি শান্ত হতে হতে গাড়িটা সরে চলে এল কয়েক মাইল দূরে। বলল, ‘লাভ হলো না। দেখতে পারলাম না কিছু। একটা কথাই জেনে এলাম, ডনের বাড়িতে সিকিউরিটি খুব কড়া। কেন? চলো, হেডকোয়ার্টারে। ওখানে বসেই আলোচনা করব।’

অনেকক্ষণ পর ওয়ার্কশপে বসে ডনের বাড়িতে ঢোকার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা মুসা এবং ফারিহাকে জানাল কিশোর আর রবিন।

এরপর মুসার রিপোর্ট করার পালা এল। সে বলল, ‘চিকেন লারসেনকে অনুসরণ করে তো গেলাম। ডেগ আউট রেটুরেন্টটা চেনো তো? ওখানে চুকল। একটা শেফ’স সালাদ কিনে নিয়ে সোজা গেল ফেলিন্স আরোলার অফিসে।’

‘মিরাকল টেস্টে?’ ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

‘হ্যাঁ। আরোলার অফিসটা লং বীচে। ল্যাবরেটরি আছে, একটা গুদামঘর আছে।’

‘নিরাপত্তার ব্যবস্থা কেমন?’

‘দারোয়ানগুলোকে তো তেমন কড়া মনে হলো না। নিরীহ, গোবেচারা চেহারা। তবে ঢোকার মধ্যে সিকিউরিটি সিসটেম ভীষণ কড়া। অনেকগুলো অ্যালার্ম আর একটা কম্পিউটার কীপ্যাড পেরিয়ে যেতে হয়।’

ফারিহার দিকে তাকাল কিশোর। কিছু জিজ্ঞেস করল না, তবে ভঙ্গিটা তোমার-কি-থবর?

‘ব্যবস্থা করে এসেছি,’ মাথা কাত করে হাসল ফারিহা। ‘কাপড়গুলো আমাকে ফিরিয়ে দিল জুন। কি করি ভাবতে লাগলাম। শেষে কায়দা করে ওগুলোতে কফি ফেলে দিলাম। যেন হঠাতে করে হাত ফসকে পড়ে গেছে এমন ভাব করলাম। ও কিছু বোঝেনি। আহা উহু করল খানিক। শেষে বলল, ধূয়ে দেবে। কিছুতেই আমাকে আনতে দিল না। কাল আবার যাব আনার জন্যে।’

‘পরের দিন গেলেও পারো,’ কিশোর বলল। ‘কিংবা তার পরের দিন। যাক, ভাল কাজই করে এসেছে,’ হঠাতে ওয়ার্কশপের দরজার দিকে ঘুরে তাকাল সে। ঠোটে আঙুল রেখে চুপ থাকতে ইশারা করল মুসাকে। তার সঙ্গে যেতে বলল। দ্রুত এগিয়ে গেল দু’জনে। দু’পাশের দরজার কাছে পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। তারপর হাঁচকা টানে তার কাছের দরজাটা খুলে ফেলল কিশোর।

বাইরে অক্ষকার। কেউ নেই। জুতোর বাস্ত্রের চেয়ে বড় একটা বাস্ত্র পড়ে আছে। বাদামী কাগজে মোড়া। লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। হাতে লেখা একটুকরো কাগজ লাগানো রয়েছে; কিশোর পাশার জন্যে।

পাশে এসে দাঁড়াল মুসা। জুতোর ডগা দিয়ে ছুঁয়ে দেখল। তারপর ঠেলে সরিয়ে দিল।

‘বেশ ভারি।’

বুঁকে তুলে নিল বাস্ত্রটা কিশোর। ‘হ্যাঁ, ভারিই।’

‘খুলবে নাকি?’ কিশোরকে ওটা বয়ে আনতে দেখে জিজ্ঞেস করল রবিন।

‘না না, খুলো না।’ বাধা দিল ফারিহা। ‘বোমাটোমা থাকতে পারে।’

একটা মিনিট চুপ করে রইল কিশোর। কান পেতে শুনছে বাইরে কোন শব্দ শোনা যায় কিনা। অনুমান করার চেষ্টা করছে বাস্ত্রের ভেতর কি আছে। বাইরে কি কেউ অপেক্ষা করছে এখনও? সতর্ক রয়েছে মুসা আর রবিন। টান টান হয়ে আছে স্বায়। বিপদ দেখলেই প্রতিরোধ করার জন্যে ঝাপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

অবশ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। সুতোটা খুলল। হাতের তালুতে রেখে আরেকবার আন্দাজ করার চেষ্টা করল। যা-ই আছে, বাস্ত্রটা কাত করলেই নড়ছে ভেতরে। আন্তে আন্তে বাদামী কাগজের মোড়ক খুলল সে। বুঝতে পারেনি, মুখের দিকটা কাত করে রেখেছিল। টপ টপ করে কয়েক ফোটা তরল পদার্থ পড়ল পায়ের ওপর।

চিংকার করে উঠল ফারিহা।

কিশোরের মুখ সাদা হয়ে গেল।

কিশোরের জুতোয় পড়েছে কালচে লাল রক্তের ফোটা। বাস্ত্রের ভেতর থেকে বেরোল একটা মরা মুরগী, সদ্য গলা কেটে খুন করা হয়েছে। ভেতরে একটুকরো কাগজ পাওয়া গেল, রক্তের ছোপ লেগে আছে।

কাগজটার ভাঁজ খুলল কিশোর। লেখা রয়েছে :

কিশোর পাশ—

তোমার স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভাল। বেশ মোটাতাজা ও হয়েছ, জবাই করার উপযুক্ত। মুরগী মোটাতাজা হলেই তো জবাই করে লোকে।

খাচার বাইরে আছ, বাইরেই থাকো। তোকার চেষ্টা কোরো না।  
অন্যের ব্যাপারে নাক গলিও না। শেষবারের মত সতর্ক করলাম!

## দশ

থ্রপ! থ্রপ! গ্যারেজের দরজায় বার বার বলটা ছুঁড়ে মারছে মুসা। সুন্দর সকাল। উজ্জ্বল রোদ। কয়েকবার ওরকম করে দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠে জালের ভেতর দিয়ে বলটাকে গড়িয়ে দিল সে। ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। 'অ্যাই, কিশোর, কি ভাবছ? খেলবে?'

'আমি ভাবছি কাল রাতের কথা। গলাকাটা মুরগীর কথা।'

'জানি আমি। হঙ্গাখানেক দুঃস্থপুর দেখার জন্যে যথেষ্ট। সে জন্যেই তো খানিকটা ব্যায়াম করছি। ব্যায়াম দুশ্চিন্তা দূর করে। তোমার জুতো থেকে রক্ত মুছেছ?'

বীভৎস দৃশ্যটার কথা মনে পড়ল আবার কিশোরের। কাটা গলা থেকে টপ টপ ঝরছে রক্তের ফোটা। মানুষের গলা কাটলেও ওরকম করেই ঝরবে। যেমন ধরা যাক, তার....

আরেকবার বলটা নিয়ে নেটের দিকে দৌড়ে গেল মুসা।

'দুশ্চিন্তাটা আপাতত থাক না,' কিশোর বলল। 'ব্যায়াম না হয় না-ই করলাম। ভাবছি, কে পাঠাল ওটা? চিকেন লারসেনের কাছ থেকে দূরে থাকতে কে বলছে আমাকে? লারসেন নিজে এই কাজ করেছে এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। তিনি বরং আমাদেরকে কাছে ঘেষতেই বলেন। আমাকে দিয়ে বিজ্ঞাপন করানোরও ইচ্ছে আছে।'

'কিশোর, জবাবগুলো কি আমার কাছে চাইছ?' মাথা নাড়ল, 'আমাকে মাপ করে দাও। ওকাজগুলো তুমিই সার। ধাঁধা সমাধানের ব্যাপারে যে আমি কত বড় এক্সপার্ট, ভাল করেই তো জানো।'

ওর দিকে তাকিয়ে হসল কিশোর। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বলটা নিল মুসার হাত থেকে। তারপর ছুঁড়ে মারল জাল সই করে। নেটের ধারেকাছে গেল না বল।

'হচ্ছে,' ভরসা দিল মুসা। 'একটু প্র্যাকটিস করলেই পারবে...'

'এক মাইল দূর দিয়ে গেল, আর তুমি বলছ পারব...'

ড্রাইভওয়েতে চুকল রবিনের ফোর্সওয়াগন। ভট্টেট ভট্টেট করছে ইঞ্জিন। হৰ্ন বাজাল একবার সে। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

'অ্যাই, কেমন আছ তোমরা?' এগিয়ে এসে বলল সে। 'সকালের কাগজ দেখেছ?' ভাজ করা একটা খবরের কাগজ কিশোরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'পয়লা পাতার বিজনেস সেকশনটা দেখো।'

বল নিয়ে ব্যস্ত হলো মুসা। বার বার জালের মধ্যে ছুঁড়ে দিতে লাগল।

কিশোর পড়তে লাগল লেখাটা।

'চমৎকার,' কয়েক মিনিট পর মুখ তুলে বলল সে। 'একেবারে সময়মত

দিয়েছে। তাহলে এই ব্যাপার। লারসেনের রেস্টুরেন্ট কেনার জন্যে খেপেই গেছে মনে হচ্ছে হেনরি অগাস্টাস। হ্ম...একটা ফোন করা দরকার।'

পাঁচ মিনিট পর মুসাদের বসার ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। মুখে বিচ্ছিন্ন হাসি।

'কাকে করেছিলে?' জানতে চাইল মুসা।

'হেনরি অগাস্টাসকে। মনে হলো, ওর ব্যাপারে খোজখবর নেয়ার সময় হয়েছে। চিকেন লারসেনের রেস্টুরেন্ট কিনে নিতে না পারলে খাবারে বিষ মিশিয়ে সে তাঁর ব্যবসা নষ্ট করার চেষ্টা করতেই পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক।'

'সে কি বলল?'

'তার সঙ্গে কথা হয়নি। নেই অফিসে। সেক্রেটারি বলল, শহরের বাইরে গেছে। কোথায়, জানো?'

'আমি জানব কি করে? আমি তো এখানে বল খেলছিলাম।'

'পিটালুমায়,' ঘোষণা করল যেন কিশোর। 'স্যান ফ্র্যান্সিসকোর উত্তরে। ওখানেই চিকেন লারসেনের মুরগীর খামার।'

ঘন্টাখানেক পরেই স্যান ফ্র্যান্সিসকো যাওয়ার প্লেনে চাপল কিশোর আর মুসা। জুনকে ফোন করেছে রওনা হওয়ার আগে। তদন্ত করতে যা খরচ হবে, দিতে রাজি হয়েছে জুন। ও কল্পনাও করতে পারেনি, ওর বাবার ব্যাপারেও খোজ নিচ্ছে তিন গোয়েন্দা।

রবিন সঙ্গে আসতে পারেনি। সেই একই কারণ। অফিসে কাজ বেশি, ঝামেলা। দুটো বিবাহ উৎসবে একই ব্যাপের বাজনা বাজানোর কথা একই দিনে, ব্যবস্থা করাটা বেশ কঠিন। সময়ের একটু হেরফের হলেই সব পও হয়ে যাবে। আর ব্যর্থতার দোষটা তখন এসে পড়বে ওর ঘাড়ে। এসব চাপ যখন পড়ে, তখনই ভাবতে আরম্ভ করে সে, ট্যালেন্ট এজেন্সির চাকরিটা ছেড়েই দেবে।

স্যান ফ্র্যান্সিসকো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নেমে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল কিশোর। মসাকে নিয়ে চেপে বসল। ওখান থেকে উত্তরে ঘন্টাখানেকের পথ পিটালুমা। চিকেন লারসেনের খামার খুঁজে বের করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না। বিরাট এক র্যাঞ্চ ছিল একসময়ে ওটা। ওই এলাকার সবাই চেনে।

দেখতে মোটেও মুরগীর খামারের মত লাগল না। বরং মোটরগাড়ির কারখানা বললেই বেশি মানায়। বড় বড় দুটো বাড়ি আছে, দুটোই দোতলা, আর অনেক বড়। ঘিরে রেখেছে তারের বেড়া।

বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। শনিবার বলেই বোধহয় কাউকে দেখা গেল না। গেটে পাহারা নেই। নিজেরাই গেটের পাণ্ডা বুলে ভেতরে চুকল। প্রথম বাড়িটার দিকে এগোল পঞ্চাশ গজ মত। চট করে তাকিয়ে দেখে নিল এদিক ওদিক, কেউ দেখেছে কিনা। তারপর চুকে পড়ল ভেতরে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না ওরা। কিংবা বলা যায় নিজের কানকে। ভেতরে অনেক মুরগী থাকবে জানত। কিন্তু এত বেশি থাকবে, আর ওগুলোর মিলিত কঁক কঁক এত জোরাল হবে, কল্পনাই করতে পারেনি। কানে তালা

লেগে যাবার জোগাড়। গ্রীন হাউসের মত কাচের ছাত দিয়ে আলো আসছে। পুরো এয়ারকন্ডিশন করা। ফলে তাপমাত্রার কোন হেরফের হচ্ছে না।

দরজার কাছে দেয়ালে অনেকগুলো ছক লাগানো। তাতে ঝুলছে লারসেন কোম্পানির পোশাক। যারা মূরগীর সেবা-যত্ন করে তাদের ইউনিফর্ম। দুটো নামিয়ে নিয়ে পরে ফেলল দু'জনে। কোম্পানির কর্মচারীর ছদ্মবেশে শুরু হয়ে গেল খোঁজাখুঁজি।

প্রথমেই যেটা বুঝতে পারল, তা হলো, এই বিল্ডিং মানুষের চলাফেরার বড়ই অসুবিধে। মূরগীর পাল তো আছেই, তার চেয়ে বেশি অসুবিধে করছে মেঝেতে বসানো লাল প্লাষ্টিকের পাইপ। কয়েক ইঞ্চি পর পরই। যেন লাল খুঁটির মত বেরিয়ে আছে, কিংবা গজিয়ে আছে। হাঁটার সময় ওগুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যেতে হয়। খাবার সরবরাহ করা হয় ওসব পাইপ দিয়ে। প্রতিটি পাইপের মুখের কাছে কায়দা করে লাগানো রয়েছে লাল প্লাষ্টিকের পাত্র, আঠারো ইঞ্চি পর পর। পানির ব্যবস্থাও করা হয়েছে পাইপের সাহায্যে। পানি খেতে অসুবিধে হয় না মূরগীগুলোর। পুরো ব্যবস্থাটাই এমন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা মূরগীগুলো নিজেই সারতে পারে, বাইরের কারও সাহায্য প্রয়োজন হয় না। সে জন্যেই কোন লোককে দেখা গেল না আশপাশে।

অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঘরটাকে। একেক ভাগে রয়েছে একেক বয়েসের আর আকারের মুরগী। এক জাতের সঙ্গে আরেক জাত মিশতে পারছে না কোনমতেই। এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে ঘুরে বেড়াতে লাগল দু'জনে।

‘কিছু কিছু মুরগী খুব অস্তুত, তাই না?’ মুসা বলল। ‘ওই যে ওটাকে দেখো। ডানা কি রকম ছোট। এত ছোট ডানার মুরগী আর দেখিনি।’

‘একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় এটা করা হয়,’ কিশোর বলল। ‘একে বলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এক জাতের সঙ্গে আরেক জাতের প্রজনন ঘটিয়ে, খাবারের পরিবর্তন করে ওরকম করা হয়। এতে ডানা ছোট হয়ে যায়, বুকের মাংস যায় বেড়ে। অনেক বেশি মাংস পাওয়া যায় ওগুলো থেকে।’

‘এমন ভাবি করা করেছে, নড়তেই তো পারছে না...’

এই সময় তিনজন লোক ঢুকল ঘরে। চার পাশে তাকাতে শুরু করল। খানিক আগে যে ছোট জাতের মুরগীগুলোর কাছে ছিল কিশোর আর মুসা, সেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা।

‘কুইক,’ কিশোর বলল। ‘কাজ করার ভান কর!’

‘কিছুই তো করার নেই। মেশিনেই করছে।’

‘তাহলে লুকিয়ে পড়!'

বেড়া দিয়ে আলাদা করা এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগকে। একটা বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল দু'জনে। বেড়াটা নিচু। ইচ্ছে করলে মাথা তুলে দেখতে পারে লোকগুলো কি করছে। বিরক্ত করতে লাগল মুরগীগুলো। কেবলই পায়ের ওপর এসে পড়ছে। অথবাই ঠোকর মারছে, খাবার আছে মনে করে।

‘বেরোতে হবে এখান থেকে,’ আচমকা বলে উঠল কিশোর। ‘যতবার সাদা

মুরগীগুলো দেখছি, কাল রাতের ওটার কথা মনে হয়ে যাচ্ছে আমার।'

এগিয়ে আসছে লোকগুলো। একজনের গায়ে লাল শার্ট, খাকি প্যান্ট। মাথায় সাদা ক্যাপ, তাতে লারসেন মনোগ্রাম আর সুতো দিয়ে তোলা লাল অক্ষরে নাম লেখা রয়েছে 'ডরি'। অন্য দু'জনকে এই পরিবেশে একেবারেই মানাচ্ছে না। গাঢ় নীল সৃষ্টি পরনে, একজনের চোখে বৈমানিকের সানগুস। এই লোকটার বয়েস কম। খাটো করে ছাঁটা কালো চুল। সানগুসটা খুললে দেখা গেল নীল চোখ যেন জুলচ্ছে।

ডরি বলল, 'মিস্টার অগাস্টাস, আর কিছু দেখার প্রয়োজন আছে আপনার?'

হেনরি অগাস্টাস? কান খাড়া করল কিশোর। একটা কথাও এড়তে চায় না।

ডরির দিকে তাকাল হেনরি। তারপর অন্য লোকটার দিকে। 'না, অনেক দেখেছি,' কষ্টস্বরেই বোঝা যায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি। 'নোট লেখ। অনেক কিছু বদলাতে হবে এখানকার। দেখতেই পাচ্ছি।'

'লিখছি,' বলে তাড়াতড়ো করে পকেট থেকে নোটবুক আর কলম বের করল নীল সৃষ্টি পরা অন্য লোকটা।

আবার সানগুসটা নাকের ওপর বসাল হেনরি। ডরিকে জিজ্ঞেস করল, 'প্রোডাকশন কেমন তোমাদের?'

'হঞ্চায় পদ্ধতি হাজার করে জবাই করার উপযোগী পাওয়া যায়।'

'নাহ, যথেষ্ট নয়,' হেনরি বলল। 'দ্বিগুণ করা দরকার।'

কথাটা লিখে নিল তার সহকারী।

'মিস্টার লারসেন বলেন ভিড় বাড়িয়ে ফেললে মুরগীক অসুবিধে হবে,' ডরি বলল।

'এটা মুরগীদের রেস্ট হাউস নয়,' হাসল হেনরি। কুৎসিত লাগল হাসিটা। 'এটা কারখনা। যত বেশি প্রোডাকশন দেয়া যাবে, তত বেশি টাকা আসবে।'

আরেকবার ঘরটায় চোখ বোলাল হেনরি। মাথা নাড়ল। তারপর নিচু হয়ে খাবারের পাত্র থেকে একমুঠো দানা তুলে নিয়ে দেখল। ডরির দিকে তাকাল আবার। 'খাবারও বদলাতে হবে। আমি নিজে দেখব সেদিকটা। কি দেব ভেবেই রেখেছি।'

লেখা শেষ করে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল তার সহকারী। দরজা খুলে ধরল। লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে গিয়ে বাইরে দাঁড়ানো একটা মার্সিডিজ গাড়িতে উঠল হেনরি। গাড়িটা ঘুরে চলে যাওয়ার সময় ওটার লাইসেন্স প্লেটের দিকে তাকাল কিশোর।

লেখা রয়েছেঃ প্লাকার-১।

## এগারো

'লোকটার মধ্যে মানবিকতার ছিটেফেঁটাও নেই,' কিশোর বলল। দক্ষিণে স্যান

ফ্র্যান্সিসকোর দিকে চলেছে ওরা। 'প্রচণ্ড স্বার্থপর।'

'যা বলেছ। তবে সঙ্গে জানোয়ার শব্দটা যোগ করতে পারতে।'

আর তেমন কোন কথা হলো না। নীরবে গাড়ি চালাল মুসা। সাতটা বাজে। শহর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে রয়েছে। আচমকা চিক্কার করে উঠল কিশোর, 'রাখ! রাখ!'

'কি হয়েছে?' পথের পাশে গাড়ি নামিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল মুসা। তারপর চেখে পড়ল নির্দেশকটা। একটা বাড়ির লাল রঙ করা ছাতে বসানো একটা মুরগী। ভেতরে জুলছে নিয়ন আলো। চিকেন লারসেন রেস্টুরেন্টের চিহ্ন।

সেদিকে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে গেল মুসা। সে পার্ক করে বেরোতে বেরোতে রওনা হয়ে গেছে কিশোর। একটা সেকেও দেরি করেনি।

দরজায় দাঁড়িয়ে লম্বা দম নিল। খাবারের সুগন্ধে ভুরভুর করছে বাতাস।

'আরে সর না,' মুসা বলল। 'জায়গা দাও। লোকে ঢুকবে তো।'

কাউন্টারের কাছে এগিয়ে গেল দু'জনে। সতরো-আঠারো বছরের একটা মেয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। গায়ে লাল শার্ট। পরনে খাকি প্যান্ট। মাথায় সাদা ক্যাপ। সামনের দিকের বাড়তি অংশটা মুরগীর ঠোটের মত। ক্যাপে লাল সুতোয় তোলা লেখা পড়ে বোৰা গেল ওর নাম নেলি।

মোলায়েম ভদ্র গলায় ওদেরকে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, 'কি দেব?'

'বিষাঙ্গ খাবার,' বিড়বিড় করল মুসা অন্যমনঃ ভঙ্গিতে।

'কী?'

'অ্যা�! ও, মুরগী। আর কি। এখানে তো ওটাই স্পেশাল।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মুসা, 'খাবে তো? তোমার পেট...'

'চুলোয় যাক পেট। অনেক সয়েছি। আর না। এত সুগন্ধ, না খেয়ে আর পারব না।'

জানালার কাছে একটা টেবিল বেছে নিল দু'জনে। খাবার এল। কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গে যার বাঁপিয়ে পড়ার কথা সে-ই ছুঁল না। হাত গুটিয়ে বসে রইল মুসা।

'কি ব্যাপার?' ভুঁক নাচাল কিশোর।

'বলা যায় না। এখানকার খাবারেই হয়তো বিষ মিশিয়েছে। যদি থাকে?'

'তা থাকতেই পারে। তবে জীবনটাই ঝুঁকিপূর্ণ। রিক্ত তো নিতেই হবে,' বলে আর কথা না বাড়িয়ে মুরগীর মাংসে কামড় বসাল কিশোর।

শ্রাগ করল মুসা। তারপর সে-ও আর দ্বিধা করল না।

'এই কেসের সমস্ত রহস্যের সূত্র লুকানো রয়েছে জুনের ব্রিফকেসে,' চিবাতে চিবাতে বলল কিশোর। 'আমার বিশ্বাস। কি ছিল জানতে পারছি না। ওর অ্যামনেশিয়া না কাটলে বলতে পারবে না। যে লোকটা বিষ মেলাতে চায় সে জানে আমরা এ কেসের তদন্ত করছি। আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে সরাতে না পারলে তার পরিকল্পনা বদল করবে। সময়টা এগিয়ে নিয়ে আসবে।'

'তো?'

'তো, আমাদেরকেও তাড়াতাড়ি রহস্যটা ভেদ করতে হবে। তিনজনকে খাবারে বিষ

সন্দেহ করি আমরা আপাতত। ওদের নিয়েই আলোচনা করা যাক।'

'করো।' মুসা জানে, আলোচনা এবং বিশ্লেষণ দুটোই কিশোর করবে, সে শ্রোতা মাত্র।

'প্রথমেই ধরা যাক, কেন অপরাধ করে লোকে। কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। ধরলাম, এ ক্ষেত্রে চিকেন লারসেন কাজটা করতে চাইছেন। তাঁর পক্ষে বিষ মেশানো খুব সহজ। মুরগীর খাবারে কিছু মিশিয়ে দিতে পারেন। কিংবা মুরগী দিয়ে খাবার তৈরি করার সময় মাংসে মেশাতে পারেন।'

মাংস মুখে পূরতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল মুসা। তাকিয়ে রইল স্টোর দিকে। তারপর রেখে দিল প্লেটে।

'কিন্তু চিকেন লারসেনের উদ্দেশ্য কি?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। 'মোটিভ?'

'কি আর? পাগল!'

'এতটাই পাগল, যে লাখ লাখ মানুষকে মারবেন? নিজের মেয়েকে অ্যাঞ্জিলেট করিয়ে মেরে ফেলতে চাইবেন?'

'আমি কি করে জানব? কিন্তু গলা কেটে আর কে মুরগী পাঠাতে যাবে আমাদের কাছে?'

'যে কেউ পারে। বাজার থেকে কিনে নিলেই হলো। হেনরি অগাস্টাসের কথা ধরতে পারি আমরা। তার মোটিভ খুব জোরাল। লারসেনের বদনাম করে দিয়ে তাঁকে ধ্বংস করে দিতে চায়। নিজের ব্যবসা বাড়ানোর জন্যে। পিটালুমায় মুরগীর ঘরে চুকে আজ একটা কথা বলেছিল, খেয়াল করেছ? মুরগীর খাবারের ব্যাপারটা সে নিজে দেখবে। হতে পারে, খাবারে বিষ মেশানোর কথাই বলেছে। এমন কিছু, যেটা মুরগীর তেমন ক্ষতি না করলেও মানুষের করবে। খামারটা না কিনেও যে কেউ করতে পারে কাজটা। যে কেউ চুক্তে পারে। ইচ্ছে করলে আমরাও মিশিয়ে দিতে পারতাম। কেউ বাধা দেয়ার ছিল না।'

'বেশ, দু'জন গেল। আরেকজন কে?'

'মিস্টার এক্স। যাকে আমরা চিনিই না এখনও।'

সন্দেহভাজনদের নিয়ে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করল ওরা। খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এল। গাড়ির দিকে এগোল।

স্যান ফ্রান্সিসকোতে পৌছতে পৌছতে অঙ্ককার হয়ে গেল। জায়গাটা কুয়াশার জন্যে বিখ্যাত। ইতিমধ্যেই নামতে আরও করেছে। ঘিরে ফেলেছে গোল্ডেন গেট ব্রিজকে। চোখে পড়ে কেবল ব্রিজের দুটো টাওয়ারের ওপরের অংশ আর একেবারে নিচে চলমান যানবাহন। মাঝখানটা ফাঁকা, কুয়াশার জন্যে চোখে পড়ে না, যেন কিছুই নেই ওখানটায়।

স্যান ফ্রান্সিসকোর সাতটা পাহাড়েরও একই অবস্থা। চূড়া আর গোড়ার উপত্যকা চোখে পড়ে, মাঝখানটা অদৃশ্য। আরও অনেকবার দেখেছে মুসা। তার কাছে ব্যাপারটা একটা বিরাট রহস্য। এরকম কেন হয়? মধ্যগ্রীষ্মের প্রতি রাতেই ঘটে এই একই কাণ্ড।

রেডিও অন করে দিল সে। রক মিউজিক বাজছে একটা স্টেশনে।

বিমান বন্দর থেকে মাইল পনেরো দূরে থাকতে অনুমতি পড়ল। বার বার রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকাচ্ছে। বলল, ‘পেছনে দেখো। একটা লাল রঙের ক্যাডেলিয়ার।’

‘তাতে কি?’ কিশোরের প্রশ্ন।

‘মনে হয় আমাদের অনুসরণ করছে।’

কে করবে? ভাবতে লাগল কিশোর। ওরা যে স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় এসেছে একথা কেউ জানে না। কিন্তু মুসার সন্দেহ গেল না কিছুতেই। অবশ্যে কিশোর বলল, ‘রাখ তো। দেখি।’

গতি কমাল মুসা। দ্রুত এগিয়ে এল লাল গাড়িটা। আরেকটু হলেই বাস্পারে বাস্পারে লেগে যাবে। ভেতরে কে আছে দেখার চেষ্টা করল কিশোর। পারল না। হেডলাইটের আলো এসে পড়ে চোখে। তানে কাটছে গাড়িটা। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। জানালা নামিয়ে দিল কিশোর। ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে লোকটা। একেবারে মুখোমুখি।

অঙ্গুষ্ঠ একটা শব্দ করে প্রায় ছিটকে জানালার কাছ থেকে সরে এল কিশোর। মিষ্টার এক্স! সেই আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট। মুখে গর্ত গর্ত দাগ। গুটি বসন্ত হলে কিংবা ব্রণের ক্ষত হলে যেমন হয় অনেকটা সে রকম। শীতল একটা হাসি যেন জমাট বেঁধে রয়েছে ঠোটে। সাপের চোখের মত ঠাণ্ডা চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, খুনীর চোখের দিকে চেয়ে আছে।

‘চলো! পালাও!’ চিৎকার করে মুসাকে বলল কিশোর।

কেন চিৎকার করল কিশোর, দেখার জন্যে রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে দেখতে চাইল মুসা। হেসে উঠল মিষ্টার এক্স। স্টিয়ারিং ঘূরিয়ে গুঁতো মারতে এল ওদের গাড়িকে।

কিন্তু ততক্ষণে গ্যাস প্যাডালে চাপ বাড়িয়ে দিয়েছে মুসা। খেপা ঘোড়ার মত, লাফিয়ে আগে বাড়ল ওদের গাড়ি।

‘অনুসরণ নয়,’ রিয়ারভিউ মিররে চট করে একবার দেখে নিয়ে বলল সে, ‘আমাদেরকে রাস্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে এসেছে ব্যাটা!'

ঠিক পেছনে লেগে রাইল মিষ্টার এক্স। সামনে গাড়িটাড়ি কিছু পড়লে, কিংবা অন্য কোন কারণে মুসা গতি কমাতে বাধ্য হলে শাঁ করে পাশের লেনে সরে যায় লাল গাড়িটা, ধেয়ে এসে শ্রাম করে বাড়ি লাগিয়ে দেয়। তবে এখনও বড়িতে লাগাতে পারেনি, কেবল বাস্পারে লাগিয়েছে।

‘বেরোও,’ কিশোর বলল। ‘ওকে আটকে রেখে বেরিয়ে যাও কোনখান দিয়ে! খসাতেই হবে!'

দ্রুত মহাসড়ক থেকে নেমে পড়ল মুসা। লাল গাড়িটাও নামল। মুসা যত জোরেই চালাক না কেন, ঠিক পেছনে লেগে থাকে। আর সুযোগ পেলেই এসে গুঁতো মারে। কিছুই করার নেই আর, চালানো ছাড়া। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ?

এই অন্ধকারে কি করবে?

মুসার একবার মনে হলো, কখনে দাঢ়ায়। সে-ও ধাক্কা মারে। কিন্তু ওই গাড়িটা অনেক বেশি শক্ত, ওটার সঙ্গে পারবে না। পালিয়ে বাঁচা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

পাহাড়ের কোলে একটা আবাসিক এলাকায় চলে এল ওরা। নামেই আবাসিক, বাড়িগুলো এত দূরে দূরে, জনবসতিশূন্যই মনে হয়। হঠাৎ তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে পাহাড়ের ওপর দিকে উঠতে শুরু করল মুসা। ধ্রাম করে গুঁতো লাগল পেছনে। একটা নির্দেশকে দেখা গেল স্যান ফ্রান্সিসকোর বিখ্যাত ট্যুরিন্ট স্পট টুইন পিকসের দিকে চলেছে ওরা। পর্বতের চূড়ান্দটোর ওপরে দাঁড়িয়ে নিচের চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়ে। সুন্দর উপত্যকা, জলরাশি, শহরের আলো, সব দেখা যায়।

মোড় নিয়ে উঠে গেছে পথটা। আরেকটু উঠতেই খেয়াল হলো মুসার, সামনের কুয়াশার ভেতরে চুক্তে হবে। ধ্রাম করে বাড়ি লাগল আবার।

‘বাপরে বাপ, এমন কুয়াশা জিন্দেগিতে দেখিনি,’ গাড়ির গতি কমিয়ে ফেলল সে। দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। এতই ঘন কুয়াশা হেডলাইটের তীব্র আলোও সামনে ফুটখানেকের বেশি ভেদ করতে পারে না। একবার ভাবল, গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যায় আবার যে পথে এসেছে। কিন্তু ঘোরানোর জায়গা নেই। আর মিষ্টার এক্সও ওদেরকে সে সুযোগ দেবে না।

### ধ্রাম!

পেছনে তাকাল কিশোর। কুয়াশার জন্যে দেখাই যাচ্ছে না ক্যাডেলিয়ারটাকে। এমনকি হেডলাইটও দেখতে পাচ্ছে না। গুঁতো মারছে বলেই বুঝতে পারছে, ওদের পেছনে রয়েছে মিষ্টার এক্স।

তারপর একসময় থেমে গেল গুঁতো মারা। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল, একটিবারও আর গুঁতো লাগল না।

‘কি ব্যাপার?’ ফিসফিস করে বলল মুসা।

‘বুঝতে পারছি না। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না পেছনে। চালাতে থাকো।’

আরও শক্ত করে স্টিয়ারিং চেপে ধরল মুসা। একটা মোড় এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারছে না সে। কিছুই দেখার জো নেই। পথের কিনারে হঠাৎ করে কোনখান থেকে খাড়া নেমে গেছে ঢাল, তা-ও জানে না।

‘মোড়ের কাছাকাছি চলে এসেছে সে...মোড় পেরোছে... এই সময় কুয়াশার ভেতর থেকে উদয় হলো আবার লাল কনভার্টিবলটা, বাঁ দিক থেকে। ঠেলে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল ওদের গাড়িটাকে।

চিৎকার করে উঠল কিশোর।

বাঁয়ে কাটল মুসা। টায়ারের কর্কশ আর্টনাদ তুলে সরে এল গাড়ি। মোড়টা পেরিয়ে এসেছে। এমনিতেও মরবে ওমনিতেও, কাজেই ঝুঁকিটা নিতে আর বাধল না ওর। তীব্র গতিতে কুয়াশার ভেতরে অক্ষের মত চালিয়ে দিল গাড়ি।

পাহাড়ের ওপরে উঠতেই নেমে গেল কুয়াশা। আসলে বেরিয়ে এসেছে কুয়াশার ভেতর থেকে।

ধড়াস ধড়াস করছে বুক। সামনে একটা পার্কিং লট। ওখানে গাড়ি রেখে নিচের দৃশ্য দেখে দর্শকরা। সোজা সেখানে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল সে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘাম মুছল কপালের।

‘এইবার আসুক দেখি ব্যাটা!’ সমস্ত ক্ষোভ ঝরে পড়ল কষ্ট থেকে। ‘বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব!'

‘হ্যা,’ কিশোরের কষ্টও কাঁপছে, ‘যদি পিস্তল না থাকে!'

## বারো

চুপ করে বসে আছে দুই গোয়েন্দা। গাড়ির ইঞ্জিন চলছে। বেশ কিছু দর্শক রয়েছে ওখানে। কিছু করার সাহস পাবে না মিস্টার এক্স। ভয় চলে যেতেই রাগে ফুটতে আরম্ভ করেছে মুসা।

‘সাহস আছে হারামজাদার,’ দাঁতে দাঁত চাপল সে। ‘কুয়াশার মধ্যে ঠিকই উত্তোঙ্গি করল। গাড়ি নিয়ে শয়তানী করেছে বলে পার পেয়ে গেছে। এখন আসুক...আসে না কেন? এত দেরি? করছেটা কি?’

‘জানি না,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। ‘অনেক কারণ থাকতে পারে...’

আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। ক্যাভেলিয়ারের দেখা নেই।

হঠাৎ ড্যাশবোর্ডে চাপড় মারল কিশোর। ‘এখনি এয়ারপোর্টে যেতে হবে আমাদের, প্রেন ধরতে হলে!'

‘কিন্তু মিস্টার এক্স?’

‘ও আসবে না। বুঝতে পেরেছে, এখানে আমাদের কিছু করতে পারবে না। কাজেই ফিরে চলে গেছে।’

হতাশ হলো মুসা। সমস্ত রাগ যেন গিয়ে পড়ল ষিয়ারিঙ্গের ওপর। ওটাকেই কিল মারল। তারপর গাড়ি ঘূরিয়ে নিয়ে বের করে আনল পার্কিং লট থেকে।

‘সাবধানে থাকবে,’ কিশোর বলল। ‘বলা যায় না, ঘাপটি মেরে থাকতে পারে কোথাও। মহা পাজি লোক।’

তবে পথে আর বিপদ হলো না। নিরাপদেই বিমান বন্দরে পৌছল ওরা। যেখান থেকে গাড়িটা ভাড়া করেছে সেখানে ফিরিয়ে দিতে গেল। গাড়িতেই চাবি রেখে অফিসের দিকে পা বাড়াল দু'জনে। ভাড়া মিটিয়ে দেবে। কিন্তু ঢোকার আগেও মুহূর্তে কিশোরের হাত ধরে টান মেরে ঘূরিয়ে ফেলল মুসা। ‘ওই যে! লাল ক্যাভেলিয়ার!

কিশোরও দেখল। ‘কিন্তু ওটাই কি আমাদের পিছে লেগেছিল? চলো, দেখি।’

গাড়িটার কাছে এল ওরা। শূন্য। ভেতরে কেউ নেই। চারপাশে ঘূরে দেখল। লাইসেন্স প্লেট দেখে কিশোর বলল, ‘এটাই! জলদি অফিসে যাও! এখনও থাকতে পারে ব্যাটা! না পেলে ক্লার্ককে জিজেস করবে, লাল কনভারটিবলটা যে ভাড়া করেছিল তার নাম কি। যাও, আমি আসছি।’

চলে গেল মুসা। লাল গাড়িটার দরজা ঘূলে ভেতরে উকি দিল কিশোর। ভেতরে এমন কিছু কি আছে যেটা সূত্র হতে পারে? খুঁজতে লাগল সে। কার্পেটের পেছনে দেখল, উল্টে নিচে দেখল, সামনের সীটের নিচে ওপরে সবথানে দেখল। অ্যাশট্রে, গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট কিছু বাদ দিল না। এমনকি আঙুল আর হাত ঢাকে ওরকম কোন ফাঁকফোকরই বাদ রাখল না।

তবে কষ্ট বিফলে গেল না। মিষ্টার এক্স কে, তা জানা যাচ্ছে না, তবে কোথায় পাওয়া যাবে একথা জানা গেল। অফিসের দিকে দৌড় দিল কিশোর। বেরিয়ে আসছে তখন মুসা।

‘ক্লার্ক কি বলল?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘হ্যাঁ আ নাইস ডে,’ জবাব দিল মুসা। বাংলা করে বলল—ভাল বাংলা বলতে পারে আজকাল, ‘দিনটা ভাল কাটুক।’

‘লাল গাড়িটার কথা কি বলল?’ অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিশোর।

‘হ্যাঁ আ নাইস ডে। মানুষ নয়। একটা কম্পিউটার।’

‘দেখো, আমি কি পেয়েছি।’ এক টুকরো দোমড়ানো কাগজ বের করে দেখাল কিশোর। একপাশ চকচকে প্লাষ্টিকের মত, আরেক পাশ সাদা, সাধারণ কাগজ।

‘ক্যানডির মোড়ক।’ হাতে ডলে কাগজটা সমান করল মুসা। লেখাগুলো যাতে পড়া যায়। ঝুপালি রঙে লেখা রয়েছে, পড়ল, ‘মিরাকল টেস্ট! আরে ওই রকম ক্যানডির মোড়ক, চিকেন লারসেনের পার্টিতে যে জিনিস বিতরণ করেছিল ফেলিক্স আরোলা!’

ঠিক। হ্রী স্যাম্পল। মার্কেটে ছাড়েনি এখনও। দুটো সঙ্গাবনা ধরা যায়। এক, পার্টিতে উপস্থিত ছিল মিষ্টার এক্স, আমাদের মতই হ্রী স্যাম্পল পেয়েছিল। নয় তো, একসঙ্গে কাজ করছে আরোলা আর মিষ্টার এক্স।’

‘করুকগে,’ মুসা বলল। ‘সেটা পরেও আলোচনা করা যাবে। প্রেন ধরতে হবে আমাদের, বাড়ি যেতে হবে, ভূলে গেছ?’

জাংক ইয়ার্ডে ফিরতে ফিরতে মধ্যরাত হয়ে গেল। বাইরে গিয়ে তদন্ত করার সময় নেই আর তখন। মুসা চলে গেল ওদের বাড়িতে। এত তাড়াতাড়ি ঘূম আসবে না কিশোরের। তাই লক কমবিনেশন ডিকোডার নিয়ে কাজে বসল সে। অনেকক্ষণ পর, ক্লান্ত হয়ে উঠে বাতি নিভিয়ে ওঅর্কশপ বন্ধ করতে যাবে, এই সময় বাজল টেলিফোন।

অঙ্ককারেই রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল সে, ‘হালো?’

‘কিশোর,’ মুসার কষ্ট। ‘ফারিহা কথা বলতে চায়।’

আবার আলো জ্বালল কিশোর।

‘হাই, কিশোর,’ এত রাতেও ফারিহার গলার জোর শব্দে অবাক হলো কিশোর, বিদ্যুমাত্র ক্লান্তির ছাপ নেই। ‘শোনো, কি হয়েছে। জুন লারসেন আজ লাঞ্ছ খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে...’

কল্পনায় পরিষ্কার দেখতে পেল কিশোর, ফারিহা এখন কি করছে। লম্বা চুলের একটা গোছা আঙুলে পেঁচাচ্ছে আর কথা বলছে। বকবক করে যাবে, করেই যাবে,

এক গল্প শেষ করতেই রাত কাবার। কম কথায় আর শেষ করতে পারে না। অতঙ্কণ কানে রিসিভার ঠেকিয়ে রাখার ধৈর্য নেই কিশোরের। তাই স্পীকারের লাইন অন করে দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। যাতে প্রয়োজনে শুনতে শুনতে পায়চারিও করতে পারে।

‘...অনেক কথাই বলেছে,’ জুন বলে যাচ্ছে। তবে এখনও মনে করতে পারছে না অ্যাক্সিডেন্টের দিন কোথায় গিয়েছিল আর ব্রিফকেসট। কোথায় রেখেছিল। একটা কথা অবশ্য আবছাভাবে মনে করতে পারছে, সেদিন একটা গাড়ি পিছু নিয়েছিল ওর। ...যাই হোক, লাঙ্গের পর আমাকে গাড়িতে করে বাঢ়ি পৌছে দিয়েছে সে। দারুণ একটা গাড়ি। নতুন একটা মাসট্যাং কনভারটিবল কিমে দিয়েছেন তাকে চিকেন লারসেন।’

‘আর জানো কি ইঞ্জিন?’ পেছন থেকে বলে উঠল মুসা, ‘ফাইভ-লিটার ভি এইট ইঞ্জিন...’

‘মুসা, পুরীজ,’ ওকে থামতে অনুরোধ করল ফারিহা। ‘কিশোর আমার গল্পটা শুনতে চাইছে। এক কথার মাঝে আরেক কথা চুকিয়ে দিও না। হ্যাঁ, কিশোর, কি যেন বলছিলাম? ও, মনে পড়েছে। গাড়িতে ওঠার আগে ট্রাক্ষ খুলে পাস্টা ভেতরে ছুঁড়ে দিল সে। অন্তু ইই লাগল আমার কাছে। জিজেস করলাম, ওরকম করল কেন? লোকে পার্স রাখে হাতে। গাড়ি চালানোর সময় পাশের সীটে রাখে, কিংবা কোলের ওপর রাখে। জবাব দিল ওটা ওর স্বভাব। ভাবলাম, এখন যদি ওর গাড়িটাকে পাহাড় থেকে উল্টে ফেলে দেয় কেউ, তাহলে সহজেই ট্রাক্ষ থেকে পাস্টা বের করে নিতে পারে। নেয়ার ইচ্ছে থাকলে। কি বললাম, বুবুতে পেরেছ?’

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কিশোরের চোখ। ট্রাক্ষ! ব্রিফকেসটা ট্রাক্ষে থাকতে পারে!

‘হ্যাঁ, বুবুতি,’ জবাব দিল সে। ‘বুবু আছে তোমার। শিখতে আরম্ভ করেছ।’  
হেসে উঠল ফারিহা।

‘দেখি, লাইনটা মুসাকে দাও।’ মুসা ধরলে কিশোর বলল, ‘শোনো, কাল সকালে উঠেই চলে আসবে। অটো স্যালভিজ ইয়ার্ডে যাব। জুনের গাড়ির ট্রাক্ষটা দেখার জন্যে।’

‘জানতাম, একথাই বলবে। ঠিক আছে, আসব।’

‘পরদিন সকাল নটায় রবিনের ফোক্সওয়াগনে করে হাজির হলো রবিন আর মুসা। কিন্তু কিশোর তখনও তৈরি হতে পারেনি। রিসিভার তুলে ডায়াল করল থানায়। চীফ ইয়ান ফ্রেচারকে চাইল। তিনি ধরলে জানাল, জুনের ব্রিফকেস খুঁজতে যাচ্ছে।

‘ব্রিফকেসের কথা তো নতুন শুনলাম,’ চীফ বললেন।

‘হ্যাঁ। অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় নিশ্চয় পাননি। খোঁজাখুঁজি তো করেচেন। গাড়ির ভেতর থেকে কিছু পড়ে গেল কিনা দেখেছেন।’

‘নিশ্চয়,’ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন চীফ।

‘গাড়ির ভেতরে খুঁজেছেন?’

‘কিশোর, আমার পুলিশে চাকরির বয়েসই তোমার বয়েসের চেয়ে বেশি।

আমি আমার কাজ জানি। যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তারাও জানে। রিপোর্ট করেছে, গাড়ির ভেতরটা খালি ছিল।'

'আসলে শিওর হতে চাইছি আমি, কোথাও কিছু বাদ পড়ে গেল কিনা।'

'বাদ পড়েনি। এই একটা কেসে তুমি সুবিধে করতে পারবে না,' হাসলেন চীফ।

'না পারলে,' রহস্যময় কষ্টে কিশোর জবাব দিল, 'কোন দিন আর চিকেন লারসেনের মুরগী আপনি খেতে চাইবেন না। পরে সব বলব,' লাইন কেটে দিল সে।

গাড়িতে এসে উঠল কিশোর। দুই সহকারীর সঙ্গে রওনা হলো মিলার অটো রেকেজ ইয়ার্ডে।

বিশাল এলাকা নিয়ে ইয়ার্ড। কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। একধারে স্তুপ করে রাখা হয়েছে নতুন নষ্ট হওয়া গাড়িগুলো। টুকরো টুকরো হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে যেন। সবখানে ছড়িয়ে রয়েছে গাড়ির নানা জিনিস। কোথাও টায়ারের স্তুপ, কোথাও ফেনডার, কোথাও বা বড়ির অন্যান্য অংশ। ইয়ার্ডের পেছনে বাঁ দিকে রয়েছে বিশাল এক কম্প্যাক্ট মেশিন আর দুশো ফুটের ক্রেন।

একেবারে গল্পের মত ঘটে গেল ঘটনা। টেলিভিশনের খিলারের গল্পে যে রকম হয়। তিন গোয়েন্দা ইয়ার্ডে চুকতেই কাকতালীয় ভাবে জুনের ছেট নীল মাসট্যাংটা তুলে নিল ক্রেন।

'ম্যাশারে নিয়ে গিয়ে ফেলবে!' চিংকার করে উঠল মুসা। 'চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা বানিয়ে ফেলবে!'

'ট্রাক্সের চিহ্নই আর থাকবে না!' দৌড় দিল রবিন। 'কিছু বের করতে পারব না!'

ক্রেনের দিকে দৌড়াচ্ছে তিনজনে। চিংকার করে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে ক্রেন অপারেটরের। কাছে গিয়ে দেখল ক্রেন চালাচ্ছে পল মিলার। ইয়ার্ডের মালিকের ছেলে। বছরখানেক আগে রকি বীচ হাউসে থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছে।

মোটর বন্ধ করে দিয়ে, অপারেটরের খাঁচার চারপাশে ছড়ানো হলুদ রং করা প্লাটফর্মে বেরিয়ে এল পল। নিচে তাকিয়ে চিংকার করে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'গাড়িটা জুন মিলারের?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ। কেন?'

'একটু দেখতে চাই।'

'লাভ হবে না। একটা স্পেয়ারও পাবে না। সব গেছে।'

'তবু। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'বেশ, ওদিকটায় যাও, নামিয়ে দিচ্ছি,' পড়ে থাকা অনেকগুলো বাতিল ট্রাকের পাশের খালি জায়গা দেখাল পল।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানিয়ে সেদিকে এগোল কিশোর। পিছে পিছে চলল রবিন আর মুসা।

আবার চালু হলো ক্রেনের ইঞ্জিন। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখল কিশোর, এপাশ ওপাশ দুলছে গাড়িটা। তারপর বিরাট একটা চক্র সৃষ্টি করে যেন এগোতে শুরু করল।

‘অত ওপর থেকে যদি কোনভাবে মাটিতে খসে পড়ে, মুসা বলল। ‘তর্তা হয়ে যাবে।’

প্রায় মাথার ওপর চলে এসেছে গাড়িটা। সরে গেল ওরা। কিন্তু গাড়িটা চলল ওদের সঙ্গে, ওপরে ওপরে, যেন অনুসরণ করতে চাইছে। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দুলছে।

‘মজা করছে নাকি?’ ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে প্রায় চিংকার করে বলল মুসা।

‘না, মজা নয়!’ আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। ‘ওই দেখো!

ক্রেনের গোড়ায় পড়ে থাকতে দেখা গেল পলকে। পেট চেপে ধরেছে, বাঁকা হয়ে গেছে ব্যথায়। ক্রেন অপারেটরের বুদে চুকে পড়েছে অন্য কেউ, সে-ই চালাচ্ছে। তিনি গোয়েন্দার মাথার ওপরে চলে এসেছে গাড়িটা।

‘কে চালাচ্ছে?’ কিশোরের প্রশ্ন।

কিন্তু জবাব পেল না। দেবেই বা কে? গোল, চ্যাপ্টা একটা বড় চুম্বকের সাহায্যে তোলা হয় গাড়ি। ইলেকট্রোম্যাগনেট। অফ করে দেয়া হলো সুইচ।

কিন্তু জবাব খোজার সময় নেই। গাড়িটা এখন একেবারে মাথার ওপর। আচমকা ছেড়ে দিল ওটাকে ক্রেন। পড়তে আরম্ভ করল তিনি হাজার পাউণ্ড ওজনের গাড়িটা।

## তেরো

তিনি দিকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তিনি গোয়েন্দা। বিকট শব্দে মাটিতে পড়ল গাড়ি।

ভাঙা কতগুলো গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। দেখছে, শূন্যে দুলছে ভারি ইলেকট্রোম্যাগনেট, যে চুম্বকটার সাহায্যে গাড়ি তোলা হয়। ওটার এক বাড়ি খেলেই মরে যাবে মানুষ। বোঝাই গেছে, অপারেটরের বুদে যে রয়েছে এখন সে ওরকম কিছু ঘটানোরই চেষ্টায় আছে।

বিশাল চুম্বকটার দুলুনি বঙ্গ হলে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মুসা। উকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল ক্রেনের বুদে কে আছে।

‘আগেই বোঝা উচিত ছিল,’ ফিসফিস করে বলল সে। ‘আমাদের মিষ্টার এক্স!

পুরানো গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। দেখল, ক্রেনের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে লোকটা। গায়ে আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট। লাফিয়ে নামল পলের কাছে। তার ঘাড়ে এক রদ্দা মেরে তাকে চিং করে দিল আবার, যাতে কিছুক্ষণ আর না উঠতে পারে।

‘এদিকেই আসছে,’ দুই সহকারীকে পিছিয়ে যেতে ইশারা করল মুসা। আবার গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল তিনজনে। এমনভাবে থাকার চেষ্টা করল, যাতে

খাবারে বিষ

লোকটা দেখতে না পায়।

‘জুনের গাড়িটা দেখতেই এসেছে হয়তো,’ কিশোর বলল। ‘আমাদের মত।’

কানে এল কাচ ভাঙার শব্দ। ধোয়ার গন্ধ নাকে এলে আর চূপ করে বসে থাকতে পারল না মুসা। মুখ বের করে তাকাল। দেখল, দ্বিতীয় মলোটভ ককটেলটা ছুঁড়ে মিষ্টার এক্স। বোতল ভাঙার শব্দই তখন কানে এসেছে।

‘সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে ফেলছে!’ হতাশ কষ্টে বলল মুসা।

‘তাহলে এই ব্যাপার,’ কিশোর বলল। ‘লোকটা চায় না, গাড়িতে যা আছে আমরা দেখি।’

‘পেটেল আছে কিনা কে জানে! তাহলে বোমার মত ফাটবে!’

আগুন ধরে যেতেই দৌড় দিল মিষ্টার এক্স। ইয়ার্ডের গেটের কাছে রাখা তার পোরশেতে গিয়ে উঠল। পিছু নিতে চাইল মুসা। হাত ধরে তাকে টেনে আটকাল কিশোর আর রবিন।

‘ওকে ধরার দরকার নেই,’ রবিন বলল। ‘গাড়ির ট্রাক্স দেখতে হবে! যে কাজে এসেছি!'

‘চুইক! তাড়া দিল কিশোর। ‘গাড়িটা পুড়ে যাওয়ার আগেই...’

‘পুড়বে তো না, ফাটবে!'

গাড়িটার দিকে আরেকবার তাকাল মুসা। তারপর দিল দৌড়। পুরানো জঞ্জালের মধ্যে খুঁজতে আরঝ করল। জিনিসটা খুঁজে বের করতে বেশিক্ষণ লাগল না। একটা শাবল। তারপর ছুটল জুনের তোবড়ানো মাসট্যাঙ্গের দিকে। ভেতরের গদিটানি অনেকখানিই পুড়ে গেছে ইতিমধ্যে। পেছনের দিকে এগোছে আগুন, যেখানে পেটেল ট্যাংকটা রয়েছে।

শাবল দিয়ে ট্রাক্স খোলার চেষ্টা শুরু করল মুসা। ঘামে ভিজে গেছে কপাল। একটা চোখ সারাক্ষণ রেখেছে আগুনের ওপর। অবশেষ খুলে গেল ট্রাক্স।

‘পেয়েছি! আনন্দে চিৎকার করে উঠল সে। ভেতরে হাত চুকিয়ে দিয়ে বের করে আনল চামড়ার ব্রিফকেসটা। হাতে তুলে নেড়ে দেখল কিশোর আর রবিনকে। ‘জলনি ভাগ! ফাটবে এখনি! ট্যাংকের কাছে পৌছে গেছে আগুন।

কিন্তু নড়ল না কিশোর। হাসছে। বলল, ‘গাড়ি ভাঙার আগে পেটেল বের করে নেয়া হয়, যাতে কোনরকম দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে। জুলবে গাড়িটা, কিন্তু ফাটবে না।’

‘আগে অকথা বলোনি কেন?’ অভিযোগের সুরে বলল মুসা। ‘তাহলে অত তাড়াহড়া করতাম না...’

‘সে জন্যেই বলিনি। ওই তাড়াহড়াটা না করলে হয়তো সময়মত খুলতে পারতে নাট্রাক্সটা। ঠেকায় পড়লেই কেবল মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে।’

‘তুম যে একটা কি...! জুলন্ত চোখে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকাল মুসা।

কোন করে অ্যামবুলেন্স ডাকা হলো। তারপর পলকে দেখতে চলল তিন গোয়েন্দা, ওর অবস্থা কতটা খারাপ।

‘তোমরা গোয়েন্দা, শুনেছি,’ পল বলল। ‘কিন্তু জানতাম না সন্ত্রাসীদের

বিরচন্দেও লাগতে যাও।'

'সব সময় লাগি না,' কৈফিয়তের সুরে বলল কিশোর।

পলের ব্যবস্থা করে চিকেন লারসেনের বাড়ি রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। পথানে ওদের অপেক্ষায় আছে জুন আর ফারিহা। লারসেন বাড়ি নেই। ফিরতে দেরি হতে পারে।

সদর দরজায় বেল শনে খুলেই তিন গোয়েন্দাকে দেখে একসঙ্গে বলে উঠল দু'জনে, 'পেয়েছ?'

নীরবে ব্রিফকেসটা তুলে ধরল কিশোর। কি করে এসেছে, তার প্রমাণ দিতে চাইল যেন।

হাসল জুন। ওদেরকে নিয়ে এল বসার ঘরে।

কাচের কফি টেবিলে ব্রিফকেসটা রাখল কিশোর।

অস্থির হাতে সামনের খোপের চেনটা তুলে ভেতর থেকে মরক্কো লেদারে বাঁধাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকটা বের করল জুন। কাঁপা হাতে খুলল শুক্রবারের সেই পাতাটা, যেদিন অ্যাপ্রিলেন্ট করেছিল। যেদিনকার ঘটনা শৃতি থেকে মুছে গেছে।

'এই যে,' নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে ওর।

পুরো একটা মিনিট পাতাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, 'কিছুই নেই। কেবল আর. অ্যাওডি।'

'রিসার্চ অ্যাওডেভেলপমেন্ট,' কিশোর বলল। 'ডন বারোজের ডিপার্টমেন্ট, তাই না? ওর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলে কেন? কি আলোচনা করেছিলে?'

'কাজ শেখার চেষ্টা করছি আমি। সব বিভাগেই কাটিয়েছি একদিন করে। এর বেশি আর কিছু মনে করতে পারছি না।'

'ব্রিফকেসের ভেতরে কি আছে দেখলে হয়তো মনে করতে পারবে,' আশা করল কিশোর।

ভেতর থেকে একটা তিন রিঙের বাইণার বের করল। প্রায় দু'শো ফটোকপি করা কাগজ রয়েছে তাতে। কয়েক মিনিট কাগজগুলো ওল্টাল, তারপর রেখে দিল টেবিলে। 'চিনতেই পারছি না!' ওগুলো দেখে শৃতি ফেরত আনার চেষ্টা করছিল সে, ব্যর্থ হয়েছে। ভীষণ হতাশ হয়েছে।

'আমি দেখি? অসুবিধে আছে?' নোটবুকটার দিকে হাত বাঢ়াল কিশোর। পয়লা পাতাতেই ডন বারোজের মাম। দ্রুত রিপোর্টা পড়তে শুরু করল সে। কয়েক মিনিট নীরবে পড়ার পর মুখ তুলল। বলল, 'সেই শুক্রবারে কি ঘটেছিল বোধহয় বুঝতে পারছি। ডন বারোজের লেখা একটা রিপোর্টের কপি এটা। মালচিসরিবটেন নামে খাবারে মেশানোর একটা উপাদান স্পর্শে। কয়েক বছর আগে জিনিসটা আবিষ্কার করেছিল ডন। বলছে, মালচিসরিবটেন মেশালে খাবারের স্বাদ অনেক বেড়ে যায়, তবে একটা অসুবিধেও করে। এতই সুস্বাদু হয় খাবার, নেশাঞ্চিত করে ফেলে মানুষকে।'

'ভাল খাবার তো লোভী করবেই মানুষকে,' রবিন বলল। 'তাতে অসুবিধেটা কোথায়?'

‘অসুবিধেটা? মালচিসরবিটেনের বেলায় আছে। এফ ডি এ, অর্থাৎ ফেডারেল ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই উপাদানটা পরীক্ষা করেছিল। নতুন যে কোন খাবার আর ড্রাগ পরীক্ষা করে দেখা ওদের দায়িত্ব। উনকে মালচিসরবিটেন বাজারে ছাড়ার অনুমতি দেয়নি ওরা। কারণ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, ক্যারসিনোজেন হতে পারে ওই জিনিস।’

‘কি জেন?’ মুখ বাঁকাল মুসা।

‘ক্যারসিনোজেন।’ বুঝিয়ে দিল রবিন, ‘ক্যানসার হয় ওতে।’

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। বলতে থাকল, ‘দুর্ঘটনার দিন শুক্রবারে তুমি ডনের সঙ্গে দেখা করেছ। ওই রিপোর্টের কপি পেয়ে গেছ,’ কাগজটায় টোকা দিল সে। ‘সে দেয়নি। আমার বিশ্বাস, ওর অফিসে চুক্তে কোনভাবে দেখে ফেলেছিলে কাগজটা। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাতের বেলা। কাজেই অনুমান করছি, বিকেলের দিকে পেয়েছ তুমি। পড়ে অস্ত্রির হয়ে গিয়েছিলে।’

জুনের দিকে তাকাল কিশোর। সবকথা মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে যেন। বলল, ‘এতই ঘাবড়ে গিয়েছিলে, কাগজটা নিয়েই ছুটে বেরোলে ডনের অফিস থেকে। দেখে ফেলেছিল সে। তাড়া করেছিল তোমাকে। তোমার গাড়িতে গিয়ে উঠলে। নিজের গাড়িতে করে তোমাকে অনুসরণ করল সে। দুর্ঘটনার জায়গায় আরেক সেট চাকার দাগ যে পাওয়া গেছে সেটা ওরই গাড়ির।’

মুসা প্রশ্ন করল, ‘ওই একটা রিপোর্ট অতটা উত্তেজিত করবে কেন জুনকে?’

‘করবেই তো,’ হাসল কিশোর। ‘জুন হয়তো বুঝে ফেলেছিল, চিকেন লারসেনের নতুন খাবার ড্রিপিং চিকেনে ওই মালচিসরবিটেন মিশিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডন।’

কথাটা সবাইকে হজম করার সুযোগ দিল গোয়েন্দাপ্রধান। তারপর জুনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুম বুঝে ফেলেছিলে, ডন, কিংবা আরোলা, কিংবা তোমার বাবা ইচ্ছে করেই জেনেভনে ওই বিষ মেশাতে চলেছেন খাবারে। ড্রিপিং চিকেনে। ওই বিষের ক্রিয়া টের পেতে পেতে রোগীর কয়েক বছর লেগে যাবে। কাজেই সহজে ধরা পড়বে না যে মেশাবে। ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক নিয়মিত খেয়ে যাবে মালচিসরবিটেন, বুঝতেই পারবে না ক্যানসারে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে ওরা। যখন বুঝবে, তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। হয়তো তখনও বুঝবে না কিসের কারণে হয়েছে তাদের ওই মরণ ব্যাধি।’

ঢেঁট কাঁপছে জুনের। প্রায় চিৎকার করে বলল, ‘অসম্ভব! আমার বাবা ওরকম পাষণ্ড হতেই পারে না!’

‘আমরা এখনও জানি না সেটা। প্রমাণ করতে হবে যে তিনি এতে জড়িত নেই। আর সেটা করায় আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে তোমাকে।’

মনে মনে ইতিমধ্যেই কিছু একটা করার পরিকল্পনা করে ফেলেছে কিশোর, বুঝতে পারল তার দুই সহকারী।

রবিন জিজ্ঞেস করল, ‘কি করতে চাইছ তুমি?’

খাবারে বিষ

‘জানতে চাই, ড্রিপিং চিকেনে মালটিসরবিটেন মেশানোর ব্যাপারটা জানেন কিনা মিষ্টার লারসেন। কি করে জানব, কেউ কোন পরামর্শ দিতে পারো?’  
‘পারি,’ জুন বলল। ‘বাবা তার সমস্ত কাজের ফিরিস্তি কাগজে লিখে অফিসের আলমারিতে রেখে দেয়।’

আঙুল মটকাল কিশোর। ‘আমিও তাই আশা করেছি। বের করে আনতে পারবে?’

‘তালার কঞ্চিনেশন জানি না।’

‘ও। তাঁকে না জানিয়ে কাগজগুলো বের করতে হবে। সন্দেহ করলেই সরিয়ে কিংবা নষ্ট করে ফেলতে পারেন।’

এক মুহূর্ত ভাবল জুন। তারপর হাসল। ‘বাবার সেক্রেটারির সাহায্য নিলে কেমন হয়? অনেক কিছুই হয়তো জানে ও। কঞ্চিনেশন জানলেও অবাক হব না। বসের অনেক গোপন খবরই রাখে তার সেক্রেটারি। এটা নতুন কিছু না।’

‘চলো,’ তথুনি যেতে চাইল মুসা।

‘না,’ বাধা দিল জুন। ‘আমি একা যাব। তোমাদেরকে দেখলে মুখ খুলবে না। বাবার বিরুদ্ধে একাজ করছি, ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না...’

‘হচ্ছে,’ দৃঢ় কষ্টে ঘোষণা করল যেন কিশোর। ‘লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচানোর জন্যে কাজটা করছি আমরা। একে অন্যায় বলা যাবে না। কতক্ষণ লাগবে তোমার?’

‘এই ঘন্টা দুয়েক।’

দুই ঘন্টা কেটে গেল। ওদেরকে যা যা করতে বলে গেছে জুন, তাই করল। ওর বাড়িতে বসে ওদের ক্রিজের খাবার খেল, টিভি দেখল, কথা বলল। বিশ্রাম নিল, কিশোর বাদে। এই কাজটা সে কিছুতেই করতে পারল না। চিল দিতে পারল না শরীর।

আরেক ঘন্টা পেরোল।

অবশ্যে দরজা খুলে ঘরে চুকল জুন। হাতের কাগজ দেখিয়ে সবার দিকে চেয়ে হাসল।

‘পেয়েছি,’ ফিসফিস করে জানাল সে। চারপাশে তাকাল, যেন দেখে নিতে চাইছে ওর বাবা শনে ফেলছেন কিনা। ‘আলমারি খুলে সব কাগজ দেখেছি। কোথাও লেখা নেই মালটিসরবিটেনের কথা। দেখলে তো? আমার বাবা খুনী নয়।’

জুনের কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল কিশোর।

‘মনে হচ্ছে,’ মুসা বলল। ‘লোকটাকে আর ধরতেই পারলাম না। কেসের এখানেই ইতি।’

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল কিশোর। মুখ তুলে তাকাল জুনের দিকে। ‘কেউ যদি খাবারে বিষ না-ই মিশিয়ে থাকে, ঘোরের মধ্যে বললে কেন একথা? ব্রিফকেস্টার জন্যেই এত অস্ত্রীয় হয়ে গিয়েছিলে কেন? আর ডন বারোজের নাম ছাপা এই মালটিসরবিটেনের রিপোর্টই বা তোমার কাছে কেন?’

‘জানি না,’ মাথা নাড়ল জুন।

‘আমরাও জানি না,’ কিশোরও মাথা নাড়ল। তবে কয়েকটা ব্যাপার জানি। আমাদের সন্দেহের তালিকা দ্রুত ছোট হয়ে আসছে। তোমার বাবাকে বাদ দেয়া যায়। হেনরি অগাস্টাসও বাদ, কারণ তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তোমার। যোগাযোগও নেই। মালটিসরবিটেনের সঙ্গে তাকে জড়াতে পারছি না কোনভাবে। বাকি থাকল ডন বারোজ। সে সহজেই ওই খাবারে বিষ মেশাতে পারে। তবে সে নির্দোষও হতে পারে। অন্য কেউও করে থাকতে পারে কাজটা। যে লোকটাকে বেশি সন্দেহ করছি, যার ব্যাপারে বেশি আগ্রহ আমার এখন, যে রিপোর্টটা আমাদের হাতে পড়তে দিতে চায়নি, সে হলো রহস্যময় মিষ্টার এক্স। যে আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল।’

‘ওই লোকটাকে,’ মুসা জিজ্ঞেস করল। ‘বুঝতে পারছ?’

‘আন্দাজ করতে পারছি। ফেলিক্স আরোলা।’

‘তাহলে?’ ভুরু কোঁচকাল ফারিহা। ‘পুলিশকে ফোন করব?’

‘না। প্রমাণ দরকার। মিরাকল টেস্টে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে আমাদের। কি গোপন করার চেষ্টা করছে আরোলা, জানতে হবে।’

‘কিশোর,’ হঁশিয়ার করল মুসা। ‘জায়গাটা একটা দৃঢ়স্বপ্ন! সিকিউরিটি ভীষণ কড়া।’

‘বেশ, তাহলে রাতের বেলা যাব। যখন গার্ডেরা সতর্ক থাকবে না। ঘুম থাকবে চোখে।’

‘তাহলে আজ রাতেই করতে হবে কাজটা,’ জুন বলল। ‘বাবার সেক্রেটারি আরেকটা কথা বলেছে আমাকে, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ সন্ধ্যায় বিরাট এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ড্রিপিং চিকেনের খবর দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দিতে চায় বাবা। বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে।’

‘তাই নাকি! সর্বনাশ!’ বলে উঠল ফারিহা।

চিকেন লারসেনের কথা মনে পড়ল কিশোরের। তিনি বলেছেনঃ লোকে জানতেও পারবে না কিসে আঘাত করেছে ওদেরকে!

## চোদ্দ

-

বিকেল পাঁচটা। রবিনের গাড়িতে বসে আছে গোয়েন্দারা। লং বীচে মিরাকল টেস্টের অফিস আর গুদাম থেকে কিছু দূরে। জুনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যার যার বাড়ি গিয়েছিল। কালো শার্ট প্যান্ট পরে এসেছে। কিশোরের হাতে কালো চামড়ার একটা হাতব্যাগ। কোলের ওপর রেখেছে। জিনিসটা নতুন দেখছে রবিন আর মুসা।

‘আরোলা বেরোলেই আমরা ঢুকব,’ ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে বলল কিশোর।

‘ও আছে কি করে জানলে?’ রবিনের প্রশ্ন।

‘আছে,’ জবাবটা মুসাই দিয়ে দিল। ‘ওর গাড়ি দেখছ না? ওই যে। চিনি।’

‘তুমি চিনলে কি করে?’ রবিন অবাক হলো।

‘সেদিন চিকেন লারসেনের বাড়িতে পার্টির পর ওকে অনুসরণ করেছিলাম। ওই গাড়িতে করে মিরাকল টেস্টে এসেছিল সে।’

আস্তে আস্তে মিরাকল টেস্টের পার্কিং লট খালি হয়ে যেতে লাগল। ছ’টার সময় বেরোল আরোলার ধূসর রঙের ক্যাডিলাক অ্যালানটে গাড়িটা। চলে গেল লস অ্যাঞ্জেলেসের দিকে।

‘চিকেন লারসেনের সাংবাদিক সশ্রেলনে গেল হয়তো,’ অনুমানে বলল মুসা।

গাড়ি থেকে নামল তিনজনে। প্রায় দৌড়ে চলে এল মিরাকল টেস্টের পার্কিং লটে। ঢোকার মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল রবিন। পাহারায় রইল। দরজাটা পরীক্ষা করতে গেল মুসা আর কিশোর।

‘সিকিউরিটি দেখছে?’ গুড়িয়ে উঠল মুসা।

দেখছে। তিনজনেই তাকিয়ে রয়েছে ছোট একটা ইলেক্ট্রনিক প্যানেলের দিকে। আলোকিত একটা কীপ্যাড রয়েছে সেখানে। কাচের দরজার পাশে ক্রোমের দেয়ালের মাঝে। দরজার ওপাশে গার্ডের ঘর। কাউকে চোখে পড়ছে না।

‘টহল দিতে গেছে হয়তো,’ রবিন বলল। ‘এইই সুযোগ। তুকে পড়া দরকার।’

কীপ্যাডের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। নিচয় ওর মধ্যে কোন বিশেষ কোড ঢোকাতে হয়। তাহলেই খুলবে। কিন্তু ভুল কোড যদি ঢোকে, কি আচরণ করবে? দারোয়ানকে সতর্ক করার জন্যে সিগন্যাল দিতে আরও করবে না তো?

কোড না দিলে বোৰা যাবে না। ঝুঁকি নিতেই হবে। চামড়ার ব্যাগটা খুলতে লাগল কিশোর। বলল, ‘একটা ইলেক্ট্রনিক লক কমবিনেশন ডিকোডার নিয়ে এসেছি। কীবোর্ডে লাগিয়ে দিলেই কমবিনেশন পড়ে ফেলতে পারবে। কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়, তাই না? সাকিং ডায়াগ্রাম দেখে দেখে বানিয়ে ওঅর্কশপে পরীক্ষা করে দেশেছি। কাজ করেছে। এখানে কি করবে কে জানে!’

কুড়াইভার দিয়ে দ্রুত কীপ্যাডের কভার প্লেট খুলে ফেলল সে। ডিকোডারের দুটো অ্যালিগেটর ক্লিপ লাগিয়ে দিল দুটো বিশেষ তারের সঙ্গে। উজ্জেনায় দুর্দুর করছে ওর বুক। কাজ করবে তো? সুইচ টিপল। বেশ কিছু টিপ্পটিপ শব্দ আর আলোর ঝলকানির পর যন্ত্রটা কতগুলো নম্বর দিল ওকে।

‘হয়েছে?’ দরজার দিকে পা বাড়াল মুসা। চলো, দেখি...’

ওর ক্ষাঁধ খামচে ধরল কিশোর। দাঁড়াও। কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে! কালো যন্ত্রটায় হাত বোলাল সে। ঠিকমত কাজ করছে না। যে নম্বরটা দিয়েছে ওটা এখানকার কমবিনেশন নয়। ওঅর্কশপে যে রিডিং দিয়েছিল, সেটা।’

‘ইলেক্ট্রনিক এই যন্ত্রপাতি এ জন্যেই দেখতে পারি না আমি,’ বিরক্ত হয়ে বলল রবিন। ‘কখন যে বিগড়ে যাবে ঠিকঠিকানা নেই।’

‘সব যন্ত্রই বিগড়ায়, এগুলোর আর দোষ কি? ইলেক্ট্রনিকস যতটা সুবিধে করে দিয়েছে তার তুলনায় ছোটখাট এসব গোলমাল কিছুই না। হয়তো কোন ক্যাপাসিটর খারাপ পড়েছে, গেছে বাতিল হয়ে, বদলে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন তো আর সময় নেই...’

‘না, নেই। ওই যে, গার্ডও চলে আসছে।’

তাড়াতাড়ি যন্ত্রটা ব্যাগে ভরে শার্টের ভেতরে লুকিয়ে ফেলল। কিশোর গোবেচারা মুখ করে রইল। তার ডেক্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দারোয়ান, এই সময় গিয়ে বেল বাজাল রবিন।

দরজা সামান্য ফাঁক করে তিনজনেরই পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বোলাল দারোয়ান। তারপর জিজেস করল, ‘কি চাই?’

কিশোর বলল, ‘আমরা ব্র্যাক মেসেজার সার্ভিস থেকে এসেছি।’ নিজেদের কালো পোশাকের ব্যাখ্যাও দিয়ে ফেলল এক কথাতেই। ‘মিষ্টার আরোলার অফিস থেকে কিছু একটা বের করে নিতে হবে আমাদেরকে। তিনি বলেছেন, খুবই নাকি জরুরী।’

‘একটা জিনিস নিতে তিনজন দরকার?’ দারোয়ানের সন্দেহ গেল না।

‘আমি কি জানি?’ হাত ওল্টাল কিশোর। ‘আসতে বললেন, এসেছি। আমাকে তাঁর প্রয়োজন।’

‘ওর গাড়ি নেই,’ কিশোরকে দেখাল রবিন। ‘তাই আমাকেও আসতে হলো।’

‘আর ওরা কেউ অফিসটা চেনে না,’ রবিন আর কিশোরের কথা বলল মুসা। ‘আমি চিনি। না এসে আর কি করব?’

তাই তো, না এসে কি করবে! অকাট্য যুক্তি! আমি তো জানতাম শ্রী সুজেসরা মরে ভূত হয়ে গেছে, বিড়বিড় করল দারোয়ান। তবে আর কথা না বাড়িয়ে দরজা খুলে দিল। ‘যাও। কি নেবে নিয়ে জলনি বিদেয় হও,’ হলের দিকে দেখিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে।

দারোয়ানের নির্দেশিত দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। সমস্ত পথটায় কাপেটি বিছানো রয়েছে। বাঁয়ের পথ ধরল ওরা। ওদিকেই অফিসটা, বলেছে দারোয়ান। ডান দিকে চলে গেছে আরেকটা পথ। পথের শেষ মাথায় ওয়াল নাট কাঠের তৈরি একটা দরজার সামনে এসে থামল ওরা। দরজায় লেখা রয়েছে: একজিকিউটিভ সুট।

বেশ বড় সাজানো গোছানো ঘর আরোলার। দু’ধারে বিশাল জানালা, একেবারে মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত। বাতাসে তাজা ফুলের সুবাস, যদিও একটাও ফুল চোখে পড়ছে না কোথাও। ঘরের মাঝখানে রোজডেক কাঠের মস্ত টেবিল। তাতে রয়েছে বিল্ট-ইন টেলিফোন আর কম্পিউটার। এককোণে গোছানো রয়েছে নটিলাস কোম্পানির ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি। দেয়ালে বোলানো আর তাকে সাজানো রয়েছে অসংখ্য স্মারকচিহ্ন আর পুরক্ষার। সুগন্ধি বিশারদ সে। অতীতে কাজের জন্য ওগুলো পেয়েছে। নানা রকম ক্যানভির মোড়ক, আর অন্যান্য খাবারের মোড়ক সুন্দর করে ফ্রমে বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালে। বোঝা যায়, ওগুলো সব তার নিজের আবিষ্কার।

ওসব জিনিস কোনটাই চমৎকৃত করতে পারল না কিশোরকে, করল কেবল আরোলার ফাইলিং সিস্টেম।

‘কি খুঁজতে এসেছি আমরা?’ টেবিল টেনিস খেলা যায় এতবড় ডেক্সের দিকে

তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

‘মালটিসরবিটেনের একটা জার হলেই চলবে,’ কিশোর বলল। ফাইলিং কেবিনেট খুলতে লাগল সে। ‘ড্রিপিং চিকেনে মেশানো হয়েছে, ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, এ রকম যে কোন জিনিস হলেও চলবে। যে যে উপাদান মেশানো, নিশ্চয় লিখে রেখেছে কাগজে,’ ফোন্ডারগুলোর পাতা ওল্টাতে শুরু করল সে।

‘এখানেও একটা কম্পিউটারের টার্মিনাল রয়েছে,’ বাথরুম থেকে জানাল রবিন। দামী একটা কোলানের শিশি খুলে খাঁকল। ‘বাহু, চমৎকার গন্ধ!’

‘কি চমৎকার?’ জানতে চাইল মুসা।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, ‘ব্রামিনেটেড সিউডোফসফেট!’

‘কি বললে?’ বাথরুমের দরজায় উকি দিল রবিন। ‘ইদানীং আরও জটিল হয়ে গেছে তোমার কথাবার্তা!’

‘সহজ কথাটা বুঝতে না পারলে আমি কি করব? বলছি, ড্রিপিং চিকেনে ব্রামিনেটেড সিউডোফসফেট মেশানো হয়েছে। কাগজপত্রে তা-ই লেখা রয়েছে। জুন আমাকে যেসব কাগজপত্র এনে দিয়েছে ওগুলোতে।’

‘মুসাও আজকাল ওরকম করে কথা বলে,’ মুখ বাঁকাল রবিন। ‘গাড়ির ইঞ্জিনের ব্যাপারে ও যে কি বলে, কিছু বুঝতে পারি না! এই তো, গত হাত্তায় মেরামত করে দেয়ার সময় কি জানি কি হয়েছিল, বলল।’

ঠেলে ফাইল কেবিনেটটা লাগিয়ে দিল কিশোর। ‘গত দুই বছরের পারচেজ অর্ডার, ইনভয়েস আর ইনভেনটরি লিস্ট ঘাঁটলাম। তাতে মিরাকল টেক্স কোম্পানি কোন উপাদান কিনেছে বা তৈরি করেছে, এ রকম কথা লেখা নেই। গুদামে গিয়ে খুজতে হবে। এখনই।’

কার্পেট বিছানো পথ ধরে প্রায় ছুটতে ছুটতে হলঘরে ফিরে এল ওরা। দারোয়ান বসে বসে চুলছে। ওদের সাড়া পেয়ে চমকে জেগে গেল, ‘পেয়েছ তোমাদের জিনিস?’ জিজ্ঞেস করল সে।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন আর মুসা। জবাব দেয়ার ভারটা ওর ওপরই ছেড়ে দিতে চায়।

‘না,’ কিশোর, বলল। ‘বললেন তো এখানেই আছে, কিন্তু পেলাম না। গুদামঘরের অফিসে বললেন।’

‘গুদামঘর? দূর, মাথা খারাপ এগুলোর! এই, ওটাকে কি গুদামের অফিস মনে হয়েছে? তোমাদের কি কমনসেপ্স বলেও কিছু নেই।’

‘কমন সেপ্স আছে আমাদের দলের চার নম্বর লোকটার,’ নিরীহ কঠে জবাব দিল রবিন। ‘কিন্তু সে আজকে আসেনি।’

‘যাও। ডানের পথটা ধরে যাও, যেটাতে কার্পেট বিছানো নেই। তিনটে লাল দরজা পেরিয়ে যাবে। তারপরেই পাবে গুদামঘর। যত্ত্বোসব।’ ওদের দিকে তাকাল দারোয়ান। ‘দরজা দেখতে কেমন সেটা জানো তো?’

‘ও জানে,’ কিশোরকে দেখাল মুসা।

হলঘর থেকে বেরিয়ে কার্পেট ছাড়া পথটা ধরল ওরা। একে একে পেরিয়ে

এল তিনটে লাল রঙ করা দরজা । তুকল বিরাট এক ঘরে । নিঃশ্঵াস ফেলতে ভুলে গেল যেন । একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে অসংখ্য কেমিক্যালের ড্রাম ।

‘লেবেল পড়ে দেখ,’ নির্দেশ দিল কিশোর । ‘জলদি ।’

‘কটা বাজে?’ ভুরু নাচাল রবিন ।

‘প্রায় সাতটা ।’

‘নটায় সম্মেলন শুরু হবে, ভুলে গেলে চলবে না । তাড়াতাড়ি সারতে হবে আমাদের ।’

ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল তিনজনে । একটু পরেই চিৎকার করে ডাকল রবিন, ‘অ্যাই, দেখে যাও !’

ড্রামের সাবির ফাঁক দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল কিশোর আর মুসা । কংক্রীটের মেঝেতে মচমচ করছে জুতো, চেষ্টা করেও শব্দ না করে পারছে না ওরা । একগাদা তিন আর কাঠের পিপার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রবিন । প্রতিটির গায়ে লেবেল লাগানোঃ ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেটস ।

‘পেয়ে গেলাম, যা খুঁজছিলে,’ রবিন বলল কিশোরকে । ‘এতে কি প্রমাণ হলো?’

জবাব না দিয়ে লেবেলে লেখা তারিখ দেখল কিশোর । তারপর বলল, ‘দেখ, কবে এসেছে?’

পড়ে মুসা বলল, ‘দুই মাস আগে ।’

‘কি ভাবে এল?’ কিশোরের প্রশ্ন । ‘ভাল করে ইনভয়েসগুলো দেখেছি আমি । দুই মাস তো দূরের কথা, গত দুই বছরেও কেনা হয়নি ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেট । এক আউন্সও না । ...ছোট টিনও আছে । নিয়ে যাব একটা । ডেতরে আসলে কি আছে দেখা দরকার ।’

‘দেখার আর দরকার কি?’ বলে উঠল একটা কষ্ট, ‘আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো বলে দিতে পারি ।’

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা । দাঁড়িয়ে আছে ফেলিঙ্গ আরোলা ।

‘এত বে মুখোমুখি হয়ে যাব, ভাবতে পারিনি,’ বলল সে । ‘ভেবেছিলাম, তদন্তটা বাদই দিয়ে দেবে তোমরা । ভুল করেছি । শেষে আমার পেছনেই লাগলে ।’

পাথর হয়ে গেছে যেন গোয়েন্দারা ।

‘সরি,’ পিস্তলটা আরেকটু সোজা করে ধরল আরোলা । ‘খরচের খাতায় তোমাদের নাম লিখে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমার ।’

## পনেরো

পিস্তল উদ্যত রেখেই চট করে হাতঘড়ি দেখল আরোলা । ‘আর বেশি সময় নেই । একটু পরেই বেভারলি হিলটনে লারসনের সম্মেলন শুরু হবে,’ জ্যাকেটের অন্য পক্ষে হাত ঢোকাল সে ।

কি করবে এখন লোকটা? ভাবছে কিশোর।

জ্যাকেটের পকেট থেকে হাতটা বের করল আরোলা। মুঠো বঙ্গ। 'কয়েক মিনিটের মধ্যেই যা করার করে ফেলব। মরার আগে খানিকটা মার্কেট রিসার্চ করতে চাও?'

'মানে?' তীক্ষ্ণ চোখে লোকটার হাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।

মুঠো খুলল আরোলা। মোড়কে মোড়া ক্যানডি। 'খেয়ে দেখবে একটা?'

'না, কিশোর, খেয়ো না!' হৃশিয়ার করল মুসা, 'বিষ!'

আরোলার দিকে তাকাল কিশোর। তারপর তার পিস্তলের দিকে, তারপর ক্যানডির দিকে, এবং সবশেষে ঘড়ির দিকে। এমনিতেও মরবে ওমনিতেও। খেয়ে দেখলে ক্ষতি কি? পুলিশকে জানিয়ে আসেনি। কেউ উদ্ধার করতে আসবে না ওদের।

'তোমার কথার দাম দিই আমি,' আরোলা বলল। 'বুদ্ধিমান ছেলে। অনেক কিছুই বোঝ। সেদিন পার্টিতেই বুঝেছি। তোমাকে মেরে ফেলতে হচ্ছে বলে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে আমার। খেয়ে বলো, কেমন লাগে। বলবে?'

'দিন। কি আর করা? এত করে যখন বলছেন...'

'এই তো। বলেছিলাম না, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। জীবনে যদি একটা কাজ করে যেতে না পারলে, তো জন্মাই বৃথা। ওই পচা বিজ্ঞানীগুলোর মত। কেবল আবিষ্কারই করতে পারে, জিনিসের মার্কেট ভ্যালু আর বুঝতে পারে না কোনদিন।'

'মনে হচ্ছে আপনি খুব বোঝেন,' লোকটার কথা সহ্য করতে পারছে না রবিন। 'ওকে এত চাপাচাপি করছেন কেন? আপনি খেয়ে টেস্ট করে নিলেই পারেন...'

'দেখ ছেলে, বেশি ফরফর করবে না!' হঠাৎ রেগে গেল আরোলা। 'তোমার কপাল ভাল যে তোমার বস্তুর স্বাদ যাচাই করার ক্ষমতা আছে। বাঁচিয়ে রেখেছি সে কারণেই, সকলকে, নইলে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেতে,' নিজেকে শাস্ত করার জন্যে জোরে জোরে দু'বার শ্বাস টানল সে। বিড়বিড় করল, 'লাশের গন্ধও আমার ভাল লাগে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মনে হচ্ছে, আরোলার মাথায় গোলমাল আছে। কি জানি, গত কয়েক বছরে হয়তো অনেক মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে সে, খাবারে মালচিসরবিটেন মিশিয়ে। আর অপরাধ বৌধের কারণেই চাপ পড়েছে মাথায়, গেছে গড়বড় হয়ে।

'দিন, একটা ক্যানডি,' শাস্ত কষ্টে বলল কিশোর। 'খেয়ে দেখি। তবে এক শর্তে। আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল আরোলা। একটা ক্যানডি দিল কিশোরের হাতে।

মুখে ফেলল কিশোর। 'তিনটে স্বাদ। লেবু-আসল লেবুর গন্ধ পাছি, নকল না। আর রয়েছে ম্যারাং এবং শাহাম ক্র্যাকারের সর। তিনটে মিলিয়ে লেমন ম্যারাং পাই।'

'চমৎকার।'

‘এবার আমার পালা,’ কিশোর বলল। ‘ওই যে ব্রাম্ভিনেটেড সিউড়োফসফেটস লেখা রয়েছে, ওই টিমগুলোতে আসলে রয়েছে মালটিসরবিটেন, তাই না?’

‘হ্যাঁ। তাতে কি?’

কিসে ব্যবহার করতে এনেছেন। আমার বিষ্঵াস, আপনি নিচয় জানেন ওই জিনিস খাবারে মেশানোর অনুমতি দেয়নি এফ ডি এ।’

আরেকটা প্রশ্নের জবাব ঢাও তো? তাহলে আরেকটা ক্যানডি খেতে হবে। যে কোন একটা তুলে নাও,’ শয়তানী হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিল আরোলা।

‘থেয়ো না, কিশোর,’ আরেকবার বাধা দিল মুসা। ‘কায়দা করে থাইয়ে নিছে।’

কিশোরের ধারণা হলো, ক্যানডিগুলোতে অন্য বিষ না থাকলেও মালটিসরবিটেন থাকতে পারে। দু’একটা ক্যানডি খেলে তেমন কোন ক্ষতি হবে না। আর হলেই বা কি? কিছু তো আর করতে পারছে না। বরং যতক্ষণ খেয়ে যাবে ততক্ষণ মারবে না আরোলা। আর ওর কাছ থেকে কথা আদায় করারও সুযোগ মিলবে। আরেকটা ক্যানডি নিয়ে মোড়ক খুলে মুখের ভেতর ছুঁড়ে ফেলল।

‘চেরি জেল-ও। সেই সঙ্গে রয়েছে ব্যানানা ফ্লোটার আর মাখন,’ চুমতে চুমতে জানাল কিশোর। ‘আপনার জবাব পেয়েছেন। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন। মালটিসরবিটেনগুলো দিয়ে কি করবেন?’

জবাব দিতে সময় নিল আরোলা। দ্বিধা করছে মনে হলো। অবশ্যে বলল, ‘বেশ, বলছি। তেমরা তো আর বেঁচে থাকবে না, বেরিয়ে গিয়ে সব বলতেও পারবে না। গোড়া থেকেই বলি, নইলে পরিষ্কার হবে না। বছরখানেক আগে চিকেন লারসেন এসেছিল আমার কাছে। নতুন একটা খাবার তৈরি করতে আমার সাহায্য চাইল। এমন কিছু, যেটার মত সুস্বাদু জিনিস আর কেউ কখনও থায়নি। শুধু থায়নি তা নয়, ভাবতেই পারেনি কেউ, বিশেষ করে হেনরি অগাস্টাসের মত লোকে। বলল, লাভের টাকা আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে রাজি আছে। তবে, যে কোন খাবার হলে চলবে না। মুরগীর মাংস দিয়ে তৈরি হতে হবে।’

‘সুস্বাদু করে দিতে বলেছেন,’ ফোড়ন কাটল রবিন। ‘কিন্তু মিষ্টার লারসেন নিচয় বিষ মিশিয়ে দিতে বলেননি।’

‘তুম চুপ করো!’ ধমকে উঠল আরোলা। ‘ডেঁপো ছোকরা!’ আবার জোরে জোরে দম নিয়ে নিজেকে শান্ত করল সে। ‘মুরগী দিয়ে খাবার তৈরি করা সহজ। সেটা অনেকেই পারে। কিন্তু লোকে বার বার খেতে চাইবে, অর্থাৎ, নেশা হয়ে যাবে, এ রকম কি উপাদান মেশানো যায়? ভাবতে লাগলাম। ফ্লোভার মিশিয়ে যতভাবে সম্ভব সুস্বাদু করার চেষ্টা করলাম। হলো-ও। কিন্তু লারসেন যা চেয়েছে তা হলো না।’

‘তারপর দিলেন মালটিসরবিটেন মিশিয়ে?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ততীয় আরেকটা ক্যানডি খেতে বলল আরোলা। ঘড়ি দেখে বলল, ‘সময় শেষ হয়ে আসছে।...কি মেশালে যে তেমন সুস্বাদু হবে ভেবেই পেলাম না।

আমার সাধ্যমত...ও-কি, থাছ না?’

‘খাব। পরে। বলুন আগে।’

‘কিশোর,’ সাবধান করল রবিন। ‘খেয়ো না। ড্রিপিং চিকেনে যেমন ক্যারসিনোজেন মিশিয়েছে, ওই ক্যান্ডিতেও মিশিয়ে থাকতে পারে।’

‘মেশালেই বা কি? ও তো এখনই মরবে এমনিতেই,’ আরোলা বলল। ‘দশ বিশ বছরের মধ্যে টের পাবে না লোকে, ক্ষতি হবে না। অনেক লম্বা সময়। অনেকে অতদিন বাঁচবে না এমনিতেই। যাই হোক, খাবার যে বিষাক্ত, এটা কোনদিনই টের পাবে না লোকে। ভেবে দেখলাম, ক্যাঙ্গার হয়ে মারা গেলে ধরা পড়ারও কোন আশঙ্কা নেই। ওই রোগ তো আজকাল হরদম হচ্ছে। আমার বানানো খাবার খেয়ে যে হয়েছে, সেটা বোঝার সাধ্য ডাক্তারেরও হবে না। তাই ঠিক করলাম, দেব মিশিয়ে। লারসেনও কিছু জানতে পারবে না। কারণ, তৈরি করা অবস্থায় খাবার আমার কাছ থেকে নিতে হবে তাকে, আগেই বলে দিয়েছি। প্যাকেট করে পাঠিয়ে দেব তার রেস্টুরেন্টে।’

ঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর। আটটা বাজতে দেরি নেই। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। সেই সঙ্গে ফুরিয়ে আসছে ওদের আয়ু।

‘আরেকটা প্রশ্ন,’ বলল সে। ‘আজ রাতে এখানে ফিরে এলেন কেন হঠাৎ করে?’

‘দারোয়ানদেরকে ভাল বেতন দিই আমি। তোমরা ওর সঙ্গে কথা বলে অফিসে ঢোকার পর পরই ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেছে সে। আমার গাড়িতে ফোন আছে,’ কিশোরের হাতের ক্যান্ডিটার দিকে তাকাল সে। ‘খেয়ে ফেল। দেরি করলে আর কোনদিনই খেতে পারবে না। স্বাদটা বলে যাও মরার আগে।’

মোড়ক খুলল কিশোর। এটা অন্য দুটোর চেয়ে আলাদা। ভারিও বেশি। মিষ্টার এক্স আপনার দলের লোক, তাই না? ওই যে, সারাক্ষণ আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট পরে থাকে?’

‘মিষ্টার এক্স?’ হেসে উঠল আরোলা। ‘নামটা তো ভালই দিয়েছ। অবশ্য তোমার সব কিছুই অন্য রকম। ওর নাম জেনার। আমার পাশের বাড়িতেই থাকে। সেনাবাহিনীতে ছিল, বদ স্বভাবের জন্যে বের করে দিয়েছে। মেজাজও খুব খারাপ। অথবাই লোকের সঙ্গে দৰ্য্যবহার করে। ওকে দলে নেয়া বিপজ্জনক। তবে তার সাহায্য নিই মাঝে মাঝে। টাকার বিনিময়ে। যে মৃহূর্তে শুনলাম জুনের কাছে তোমরা ডিটেকচিভ, লারসেনের পার্টিতে, মনে হলো, ওই লোককে দিয়ে তোমাদের ভয় দেখাতে পারি, যাতে আমার ব্যাপারে আর নাক না গলাও। ওকে বললাম। সে প্রথমে টেপ-করল তোমাদের টেলিফোন।’

‘ইঁ,’ মাথা দোলাল কিশোর। ‘এ ভাবেই জেনেছে, চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আমরা খাবার কিনতে যাচ্ছি। পিটালুসে যাচ্ছি।’

‘হ্যাঁ। কাজের লোক। খুব চালাক। তবে তোমরা ওর চেয়ে বেশি। তোমাদের সঙ্গে চালাকি করে সুবিধে করতে পারেনি,’ কিশোরের দিকে পিস্তল নাড়ল আরোলা। ‘ক্যান্ডিটা খাও!’

‘খেয়ো না, কিশোর,’ মুসা বলল।

শুনল না কিশোর। মুখে পুরে দিয়ে চূষতে লাগল। বলল, ‘ক্যারামেল।’

‘অত তাড়াহড়া কোরো না,’ আরোলা বলল। ‘আরেকটু খাও। ভাল করে বোঝ। তারপর বলো,’ হাসছে সে।

আরও কিছুক্ষণ চূষল কিশোর। বলল, ‘আরি, তাই তো! বেশ চালাকি করা হয়েছে! ক্যারামেল আপেল। এখন মনে হচ্ছে আপেলের রসই খাচ্ছি।’

‘তোমার কথা মনে রাখব আমি,’ আরোলা বলল। ‘তোমার সম্মানেই এই ক্যানডির নাম দেব মিষ্টার এক্স। ওরকম গালভরা একটা নামই খুঁজছিলাম। দিয়ে সাহায্য করলে আমাকে। থ্যাঙ্ক ইউ।’

‘আপনি একজন ত্রিলিয়ান্ট সাইনটিস্ট, বুদ্ধিমান মার্কেটিং ম্যান,’ কিশোর বলল। ‘কিন্তু ভয়ঙ্কর খুনী।’

‘যা দিনকাল ‘পড়েছে। কাকে যে কথন কি হয়ে যেতে হবে, ঠিকঠিকানা নেই। যাই হোক, আসল কথা হলো, তোমাদেরকে এখন শেষ করে দিতে হবে। কষ্ট লাগছে আমার।’

‘পিস্তলের সেফটি ক্যাচ তো লক করা,’ কিশোর বলল। ‘অন করে নিন আগে।’

‘তাই নাকি?’ ওটার দিকে তাকাল আরোলা।

একটা মুহূর্ত দেরি করল না মুসা। সুযোগটা কাজে লাগাল। চোখের পলকে পাশ থেকে এক লাথি ঝেড়ে দিল, কারাতের ভাষায় একে বলে ইওকো-টোবিগেরি। আরোলার হাতে লাগল। উড়ে গিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ওর হাতের পিস্তল।

কিশোর আর রবিমও আক্রমণ করে বসল। কিন্তু লোকটার গায়ে বেজায় শক্তি। কিছু কারাতে-টারাতেও জানে মনে হলো। রবিনের হাঁটুতে লাথি মেরে তাকে বসিয়ে দিল। বট করে ঘুরে মুসাকে ঠেকানোর চেষ্টা করল। পারল না। আঘাতটা আটকে ফেলে গঙ্গা-বিজ্ঞানীর বুকে প্রচঙ্গ এক ঘূসি মারল মুসা। নাক কুঁচকে গেল আরোলার। পিছিয়ে গেল।

সময় দিল না মুসা। শূন্যে লাফিয়ে উঠল। মোচড় দিয়ে ওপরে তুলে ফেলেছে ডান পা, একেবারে সোজা। ‘আইইআহ’ করে কারাতের বিকট চিৎকার করে প্রচঙ্গ লাথি লাগাল আরোলার বুকে, একই জায়গায়, যেখানে ঘূসি মেরেছিল।

পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়াল আবার আরোলা। পাগলের মত চারপাশে তাকাচ্ছে। কিশোরের এক সেকেণ্ড আগে পিস্তলটা চোখে পড়ল তার। দৌড় দিল তুলে নেয়ার জন্যে।

## ষোলো

ডাইভ দিয়ে পড়ল আরোলা। একই সঙ্গে কিশোরও ঝাপ দিল। দু’জনেই হাত বাড়াল পিস্তলটা তোলার জন্যে। আগে ধরল আরোলা। তুলে নিয়ে হাসতে আরম্ভ

করল হা হা করে। তিন গোয়েন্দার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে ঘূরল।

এতক্ষণে লক্ষ্য করল আরোলা, পিস্টলের দিকেই নজর ছিল তার বেশি, যাদের সঙ্গে লড়াই করছে তারা কি করছে খেয়াল করেনি। করার সময়ও ছিল না অবশ্য। ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেটের একটা ভারি পিপা উড়ে এল তার দিকে।

মুসা আর রবিন দু'জনে মিলে তুলে ছুঁড়ে মেরেছে। দড়াম করে আরোলার গায়ে লাগল ওটা, পড়ে গেল সে। মেরেতে পড়ে ফেটে ভেঙে গেল পিপাটা। ভেতরের শত শত পার্টও মালটিসরবিটেন ছড়িয়ে গেল মেরেতে, কিছু পড়ল আরোলার ওপরও।

'নিন' শিস দিয়ে উঠল রবিন। 'নিজের ওষুধ নিজেই খানিকটা খেয়ে চাঙ্গা হোন।'

ওর কথা শনতে পায়নি আরোলা। বেহঁশ হয়ে গেছে মাথায় বাড়ি খেয়ে। ইলেকট্রিকের এক্সটেনশন কর্ড ছিঁড়ে তার হাত-পা বেঁধে ফেলল মুসা আর কিশোর মিলে।

হাঁশ ফিরল আরোলার। গো গো করে জিজেস করল, 'কি হয়েছে?'

'তেমন কিছু না,' কিশোর বলল। 'আমাদেরকে মানসিক অশান্তিতে রেখেছিলেন খানিকক্ষণ। তারপর সামান্য মারপিট হলো। চিত হয়ে গেলেন আপনি। এখন বাঁধা আছেন।'

'পুলিশকে ডাকার সময় নেই এখন,' রবিন বলল। 'পরে ওদের সঙ্গে দেখা হবে আপনার।'

'পুলিশ?' প্রতিধ্বনি তুলল যেন আরোলা।

'হ্যা,' কিশোর বলল। 'আপনার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করব আমরা। আমাদের পেছনে ভাড়াটে গুগু লাগানো, খাবারে অবৈধতাবে বিষাক্ত উপাদান মেশানো, এবং অবশ্যই আমাদেরকে খুন করতে চাওয়ার কথা রিপোর্ট করব। এর যে কোন একটা অভিযোগই আপনাকে জেলে ঢোকানোর জন্যে যথেষ্ট। যাক, সেটা পরে করব,' যেন বক্তৃতা দিছে, এই ভঙ্গিতে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'এখন তাড়াতাড়ি আমাদেরকে বেভারলি হিলটন হোটেলে যেতে হবে। বন্ধ করতে হবে সম্মেলনটা। এই, এসো তোমরা।'

আধ ঘণ্টা লাগল। মুসা চালিয়েছে বলেই, রবিন চালালে আরও বেশি লাগত। সে মুসার মত বেপরোয়া চালাতে পারে না। হোটেলের সামনে গাড়ি রেখে দৌড়ে চুকল ওরা। কোথায় কি হচ্ছে নির্দেশ রয়েছে নিচের লবিতে। পড়ে জানা গেল এমপায়ার বলরুমে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন চলছে।

প্রথমেই টেলিফোন করে পুলিশ প্রধানকে খবর দিল কিশোর, জানাল ফেলিঞ্চ আরোলার অবস্থা। তারপর ছুট দিল।

বলরুমে চুকল না গোয়েন্দারা। দরজার পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল রান্নাঘরে। সেখানে দেখতে পেল চিকেন লারসেনকে। পরনে হলুদ জগিং স্যুট। বুকের কাছে লাল আর কমলা পালক আঁকা। অবশ্যই মুরগীর। পাশে দাঁড়িয়ে আছে জুন আর ডন বারোজ। রান্নাঘরের প্রতিটি কাউন্টারে ট্রেতে স্তুপ করে রাখা ধূমায়িত ড্রিপিং

চিকেন।

'অ্যাই যে, এসে গেছ,' ভালুকের মত বিশাল থাবা তুলে এগিয়ে এলেন লারসেন। বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরলেন কিশোরের গলা। 'সত্যি কথাটা বলবে। এর জন্যে জীবনে যদি আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে না হয়, কথা বলতে ইচ্ছে না করে আমার, যদি ধৰ্ষণ হয়ে যাই, যাব। তবু, সত্যি কথাটা জানতে হবে।'

'আপাতত এই সম্মেলনের কথা ভুলে যান,' কিশোর বলল। 'মারাঘক বিষ মেশানো রয়েছে ড্রিপিং চিকেনে। ভয়াবহ ক্যারসিনোজেন ভরে দেয়া হয়েছে। পার্টি ক্যানসেল করুন। বাজারে ছেড়ে থাকলে এখুনি সেগুলো ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করুন। নইলে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাবে।'

হা করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লারসেন। রান্নাঘরের সমস্ত খুটু-খাটুর বন্ধ হয়ে গেছে, একেবারে চুপ। তারপর হঠাতে ফেটে পড়লেন তিনি, 'হাহ হাহ হাহ হা! বলেছিলাম না! ওকে আমি পালকপুত্র করে নেবই! আমাকে কেমন বাঁচিয়ে দিল, দেখলে তো ডন...'

'ডন পালাছে!' চিংকার করে উঠল রবিন।

সবাই ফিরে তাকাল। লাফাতে লাফাতে দরজার দিকে ছুটেছে ডন বারোজ।

প্রথমেই যে জিনিসটা চোখে পড়ল সেটা তুলে নিল কিশোর আর মুসা মিলে। লম্বা বড় একটা টে। ড্রিপিং চিকেনে বোঝাই। এক দুলুনি দিয়েই ছুড়ে মারল ডনকে সই করে। থ্যাপাত করে তার পিঠে গিয়ে লাগল টেটা। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল ড্রিপিং চিকেন।

টেটা ছুঁড়েই ডাইভ দিল মুসা। কাঁধ থামচে ধরল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাওয়া লোকটার। এক হ্যাচকা টানে চিত করে ফেলল মেবেতে। যেখানে ড্রিপিং চিকেন আর ওগুলোর রস গড়াচ্ছে। মাথামাথি হয়ে গেল ডনের শরীরে।

'ভয়াবহ অবাধ্যতা!' চেঁচিয়ে উঠল ডন, মুসার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে। 'এর জন্যে কোর্ট মার্শাল হওয়া উচিত তোমার!'

'কোটে তো আপনি যাবেন, বারোজ সাহেব,' হেসে বলল কিশোর। 'ড্রিপিং চিকেনে বিষ মেশানোর অপরাধে।'

'যা খুশি করতে পারো আমাকে নিয়ে। টরচার করতে পারো। নাম, র্যাঙ্ক, সিরিয়াল নাম্বার সব ছিনিয়ে নিতে পারো। কিন্তু মুখ খোলাতে পারবে না,' বেশ গর্বের সঙ্গেই বলল ডন। আঘাতিশাসে ডরপুর।

'আপনার মুখ খোলানোর দরকারও নেই। যা বলার আরোলাই বলে দিয়েছে আমাদেরকে। পুলিশ চেপে ধরলে আবারও বলবে। চিকেন লারসেনের খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়ার জন্যে যে আপনি ওকে টাকা খাইয়েছেন, সে কথাও বলবে।'

'মিথ্যক! বিশ্বাসঘাতক!' গলা ফাটিয়ে চিংকার করে উঠল ডন। 'আমি নাকি! সে-ই তো আমাকে টাকা দিল!'

হাসি বাড়ল কিশোরে। 'তাই নাকি? তাহলে আমি ভুল বলেছি। মানে, ভুল আন্দাজ করেছি।'

'বলে কি?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে লারসেনের। বিশ্বাস করতে পারছেন

না। 'অ্যাই, ভাল চাইলে স্বীকার করো সব কথা!' ডনকে আদেশ দিলেন তিনি।

'জেমারেল,' ডন বলল। 'আপনার ড্রিপিং চিকেনে এমন এক উপাদান মেশানো আছে, কয়েক বছর আগে যা বিশাক্ষ বলে ঘোষণা করে দিয়েছে এফ ডি এ। কেমন লাগছে শুনতো?'

'তুমি আমার সঙ্গে বেইমানী করেছ!' গর্জে উঠলেন লারসেন।

'করবই তো। আপনি তো আর আমাকে দশ লাখ ডলার দেননি,' ডনও জবাব দিল সমান তেজে। 'কিন্তু ফেলিঙ্গ আরোলা দিয়েছে।'

'আর সেই টাকা খেয়ে আপনি খাবারে বিষ মিশিয়েছেন,' কিশোর যোগ করল।

'দশ লাখ অনেক টাকা। বিশ্বাসী সৈনিককেও বেইমান বানিয়ে দেয়। আসলে, এসব করতে না এসে অনেক আগেই মারসেনারিতে যোগ দেয়া উচিত ছিল আমার।'

আর সহ্য করতে পারলেন না লারসেন। ছুটে গেলেন ডনের কাছে। টান দিয়ে ছিড়ে ফেলতে লাগলেন পকেটে লাগানো মেডেলগুলো, যেগুলো তিনি দিয়েছিলেন কাজের পুরক্ষার হিসেবে। 'তোমার ঘাড়টা মূরগীর ঘাড়ের মত মুচড়ে ভাঙতে পারলে এখন আমি খুশি হতাম!' চিংকার করে উঠলেন তিনি।

এগিয়ে এল কিশোর। 'আর একটা প্রশ্ন। সে রাতে জুনকে আপনিই তাড়া করেছিলেন, তাই না?'

'করেছিলাম,' স্বীকার করল ডন।

'কেন করেছিলেন?' বাবার হাত আঁকড়ে ধরে রেখেছে জুন। নইলে যেন পড়ে যাবে।

'রিপোর্টটা ছিল আম্বুর ডেক্সের ওপর। ড্রিপিং চিকেনে মেশানোর উপাদানের লিস্ট সহ। অফিস ছুটি হওয়ার পরই সেদিন থেকে গিয়েছিলে তুমি। আমার ঘরে চুকে টেবিলে দেখে ফেলেছিলে কাগজগুলো। চেঁচামেচি শুরু করেছিল। কাগজগুলোতে টপ সিক্রেট লেখা ছিল। অন্যায় ভাবে অনুমতি না নিয়ে পড়ার অপরাধে গুলি করে মারা উচিত ছিল তোমাকে। এ তো রীতিমত গুণ্ঠচরগিবি।'

'রিপোর্টটা নিয়ে পালাতে চেয়েছিল জুন,' কিশোর বলল। 'আর আপনি ওকে তাড়া করলেন?'

'করলাম। তবে ওর ক্ষতি করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না,' জুনের দিকে তাকাল ডন। 'বৃষ্টির মধ্যে তোমার গাড়িটা ঢাল বেয়ে পিছলে পড়ে গেল। ওটা নিছকই দুর্ঘটনা। আমার র্যাংকের কসম খেয়ে বলছি।'

'ওকে সাহায্য করলে না কেন তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন লারসেন।

'থেমেছিলাম...সাহায্য করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সবার আগে আমার আইডেন্টিটি। ওটা তো বাঁচাতে হবে। কাজেই নিজে কিছু না করে পুলিশকে ফোন করলাম। দুর্ঘটনার পুরো বিবরণ জানালাম। নামটা অবশ্যই গোপন রেখে।'

'বাবা,' হাঁপাচ্ছে জুন। 'এখন আমার মনে পড়ছে। অ্যাক্সিডেন্ট...ভয়কর...!' কাঁদতে শুরু করল সে। সাত্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে একহাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন

লারসেন।

‘একটা সময় তো আমরা ধরেই নিয়েছিলাম,’ কিশোর বলল। ‘এ সবের পেছনে হেনরি অগাস্টাসের হাত রয়েছে। তাকে অনুসরণ করে আপনার মুরগীর খামারতক চলে গিয়েছিলাম আমরা। ওখানে তাকে বলতে শনলাম, খামারটা সে কিনে নেবে, মুরগীর খাবার বদলে দেবে।’

‘ওই দুষ্ট মুরগীর ছানাটা কিছু বোঝে না। কোনটা চিকেন ফিড আর কোনটা চিকেন স্যালাদ বিন্দুমাত্র ধারণা নেই তার। নিজের খামারের মুরগীদের খাবার কিছুদিন পর পরই বদলাতে থাকে। কতটা ক্ষতি যে করে, বুঝতেই পারে না,’ লারসেন বললেন। ‘বাজারে গুজব ছড়ায়, আমার ফার্ম সে কিনে নেবে। এসব বলে বলে বোঝাতে চায়, আমি ধ্রংস হয়ে যাচ্ছি। ও ভাল করেই জানে, খাবার বানিয়ে আমার সঙ্গে পারবে না। আর আমার ব্যবসা কিনে নেয়ার মত অত টাকাও তার নেই। শুধু শুধু শয়তানী করা আরকি।’

‘কিশোর,’ জুন বলল। ‘এখন তো বুঝতে পারলে, আমার বাবা নির্দোষ। বলো?’

‘হ্যাঁ,’ অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। লারসেনকে সন্দেহ করেছিল, এবং সে কথা বলেছিল বলে। ‘একটা কথা বলবেন? সেদিন স্টুডিওতে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, ড্রিপিং চিকেন কামড়ে নিয়েও সেটা বার বার ফেলে দিছিলেন কেন? আমি ভেবেছি, বিষ মেশানো আছে সেটা বুঝতে পেরেই আপনি খাচ্ছেন না।’

‘খাবারের বিজ্ঞাপনের শুটিঙে সবাই ওরকম করে,’ লারসেন বললেন। ‘ধর তিরিশ বার তোলা হলো এক ছবি। তিরিশবারই যদি তুমি এক কামড় করে খাও, তাহলে তো গলা পর্যন্ত উঠে আসবে খাবার। একতিরিশ নম্বর কামড়টা বসাতেই ইচ্ছে করবে না আর।’

বাবার দিকে ফিরল জুন। ‘বাবা, ওদিকে তো লোক বসে আছে। একশোজন সাংবাদিক নিচয় অস্ত্রি হয়ে উঠেছে ড্রিপিং চিকেনের আশায়। কি করা যায়?’

বুকের কাছে অঁকা পালকে হাত বোলালেন লারসেন। উপায় খুঁজছেন মনে মনে। হাসলেন। ‘ব্যবস্থা একটা করেই ফেলব।

চুটে গেলেন তিনি বলরংমে। দাঁড়ালেন গিয়ে স্পটলাইটের নিচে মাইক্রোফোনের সামনে। ‘গুড ইভিনিং, লেডিজ অ্যাও জেন্টেলম্যান,’ বলতে লাগলেন তিনি। ‘আপনারা নিচয় ভাবছেন, আজ রাতে কেন আপনাদেরকে দাওয়াত করে এনেছি আমি। আপনারা জানেন, আপনাদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন আমি দ্রুত টাকা কামানোর তালে থাকি, আর খবরের হেডলাইন হতে চাই। হাহ হাহ হাহ!’

তাঁর হাসিতে, যোগ দিল পুরো কক্ষ। চিকেন লারসেনের স্বভাব আর কথাবার্তার ধরন জানা আছে তাদের। কেউ কিছু মনে করল না।

‘ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আজকে আপনাদের দাওয়াত করেছি আমার বিখ্যাত ফ্রাইড চিকেন খাওয়ানোর জন্যে। আর আমি যে ধোকা দিইনি, সেটা প্রমাণ করার

জন্মেই কিছুক্ষণের মধ্যে আসছে...' পরের শব্দটা বলতে সময় নিলেন তিনি, ভাবতে হয়েছে বোধহয়, 'পিজা! ঠিক। পিজা! আর শুনে নিশ্চয় আমার মতই আপনারাও অবাক হয়েছেন। কি খাওয়াতে এনে কি খাওয়াচি ভেবে।' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন লারসেন। 'তবে ক্ষদ্রমহোদয়গণ, নতুন কিছুর ঘোষণা দিতে পারব বলে গব হচ্ছে আমার। আজ রাতে আমি ঘোষণা করছি চিকেন লারসেন সিটি স্লিকার অ্যাওয়ার্ড। প্রতি বছরই কোন না কোন পুরস্কার ঘোষণা করি, জানা আছে আপনাদের। এবারও করছি। আমাদের আজকের বিজেতারা হলো কিশোর পাশা, মুসা আমান, আর রবিন মিলফোর্ড। রকি বীচের অনেকেই চেনেন তাদের, অন্তত নাম শুনে থাকবেন। ওরা তিনি গোয়েন্দা বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। ওদের সম্মানেই আজকের আমার এই পার্টির আয়োজন। কেন পুরস্কারটা দিলাম ওদের, তা নাহয় গোপনই থাক। আড়ালে আড়ালে অনেক বড় কাজ করে ফেলেছে ওরা, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে অকাল মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওদের প্রতি আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ, সেই মানুষদেরও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, যদিও ওরা জানেই না কেন থাকতে হবে।' ঘূরে তাকালেন তিনি। দরজার কাছে দাঁড়ানো বিশ্বিত তিনি গোয়েন্দাকে হাত নেড়ে ডাকলেন।

এক এক করে মঞ্চে উঠে এল কিশোর, মুসা, রবিন। স্পটলাইটের নিচে এসে দাঁড়াল। আলোর নিচে থাকার জন্যে গান্দাগাদি করে দাঁড়াতে হলো ওদের, কারণ বেশির ভাগটাই জুড়ে রয়েছেন চিকেন লারসেন।

বার বার হাত মেলালেন ওদের সঙ্গে। অনেকগুলো ফ্রী কুপন বিতরণ করলেন, যাতে বিনে পয়সায় গিয়ে লারসেন রেস্টুরেন্টে থেতে পারে। টেলিভিশন ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, হাত নাড়লেন।

'শোন,' কষ্টব্র থাদে নামিয়ে তিনি গোয়েন্দাকে বললেন তিনি, 'বিরাট বিজ্ঞাপন হলো। কয়েক মাস ধরে চলবে এটা টিভিতে।'

'আপনি খুশি থাকলেই আমরা খুশি,' জোরে একটা নিঃশ্঵াস ফেলল কিশোর।

'হ্যা, আমরা ধন্য,' বিড়বিড় করল রবিন।

'ঠিক,' বলল মুসা।

'অমন পেঁচার মত মুখ করে রেখেছ কেন?' লারসেন বললেন। 'প্রতিদিন আমার সঙ্গে তোমাদেরকেও দেখানো হবে টিভিতে। লোকে চিনে ফেলবে। ভাল হলো না?'

'না,' গভীর হয়ে বলল কিশোর। 'হলো না। চেনা হয়ে গেলে গোয়েন্দাগিরিতে খুব অসুবিধে হয়। সুবিধেও হয় অবশ্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, তবে সেটা কম। এনিওয়ে, মেনি মেনি থ্যাংকস! যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'



# ওয়ার্নিং বেল

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৯৩

‘এটা একটা পাজল হলো?’ ঠেঁট বাঁকাল কিশোর পাণি। ‘দশ বছরের ছেলেও ধী হাতে সেরে দিতে পারে!’

কিন্তু মুসার তা মনে হলো না। তার বয়েস দশ বছরের অনেক বেশি। বা হাত তো দূরের কথা ডান হাতেও সে পারবে না। ড্যাগউড'স ওয়াইফ অর্থাৎ ড্যাগউডের স্ত্রীর মানেই তো করতে পারছে না,

যদিও ড্যাগউড নামটা পরিচিত লাগছে ওর কাছে।

ডেকে পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসেছে রবিন। পেপিল আর ক্রসওয়ার্ড পাজলের একটা কপি নিয়ে ব্যস্ত। মুসার যতটা লাগছে তার কাছে ততটা কঠিন মনে না হলেও একেবারে সহজে লাগছে না।

হেডকোয়ার্টারে রয়েছে তিনজনে। হাতে কেস নেই। আকাশ খারাপ বলে বেরোতেও পারছে না। নইলে সাঁতার কাটতে যাওয়া যেত। তিনি দিন ধরেই আবহাওয়ার ঘোষণা দিয়ে চলেছে টিভিঃ আকাশ মেঘলা থাকবে, যখন-তখন বৃষ্টি নামতে পারে, হালকা বড় হওয়ার স্ফোর্বনাও রয়েছে।

কিশোর বহুবার দেখেছে, বৃষ্টির সময় যখন ঘরে আটকে থাকে, তখন কেবল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, আর যেই সে বেরোল অমনি ঝুপঝুপ করে নামে।

‘এটা কোন ব্যাপারই না,’ বলে তার সামনে রাখা পুস্তিকাটা টেনে নিল। ধাঁধার আরেকটা কপি। পেছনে নির্দেশনা লেখা রয়েছে। সেটাই পড়ল, ‘হাই স্কুলের ছাত্রদের জন্যে এই ধাঁধার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যদের বয়েস চোদ থেকে আঠারোর মধ্যে। প্রবেশ ম্ল্য লাগবে না।’ মুখ তুলে মুসার দিকে তাকাল সে। ‘পেলে কোথায় এটা?’

‘সুপারমার্কেটে বিলি করছিল। অনেকটা জোর করেই তিনটে কপি গছিয়ে দিল আমার হাতে। যেন জানতই, আমরা তিনজন।’

‘তাই নাকি! ইন্টারেস্টিং।’ আবার পড়তে লাগল কিশোর, ‘পুরুষার; উত্তর মেকসিকোর এক র্যাখে দুই হাত্তার চমৎকার একটা ছুটি কাটানো। প্রধান প্রধান আকর্ষণের মধ্যে থাকবে ঘোড়ায় চড়া, লেকে মাছ ধরা, ক্যাম্পিং, মুখরোচক মেকসিকান খাবার...’

‘খাইছে, আর পড়ো না, এখনই জিভে পানি এসে যাচ্ছে! এই কিশোর, তোমার জন্যে তো ওটা কিছু না। করে ফেল না সমাধান। আমি শিওর ফাঁস্ট প্রাইজটা তুমিই পাবে।’

তুরু নাচাল রবিন। ‘ও পারলে তো ও যাবে। আমরা যাব কি করে?’

‘ও সমাধান করলেই আমরাও দেখে দেখে বসিয়ে নেব। হয়ে যাবে।’

‘কি জানি!’ হাত ওল্টাল রবিন। ‘সবাইকে যেতে দিলে হয়। আমার বিশ্বাস, অনেকেই পারবে।’

‘তোমার বিশ্বাস ভুল...’

হাত তুলে বাধা দিল কিশোর, ‘খালি তর্ক!’

টেলারের ছাতে বড় বড় ফেঁটা পড়ার আওয়াজ হলো।

মুখ বাঁকিয়ে মুসা বলল, ‘মেকসিকোতে নিশ্চয় এরকম পচা আবহাওয়া নয়।’

পুষ্টিকার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মুসার কথা কিংবা বৃষ্টির শব্দ ওর কানে চুকচে বলে মনে হলো না। পড়ল, ‘লিখে জবাব দিলে চলবে না। টেপে রেকর্ড করে দিতে হবে। প্রথমে...’ থেমে গেল সে। দ্রুত চোখ বোলাল পাতার বাকি অংশটায়। ‘তাজব ব্যাপার!’

‘কি?’ জানতে চাইল রবিন, ‘এতে আবার অবাকের কি দেখলে?’

‘পুষ্টিকা ছাপাতে পয়সা লাগে,’ আনমনে বলল কিশোর, যেন নিজেকেই বলছে। ‘আর মেকসিকোতে ছুটি কাটাতে যেতেও পয়সা লাগে। এরকম একটা প্রতিযোগিতার জন্যে কার এত টাকা খরচ করার ইচ্ছে হলো?’

‘কোন ধরনের বিজ্ঞাপন হবে হয়তো,’ রবিন অনুমান করল। গানের কোম্পানিতে কাজ করে করে ব্যবসায়িক দিকটাই এখন বেশি নজরে পড়ে তার। ‘আসলে ওরা চায় যাতে ধাঁধার জবাব দেয়ার জন্যে ভূমি একটা টেপরেকর্ডার কিনতে বাধ্য হও। আর একটা ব্ল্যাংক ক্যাসেট।’

মাথা বাঁকাল কিশোর। ‘কি জানি। তাহলে কোন স্টোর হতে কিনতে হবে স্টেটা বলল না কেন? কোন কোম্পানির জিনিস কিমতে হবে তা-ও বলেনি।’

‘সুপারমার্কেটে লিফলেট বিলি করছিল যখন,’ মুসা বলল, ‘হয়তো ওখানকারই কোন দোকানের হবে।’

মাথা নাড়ল কিশোর। ‘কোন কিছুই ভালী করে দেখ না তুমি। সুপারমার্কেটে ইলেক্ট্রনিকের দোকান কোথায়?’

আবার পুষ্টিকাটার দিকে তাকাল সে। বেড়াতে তার থারাপ লাগে না, তবে তার চেয়েও বেশি আকর্ষণ রহস্যের প্রতি। ধাঁধা পেলে তার জবাব না পাওয়া পর্যন্ত স্বত্তি নেই। কেবলই খচখচ করতে থাকল মনে, কে এত টাকা খরচ করছে? কেন?

‘অনেক লিফলেট হয়তো বিলি করেছে,’ কিশোর বলল। ‘আর জবাব এতই সহজ অনেকেই সমাধান করে ফেলতে পারবে। সুতরাং অনেকেই মেকসিকো যাওয়ার সুযোগও পাবে। অন্তত আমরা তিনজন তো পাবই।’

‘ব্যাক হয়ে তার দিকে তাকাল রবিন। ‘তার মানে তুমি এর জবাব দিছো?’

‘কেন নয়?’ ভুকুটি করল কিশোর। ভ্রয়ার থেকে একটা টেপরেকর্ডার বের করল। একটা ব্ল্যাংক ক্যাসেট বের করে তাতে ঢোকাল। তারপর রেকর্ড করার বোতামটা টিপে দিয়ে বলতে শুরু করল সমাধান।

ঘটাখানেক পর তিনটে ক্যাসেটে তিনজনের শুন্দি সমাধান রেকর্ড করে নিয়ে তিনটে খামে ভরে সান্তা মনিকার ঠিকানা লিখল, যে ঠিকানায় জবাব পাঠাতে বলা হয়েছে পুষ্টিকায়। এক কোণে নিজেদের নাম-ঠিকানাও লিখল।

ওয়ার্নিং কেল

ট্রেলারের ছাতে বৃষ্টির শব্দ থেমে গেছে।

‘জলদি চলো,’ তাগাদা দিল রবিন। ‘পোস্ট করে দিয়ে আসি, আবার বৃষ্টি নামার আগেই।’

## দুই

পরদিন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আবার ‘দেখা দিল ক্যালিফোর্নিয়ার স্বাভাবিক সূর্য। পরের তিনটে হঙ্গা যার যার কাজে ব্যন্ত রইল তিন গোয়েন্দা।

রবিন তার চাকরিতে বাড়তি কাজ করল। দিনে বারো ঘণ্টা করে খাটতে হলো তাকে।

মুসা বাড়ির কাজ করল কিছু কিছু। তবে বেশির ভাগ সময়ই সাঁতার কাটল আর ফারিহার সঙ্গে আড়তা মেরে বেড়াল। সেই সাথে চলল কারাতের প্র্যাকটিস।

আর কিশোর রইল স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাজে ব্যন্ত। দিনে দশ-বারো ঘণ্টা খাটুনি।

একদিন বিকেলে ওয়ার্কশপে একটা নতুন ধরনের সিকিউরিটি ডিভাইস নিয়ে কাজ করছে সে, একটা তালা, ভয়েস অপারেটেড, সাক্ষেত্কৃত কথা বললে ঝুলবে। মুসাও আছে ইয়ার্ডে। ওয়ার্কশপের বাইরে ওর গাড়ি মেরামত করছে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, ‘কুকুর হইতে সাবধান!’

চমকে গেল মুসা। ‘কি বললে?’

‘না, কিছু না। বললাম, কুকুর হইতে সাবধান।’

তালা খোলার কোডওয়ার্ড এটা। কিন্তু মুসা বুঝতে পারল না। ‘কি যে বলো না বলো! এখানে কুকুর দেখলে কোথায়?’

জবাব দিতে যাচ্ছিল কিশোর, এই সময় টেলিফোন বাজল। ফিরেও তাকাল না। জানে, রবিন রয়েছে হেডকোয়ার্টারের ভেতরে। আরেকটা এক্সটেনশন সেট রয়েছে ওখানে। রক কনসার্টের জন্যে লিফলেট তৈরি করছে রবিন। হতে পারে তার কোন বাঞ্ছবী ফোন করেছে, কিংবা পরিচিত অন্য কেউ।

কয়েকবার বেজেই থেমে গেল রিঙ। মুসা আবার কাজে মন দিল।

খানিক পরেই বেরিয়ে এল রবিন। ‘কিশোর, মেরিচাটী ফোন করেছেন।’

‘আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়?’ কিছুটা অবাকই হলো কিশোর। আবার কাজ নয় তো? ইদানীং মেরিচাটীও কিশোরের বিশেষ ব্যবস্থায় যোগ দিতে আরম্ভ করেছেন। বুঝে গেছেন, অহেতুক অফিস থেকে বেরিয়ে কষ্ট করে হেঁটে না এসে ফোন করলেই হয়ে যায়। হেঁটে আসার আরেকটা কারণ অবশ্য ছিল, পয়সা বাঁচানো। বকেটকে ঠিক করেছে কিশোর। ‘আবার কোন কাজ দেবে নাকি?’

‘না, কে জানি এসেছে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।’

‘কে?’

‘মিস্টার ডজ,’ হাসল রবিন। ‘ওই ধাঁধা প্রতিযোগিতা যেটায় দিয়েছিলে তার ব্যাপারে কিছু বলবে।’

‘তাই?’ কৌতুহলী হলো গোয়েন্দাপ্রধান। প্রতিযোগিতার কথা ভোলেনি। তবে কাজ নিয়ে এই ব্যন্ত ছিল, ও ব্যাপারে খোঁজ নিতে পারেনি আর। এখন সুযোগ এসেছে। হয়তো জানতে পারবে এত টাকা খরচ করে মেকসিকোতে পাঠাতে কার এমন দায় পড়েছে।

ওরা ঠিক করল, তিনজনেই যাবে মিষ্টার ডজের সঙ্গে দেখা করতে। বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে, এই সময় বারান্দায় বেরিয়ে এলেন একজন মানুষ। লম্বা, ছিপছিপে। পরনে জিনস, মাথায় একটা দামি স্টেটসন হ্যাট সামান্য কাত করে বসানো।

তিনি গোয়েন্দাকে এগোতে দেখে হাত তুলে নাড়লেন। ‘হাই, আমি ডজ মরিস।’ ওরা কাছে গেলে একে একে তাকালেন সবার মুখের দিকে। তারপর বললেন, ‘কার কি নাম? না না, রাখ, দেখি আমিই আন্দাজ করতে পারি কিনা?’ মুসার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। ‘দেখি, কষ্টস্বর শোনাও তো তোমার?’

‘আমি মেকসিকো যাব!’ বলল মুসা। কি জানি কেন ডজকে পছন্দ করতে পারছে না। ‘পিজা খাব!’

রবিনের দিকে তাকালেন ডজ। ‘তোমার?’

‘আমার যেতে বড়ই অসুবিধে। অফিসে অনেক কাজ।’

মাথা ঝাঁকালেন ডজ। জোর করেই যেন হাসলেন। তারপর তাকালেন কিশোরের দিকে।

কিশোরও তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে। লোকটার ব্যাপারে তার প্রথম ধারণা: একটু যেন অস্বাভাবিক। হাসি, ভাবভঙ্গি সবই কেমন যেন মেকি মেকি।

‘এবার তোমার গলা শোনাও?’ কিশোরকে বললেন ডজ।

‘মেকসিকো যেতে চাই,’ কিশোর বলল!

চকচক করে উঠল ডজের চোখ। উজ্জেজনা ফুটল চেহারায়। এগিয়ে এসে হাত মেলালেন কিশোরের সঙ্গে।

ডজ বললেন, ‘ধাঁধা প্রতিযোগিতায় তুমিই জিতেছ। আমার র্যাঙ্কেও যেতে পারবে তুমি।’

কিশোর ভাবছে মেকসিকান র্যাঙ্কে যাওয়ার জন্যে অস্ত্রির হয়ে আছে একথাটা সহজে বুঝতে দেয়া চলবে না লোকটাকে। তার আগে কিছু প্রশ্নের জবাব জানা দরকার। বলল সেকথা।

‘কি জানতে চাও? বলে ফেল।’

‘আর ক’জন জিতেছে এই পুরক্ষার?’

‘শুধু তুমি। একলা।’

‘তারমানে শুধু আমিই ঠিক জবাব দিয়েছি?’

‘দ্বিতীয় করলেন ডজ। হ্যাঁ।’

চিন্তিত ভঙ্গিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। বুঝতে পারছে মিথ্যে কথা বলছেন ডজ। ওর মত একই জবাব পাঠিয়েছে মুসা আর রবিন। গহলে শুধু তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করছেন কেন তিনি?

‘টাকা আসছে কোথেকে?’ জানতে চাইল সে। ‘এসবের খরচ দেবে কে?’

‘আমি!'

‘কেন?’

‘বিজ্ঞাপনের জন্যে। আমার র্যাক্ষের বিজ্ঞাপন।’ হ্যাটটা খুলে নিয়ে আবার মাথায় পরলেন ডজ। আস্তাবিশ্বাসে ভরা কষ্ট। ‘আমার জায়গাটাকে আমি একটা সামার ক্যাম্প বানাতে চাই, যাতে তোমাদের মত সৌখিন টুরিস্টরা গিয়ে বাস করতে পারে। আর এই প্রতিযোগিতাটা সম্পর্কে সানডে পেপারে ভাল একটা আর্টিকেল ছাপতে চাই।’

এতক্ষণে বিশ্বাস করার মত একটা যুক্তি শুনল কিশোর। তবে পুরোপুরি নয়।

আরেকটা প্রশ্ন করতে যাবে, এই সময় নীল রঙের একটা শেভ্রলে গাড়ি দেখল ইয়ার্ডের গেটে। কিশোর মনে করল চুকবে, কিন্তু চুকল না ওটা। মুহূর্তের জন্যে গতি কমিয়েই আবার বাড়িয়ে চলে গেল। উইঙ্গীলে রোদ পড়েছিল বলে ড্রাইভারকে ভালমত দেখতে পায়নি সে। মনে হলো, একজন মহিলা। সোনালি চুল, চোখে কালো কাচের চশমা। গত দশ-পনেরো দিনে ওই গাড়িটাকে আরও কয়েকবার দেখেছে সে।

আবার ডজের দিকে ফিরল সে। ‘ঠিক আছে, আপনার পুরকার আমি গ্রহণ করলাম। কিন্তু একটা কথা। আমার এই দুই বন্ধুকে সাথে নিতে পারব?’

‘ড্রুটি করলেন ডজ। তার মানে ওদের খরচও আমাকে দিতে বলছ?’

‘বলছি,’ দৃঢ়কষ্টে বলল কিশোর।

মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে নিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে কানা মোচড়াতে শুরু করলেন ডজ। পায়ের ওপর শরীরের ভার বদল করলেন। তাকিয়ে রয়েছেন জুতোর দিকে। তারপর মুখ তুলে হাসলেন। ‘বেশ, যাবে ওরাও।’

খটকা লাগল কিশোরের। এত সহজে রাজি হয়ে গেলেন ভদ্রলোক! যেন তৈরি হয়েই এসেছেন, কিশোরকে নিতে হলে তার দুই সহকারীকেও নিতে হবে। মুসার কথা মনে পড়লঃ অনেকটা জোর করেই তিনিটে কপি গছিয়ে দিল আমার হাতে! ব্যাপার কি!

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটা ম্যাপ দিলেন ওদেরকে ডজ। তাঁর র্যাক্ষের কাছাকাছি শহর লারেটোতে কি করে যেতে হবে বলে দিলেন। ছশো ডলার কিশোরের হাতে দিলেন, ওদের রাহা খরচের জন্যে। নিজের ফোন নম্বর দিলেন। যাতে সীমান্ত পার হয়েই তাঁকে ফোন করে জানাতে পারে। ওদেরকে তখন লারেটো থেকে তুলে নিতে পারবেন।

গাড়িতে গিয়ে উঠলেন ডজ। মেকসিকোর নম্বর প্লেট লাগালো। গাড়িটা চেনা চেনা লাগল মুসার। আগেও যেন কয়েকবার দেখেছে। কোথায়? মনে পড়ে গেল। সুপার-মার্কেটে একবার। আর একবার দেখেছে ইয়ার্ডের গেটে। সেকথা বলল কিশোরকে।

পরদিন সকালে অন্যান্য দিনের মতই ইয়ার্ডের ডাকবাত্র খুলল কিশোর। চিঠিপত্র কি এসেছে বের করতে গিয়ে দেখল একটা ম্যানিলা খামও রয়েছে। ভেতরে শক্ত চারকোণা একটা জিনিস। ঠিকানায় তার নাম লেখা। ডাক টিকেট নেই। তার

মানে ডাকে আসেনি খামটা, কেউ এসে তুকিয়ে রেখে গেছে।

হেডকোয়ার্টারে এনে খামটা খুলু সে। একটা ক্যাসেট। আর কিছু নেই। লেবেলে এমন কিছুই লেখা নেই যা দিয়ে বোঝা যায় কি রেকর্ড করা রয়েছে টেপে।

একটা টেপ রেকর্ডারে ভরে বোতাম টিপল সে। নীরবে ঘুরতে লাগল টেপ। অনেক পরে কথা বলে উঠল একটা শান্ত কষ্টঃ মেকসিকোতে এসো না, পুঁজি! মারাঞ্চক বিপদে পড়বে তাহলে! ক্যালিফোর্নিয়াতেই থাকো…'

হঠাতে করেই নীরব হয়ে গেল কষ্টটা।

পুরো টেপটা চালিয়ে দেখল কিশোর। আর কোন কথা নেই।

চেয়ারে হেলান দিল সে। মেসেজটা ভাবনায় ফেলে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। তবে আরেকটা ব্যাপার খচখচ করছে ওর মনে। কষ্টস্বর চেনা চেনা লাগল। আগে শুনেছে। কোথায়, মনে করতে পারল না।

কয়েক মিনিট পরে মুসা এসে হাজির। ওকে টেপটার কথা বলল কিশোর। আবার চালিয়ে দিল ওটা।

কিশোরকে অবাক করে দিয়ে হাসতে লাগল মুসা। ‘কেউ মজা করেছে তোমার সঙ্গে। রসিকতা।’

‘রসিকতা?’

‘হ্যাঁ। কেন, নিজের কষ্টস্বর চিনতে পারছ না?’

‘নিজের কষ্টস্বর?’ অবাক হলো কিশোর।

‘হ্যাঁ, অবিকল তোমার নিজের কষ্ট। নকল করেছে কেউ। তুমি যেভাবে অন্যেরটা নকল করো। এ এক মন্ত্র রসিকতা।’

‘আমার কষ্ট!’

‘হ্যাঁ। ইচ্ছে হলে বাজি ধরতে পারো। আমার গাড়িটা ধরতে রাজি আছি আমি।’

## তিনি

জানালার কাছে বসেছে কিশোর। পুরানো বাসটা যেন গড়াতে গড়াতে চলেছে মেকসিকোর ভেতর দিয়ে। বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

প্রথমে ভেবেছিল, মুসার গাড়িতে করেই আসবে। কিন্তু পরে বাদ দিতে হলো ইচ্ছেটা, যখন শুনল মেকসিকোতে প্রেটল পাওয়া কঠিন।

নতুন একটা টী-শার্ট পরেছে সে। তাতে বড় বড় করে স্প্যানিশে লেখা রয়েছেও হ্যালো, আয়্যাম ফ্রেণ্টলি। সে আশা করছে এতে লোকে তার প্রতি আগ্রহ দেখাবে, স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলবে, যে ভাষাটা মোটামুটি বুঝতে পারে সে। বলতেও পারে কিছু কিছু।

শক্ত পুষ্টিকের সীট। শরীর বাঁকিয়ে পেছনে ঘুরে তাকাল সে। অন্য দু'জন কি করছে দেখার জন্যে। মেকসিকোর ইতিহাসের ওপর একটা বই পড়ছে রবিন। ওর পাশে বসে আছে অল্প বয়েসী একটা সুন্দরী মেকসিকান মেয়ে। বার বার রবিনের

দিকে তাকাছে। একা চুপচাপ বনে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেছে মনে হয়। সে চাইছে রবিন পড়া থামিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলুক।

দুটো সীটের মাঝখানে ফাঁক খুব কম। মুসার লম্বা পা ঠিকমত জায়গা হয় না। কোনমতে গুটিয়ে নিয়ে বসেছে, তাতে বেশ অবস্থিই লাগার কথা। কিন্তু কেয়ার করছে না যেন সে। ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওরা দু'জনেও টৌ-শার্ট পরেছে। মাগনা পেয়েছে রবিন। রক গ্রুপকে এই শার্টই সরবরাহ করেছে ওর কোম্পানি। রবিনেরটায় লেখা 'দ্য সারভাইভারস' ও মুসারটায় লেখা 'ওয়াইল্ড ওয়েষ্ট'।

রবিনের পেছনে বসা মাঝারি বয়সের এক মহিলা। বাসের অন্য সব মেকসিকান মহিলা যাত্রীর সঙ্গে কোন তফাত নেই ওর। বাদামী চামড়া। সুতীর ব্রাউজ গ্যায়ে দিয়েছে, উলের স্কার্ট। লাল একটা শাল দিয়ে মাথা ঢেকেছে, দুই পাশ ছড়িয়ে আছে দুই কাঁধে। কালো চুলের লম্বা লম্বা দুটো বেণি। সান্তা মনিকায় বাসে ওঠার সময়ই মহিলাকে দেখেছে কিশোর। এর পর দু'বার বাস বদল করতে হয়েছে। মহিলা রয়েছে ওদের সঙ্গেই।

অবশ্যে বই রেখে পাশের মেয়েটার সঙ্গে কথা আরম্ভ করল রবিন। ইংরেজি জানে মেয়েটা। ফলে কথা বলা সহজ হলো। 'আমি স্প্যানিশ ভাল বলতে পারি না,' বলল সে। 'এই বুয়েনাস ডায়াস-টায়াস জাতীয় দু'একটা শব্দ।'

'মেকসিকো কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'মনে হয় ভালই হবে।' আগেও যে এখানে এসেছে, সে কথা বলল না রবিন।

'এরকম মনে হওয়ার কারণ?'

'ইয়ে...' বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন। ভেবে নিয়ে বলল, 'আমেরিকায় প্রায়ই মেকসিকান স্ট্রীট মিউজিকের সুনাম শুনি। খুবই নাকি ভাল।'

'ওধু মিউজিকের জন্যেই?' হাসল মেয়েটা। 'আর কিছু না?'

'আরও অনেক কিছু।' বলবে কিনা দ্বিধা করছে রবিন। 'এই যেমন, মরুভূমি। চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যাচ্ছে বাস। লোকজন নামছে। তারপর যেন নির্জন অঞ্চলে হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে যাচ্ছে। একেবারে নো ম্যানস ল্যাণ্ডের মাঝে। অবাক লাগে। এই মরুভূমির মাঝে কোথায় যায়?'

'যার যার খামারে। কাউকে কাউকে পাঁচ মাইল কিংবা তারও বেশি হাঁটতে হয় বাস থেকে নামার পর।'

'এন্তো! অথচ দেখে মনে হয় যেন এই মিনিট পাঁচকের পথ হাঁটতে যাচ্ছে। হাসিমুখে নামছে বাস থেকে। দিব্য চলে যাচ্ছে, যেন কিছুই না।'

'আসলে তা নয়। মরুভূমির ভেতরে হাঁটাটা সত্যিই কঠিন। তবে আমেরিকানদের মত মুখ গোমড়া করে রাখে না মেকসিকানরা। হাসিখুশি থাকতেই পছন্দ করে।'

ছোট একটা শহরে চুকে একটা দোল দিয়ে থেমে গেল বাস। ম্যাপ দেখল কিশোর। তারপর ফিরে তাকিয়ে মুসা আর রবিনকে ইশারা করল। আবার বাস বদলাতে হবে।

মেকসিকান মেয়েটাকে গুড বাই জানিয়ে র্যাক থেকে ব্যাগ নামাল রবিন

ব্যন্ত রান্তার ছোট একটা কাফের সামনে বাস স্টেশন। বেরিয়েই কাফেটাতে চুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

‘আমার যা খিদে পেয়েছে না!’ একটা টেবিলে বসতে বসতে মুসা বলল।

সে আর রবিন খাবারের তালিকা ভাল করে দেখেতেন অর্ডার দিল বীফ বুরিটুস উইথ রাইস অ্যাণ্ড বীন। এই খাবারগুলো তেমন ভাল লাগে না কিশোরে। সে অর্ডার দিল দুটো চিকেন টাকোর। কিন্তু খাওয়ার পর বুকতে পারল ভুলটা কি করেছে।

‘বাপরে বাপ! কাফে থেকে বেরোনোর সময় বলল কিশোর, ‘আগুন লাগিয়ে দিয়েছে জিভে। এতো ঝাল! মরিচ গুলে দিয়েছে!’

বাসের দিকে এগোচ্ছে, হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াল চামড়ার ছেঁড়া জ্যাকেট পরা এক লোক। লম্বা, ভারি শরীর, বয়েস বিশ হবে। কিশোরের বুকে ধাক্কা দিয়ে কর্কশ কষ্টে স্প্যানিশে বলল, ‘যাছ কোথায়? বাসে জায়গা নেই।’

অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। লোকটাকে আগেই দেখেছে। তখন তো বেশ আন্তরিক মনে হয়েছিল। এখন এরকম আচরণ করছে কেন?

কিশোর দেখতে পাচ্ছে, বাসের অধীক সীটই খালি। ভদ্র ভাবে সেকথা বলল লোকটাকে।

একটুও নরম হলো না লোকটা। বরং আরও জোরে ধাক্কা লাগাল, ‘না, হবে না। বাসে উঠতে পারবে না। চলে যাও এখান থেকে। আমেরিকায় ফিরে যাও, তিনজনেই। তোমাদেরকে এখানে চাই না আমরা।’

‘কিন্তু আমরা যাচ্ছি না,’ দৃঢ় কষ্টে বলল কিশোর। ‘আমি ওই বাসে উঠবই। দয়া করে সামনে থেকে সরুন।’

সরা তো দূরের কথা, কিশোরের কাঁধ খামচে ধরল লোকটা। ‘ভাল চাইলে কেটে পড়। নইলে বিপদ হবে বলে দিলাম।’

কয়েক হঞ্চ ধরে জুড়োর প্র্যাকটিস বেশ জোরেশোরে চালিয়েছে কিশোর। অনেক দক্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু মনে হলো, বিশালদেহী এই মেকসিকান্টার সঙ্গে জুড়ো খাটিয়েও পেরে উঠবে না। সে কিছু করার আগেই এক ঘুসিতে তার দাঁত ভেঙে দেবে লোকটা। এক ঝাড়া দিয়ে দ্রুত পিছিয়ে এল কিশোর, লোকটা ঘুসি মারলেও যাতে তার মুখে লাগাতে না পারে।

চুপ করে সব দেখছিল এতক্ষণ মুসা। চট করে এখন পাশে চলে এল কিশোরে। ‘কি, হচ্ছেটা কি?’ লোকটা যে ওদেরকে বাসে উঠতে দিতে চায় না একথা মুসাকে বলল কিশোর।

‘কেন?’

‘কি জানি। হয়তো আমেরিকানদের পছন্দ করে না।’

‘ও, তাই। কিন্তু আমরা যে সব বলে ঠিক করেছি। বলে দাও ওকে।’

ঘুসি মেরে বসল লোকটা। লাগলে চিত হয়ে যেত মুসা। কিন্তু চোখের পলকে সরে গেল সে। পরক্ষণেই আঘাত হানল, কাঁধের সামান্য নিচে, কারাতের শুটো-উচি। আরেকটা ঘুসি মারার জন্যে তৈরি হচ্ছিল লোকটা, তার আগেই অবশ হয়ে

গেল তার কাঁধের কাছটা । প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়া মানুষের মত ঝুলে পড়ল  
তার হাত । চেপে ধরল আহত স্থান । মুসার মুখের দিকে তাকাল ।

অপেক্ষা করছে মুসা । সামান্য বাকা করে রেখেছে পা । দুই হাত সামনে  
বাড়িয়ে দিয়েছে, হাতের আঙুল একদম সোজা ।

অবাক হয়ে গেছে মেকসিকান লোকটা । আহত জায়গায় হাত চেপেই  
রেখেছে । তারপর কয়েক ডলা দিয়ে যেন সেখানে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার  
চেষ্টা চালাল ।

ডান হাতটা উঁচু করল মুসা । লোকটা আগে বাঢ়লেই কারাতের কোপ  
মারবে ।

মাথা নাড়ল লোকটা । বিড়বিড় করে বলল, ‘অনেক হয়েছে । ঘাড় মটকে আর  
মারা পড়তে চাই না ! বাপরে বাপ ! দশ লাখ পেসো দিলেও না !’

মাথা নাড়তে নাড়তেই সরে পড়ল সে ।

হেঁচকি উঠল কিশোরের । হেসে ফেলল রবিন আর মুসা । লাল হয়ে গেল  
কিশোরের গাল ।

‘কী?’ ভুঁরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, ‘চিকেন টাকো পেটেও আগুন  
লাগিয়েছে? খাও আরও ।’

‘এই চলো,’ তাগান্দা দিল মুসা । ‘আমাদের বাস রেডি ।’

বাসে উঠল তিন গোয়েন্দা । কাফেতে সেই লাল শাল পরা মহিলাকে দেখা  
যায়নি । বাসে উঠে দেখা গেল পেছনের সীটে বসে আছে ।

পার্স থেকে কয়েকটা নোট বের করে জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিল । বাদামী  
একটা হাত দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা । পলকের জন্যে চোখে পড়ল পুরানো  
চামড়ার জ্যাকেটের হাতা ।

ওরা সীটে বসতে না বসতেই চলতে শুরু করল বাস ।

দীর্ঘ যাত্রার এটাই শেষ পর্যায় । একসময় চুলতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা ।  
অস্বস্তিকর তন্ত্র । সারাটা রাতই কাটল প্রায় এই অবস্থায় । জায়গায় জায়গায় পথ  
ভীষণ খারাপ । ঘূর্মানো অসম্ভব ।

সকাল নটার দিকে লারেটোতে পৌছল বাস । গাছে ঘেরা একটা ছেট চতুরে  
একসারি বেঞ্চ রাখা, ওটাই বাস স্টেশন ।

সীমান্ত পার হয়েই উজকে ফোন করেছিল কিশোর । বাস থেকে নেমে দেখল,  
তিনি দাঁড়িয়ে আছেন জীপ নিয়ে । ওদেরকে দেখে খুশি হয়েছেন, তবে বেশ  
অস্থির । অবাকই লাগল তিন গোয়েন্দার । ওরা গাড়িতে ব্যাগ তোলার সময়  
বারবার বলতে লাগলেন, র্যাপ্তে পৌছতে দেরি হবে না । কিশোরের মনে হলো,  
ওদেরকে নয়, নিজেকেই বোঝাচ্ছেন যেন ।

চতুর থেকে বেরিয়েই পেছনে তাকাল কিশোর । আছে । একটা সাইডওয়াকের  
ওপর দাঁড়িয়ে জীপটার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে লাল শাল পরা মহিলা । ওর  
উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল কিশোর । তবে মহিলা তার জবাব দিল না ।

তাতে কিছু মনে করল না কিশোর । এটাই বরং স্বাভাবিক । কয়েক হাজার  
পেসো খরচ করেছে মহিলা, সেই মেকসিকান লোকটাকে দিয়েছে ওদেরকে

ঠেকানোর জন্যে। পুরো টাকাটাই জলে গেছে। ঠিকই লারেটোতে পৌছেছে তিন গোয়েন্দা।

## চার

র্যাখে পৌছতে দুই ঘণ্টা লাগল।

একেবেঁকে, কখনও ঘুরে ঘুরে চলে গেছে পাহাড়ী পথ। পাহাড়ের ঢাল বনে ছাওয়া। সামনে, দূরে একসারি উচু পর্বত। ডজ জানালেন, ওটাই সিয়েরা মাদ্রে।

টেলিভিশনে দেখা পুরানো একটা সিনেমার কথা মনে পড়ল রবিনের। হেমে জিজ্ঞেস করল সে, ‘ওই সিয়েরা মাদ্রে পর্বতেই হামফ্রে বোগার্ট আর তার সাথীরা গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিল, তাই না?’

রবিনের কথায় কেন যেন গঞ্জির হয়ে গেলেন ডজ। মাথা নেড়ে বললেন, ‘দ্য ট্রেজার অভ সিয়েরা মাদ্রে শুধুই একটা ছবি। সত্যি নয়। ওই পর্বতে গুপ্তধন নেই।’ চট করে পেছনের সীটে বসা মুসার দিকে তাকাল রবিন।

এর খানিক পরেই র্যাখে পৌছল ওরা। কাঠের তৈরি লম্বা, নিচু একটা বাড়ি। চারপাশের খোলা প্রান্তের ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা লেকের ধারে। মাঠে কয়েকটা ঘোড়া চরছে, এছাড়া জীবনের আর কোন চিহ্নই নেই কোথাও।

লেকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। দুই-তিন মাইল লম্বা আর আধমাইল মত চওড়া হবে লেকটা, আন্দাজ করল সে। ভাবল, মাছ ধরার চমৎকার জায়গা। সাথে করে ছিপ নিয়ে আসায় ভালই হয়েছে। লেকের অন্যপাশে আর কোন বাড়ি-ঘর নেই। কেবল গাছের জটলা। তবে গাছপালার ওপাশে পুরানো একটা বাড়ির ঢাওয়ার চোখে পড়ছে। গির্জা হতে পারে, কিংবা দুর্গ। হয়তো মানুষও বাস করে ওখানে।

ডজের পিছু পিছু বারান্দায় উঠল ওরা। বড় একটা ঘরে ঢুকল। ফায়ারপ্লেস আছে। আরাম করে বসার জন্যে আছে অনেকগুলো চেয়ার।

‘বিদে পেয়েছে নিশ্চয়?’ জিজ্ঞেস করলেন ডজ।

‘একেবারে মনের কথাটা বলে ফেলেছেন,’ মুসা বলল।

হাত তালি দিল ডজ। সঙ্গে সঙ্গে এসে ঢুকল একজন মেকসিকান লোক।

‘ওর নাম পিরেটো,’ ডজ জানালেন। ‘আমার বাবুর্চি।’ তিন গোয়েন্দার নাম ধরে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজনই বোধ করলেন না যেন।

পিরেটোর বয়স পঞ্চাশের মত। গাটাগোটা শরীর। বাদামী মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ, লম্বা কালো চুল। গায়ে ডেনিম শার্ট, পরনে জিনস, পায়ে কাউবয় বুট। বাবুর্চি না হয়ে র্যাখ হ্যাঁও বা রাখাল হলেই যেন বেশি মানাত তাকে, ভাবল কিশোর।

দ্রুত স্প্যানিশ ভাষায় লোকটাকে নির্দেশ দিতে লাগলেন ডজ। ‘নাস্তা’ আর ‘এক্ষুণি’ শব্দ দুটো বুঝতে পারল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল পিরেটো। চোখের মণি বাদামী, তবে এতটাই গাঢ়, প্রায় কালোই মনে হয়। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল রবিন, কথা বলার সময় ডজের দিকে

সরাসরি তাকায় না। কেমন যেন একটা এডিয়ে চলার প্রবণতা। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রক্ষায়কের মাঝে যেমন থাকে অনেকটা তেমনি।

ভাল বাবুটি পিরেটো। মুসা আর কিশোর শুয়োরের মাংস খায় না, জেনে গেছে। তাই গরুর মাংস ভাজা করে আনল। সেই সঙ্গে প্রচুর ডিম আর গরম গরম রোল।

লম্বা টেবিলটার মাথায় তিন গোয়েন্দার সঙ্গে বসলেন ডজ, তবে খেলেন না কিছু। কাঁটা চামচ দিয়ে একটা রোলকে খোঁচাতে থাকলেন নার্ভাস ভঙ্গিতে। তিন গোয়েন্দার খাওয়া শেষের অপেক্ষা করছেন, যেন কিছু বলার জন্যেই। কিছু একটা ভাবিয়ে তুলেছে মনে হয় তাঁকে।

‘পেট ভরল?’ মুসাকে শেষ টুকরোটা মুখে পুরতে দেখে বললেন তিনি।

‘বোঝাই হয়ে গেছে। দারুণ লাগল।’

উঠে দাঁড়ালেন ডজ। ‘এসো। তোমাদেরকে র্যাখ্টো দেখাব।’

বাইরে বেরিয়ে দ্রুত একটা বেড়ার কাছে নিয়ে এলেন ওদেরকে। অনেকখানি জায়গা ধিরে বেড়া দেয়া হয়েছে। মাঠের একধারে ছোট একটা কাঠের ছাউনি।

‘এসো, আমার বারো দেখাব।’ ওদের মতামতের অপেক্ষা না করেই ছাউনিটার দিকে এগিয়ে গেলেন ডজ। ওটার কাছে পৌছার আগেই ছাউনি থেকে বেরিয়ে এল একটা গাধা, মেকসিকানরা বলে বারো। বেরিয়েই ওদেরকে দেখে থমকে গেল, তারপর যেন লজ্জা পেয়েই ওদের কাছ থেকে সরে গেল।

মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে কালো একটা দাগ গিয়ে কাঁধের কাছটায় ছড়িয়ে পড়েছে জানোয়ারটার। চামড়াটাকে প্রায় সাদাই বলা চলে। বড় বড় কান, লম্বা লেজের মাথায় চুলের ঘন গোছা। সামনের একপায়ে দড়ি বাঁধা। সেটা ছুটিয়ে পালানোর চেষ্টা করল।

যে-কোন পোষা জানোয়ার মুসার পছন্দ। গাধাটাকে আদর করার জন্যে এগোতে গেল সে। থামিয়ে দিলেন ডজ। ‘ছঁয়ো না। বয়েস একেবারেই কম, বড়জোর দু'বছর। পোষ মানেনি এখনও।’

কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা টুকছে গাধাটা। এলোপাতাড়ি কয়েকবার পেছনের পা ছুঁড়ে যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল কাছে গেলে ভাল হবে না।

‘অনেক বুনো গাধা আছে এখানকার পাহাড়ে,’ ডজ জানালেন। ‘মাস দুই আগে আমার মাঠে চুকে পড়েছিল ওটা। ধরে ফেললাম। ওর নাম রেখেছি শারি।’ মুসার দিকে তাকালেন তিনি। ‘নাম ধরে ডেকে দেখ। বলো, এদিকে এসো, শারি। দেখ কি করে।’

ব্যাপারটা কি? ওদেরকে শিশু মনে করছেন নাকি ডজ? এমন ভাবে কথা বলছেন! তবে যেহেতু জানোয়ারটাকে ভাল লেগেছে তার, ডজের কথামত ডাক দিয়ে বলল, ‘এখানে এসো, শারি। এসো।’

লম্বা কানদুটোকে পেছন দিকে শুইয়ে ফেলল শারি। প্রায় ঘাড় ছুঁয়েছে কানের চুগা। ঘোড়ার স্বভাব জানা আছে মুসার। তা থেকেই আন্দাজ করল, সতর্ক হয়ে উঠেছে গাধাটা। কিংবা রেগে গেছে। আরেকবার ডাকল নাম ধরে। কাছে তো এলই না, আরেকটু না গেল ওটা, দড়ি লম্বা হলে আরও সরত।

‘তুমি ডাকো,’ রবিনকে বললেন ডজ।

‘কি হবে ডেকে?’ এসব ছেলেমানুষী ভাল লাগছে না রবিনের। ‘বললে আরও  
সরে যেতে চাইবে।’

‘তা ঠিক।’ হাসলেন ডজ। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি  
ডাকবে?’

শারির আসা-যাও্য নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই কিশোরের। এলেই বা কি,  
না এলেই কি? কিন্তু যে ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ডজ; কৌতূহল হলো  
তার।

বিরক্তি চেপে জোরে ডাক দিল কিশোর, ‘এদিকে আয়, শারি।’

অদ্ভুত কাণ্ড করল শারি। ঘটকা দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এদিকে। সরাসরি  
কিশোরের দিকে। একবার কেঁপে উঠল কানের ডগা। সামনের দিকে বাড়িয়ে  
দিল।

‘খাইছে! কাণ্ডটা কি হলো?’

‘আবার!’ ফিসফিসিয়ে উত্তেজিত কঢ়ে বললেন ডজ। ‘আবার ডাকো।’

আগ্রহী হয়ে উঠেছে কিশোর। আবার ডাক দিল, ‘এদিকে আয়, শারি।’

দড়ি বাঁধা পা দিয়ে বাতাসে লাখি মারল শারি, দড়িটা খুলে ফেলার চেষ্টা  
করল। তারপর সৌভে এল কিশোরের দিকে। ফুটখানেক দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল।  
গলা লম্বা করে নাক দিয়ে আলতো গুঁতো দিল ওর বুকে।

‘তোমার প্রেমে পড়ে গেছে! মেয়ে, গাধা তো।’ হেসে কিশোরের কাঁধে চাপড়  
মারল রবিন। ‘কেমন লাগছে, কিশোর? মাত্র তিনটে শব্দ ব্যবহার করলে। আর  
জলজ্যান্ত একটা গাধাকে পাটিয়ে ফেললে।’

পিছিয়ে গেল কিশোর। গাধাটার এই আচরণ অবাক করেছে ওকে। রবিনের  
কথায় লজ্জা পেয়েছে।

‘আদর করো ওকে।’ কিশোরের হাত চেপে ধরল ডজ, যাতে সরে যেতে না  
পারে। ‘দেখ, কি করে?’

প্রচণ্ড কৌতূহল চাপতে পারল না কিশোর। আন্তে করে হাত বুলিয়ে দিল  
শারির মাথায়। ঝট করে কান সোজা করে ফেলল গাধাটা। আবার কিশোরের বুকে  
নাক ঘষল।

চওড়া হাসি ছড়িয়ে পড়েছে ডজের মুখে। যেন এইমাত্র বিরাট অঙ্কের একটা  
বাজি জিতে গেছেন, এমনি ভাবভঙ্গ। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে  
কিশোরকে অবাক করে দিয়ে বললেন, ‘নাহ, আর কোন সন্দেহ নেই আমার! আমি  
এখন শিওর, ও তোমাকে পিঠে চড়তে দেবে। যাও। ওঠো। বয়েস কম হলে কি  
হবে, যা শক্তি আছে তোমার মত একজন মানুষকে সহজেই বইতে পারবে। সাধে  
কি আর ‘বলে ভারবাহী গাধা।’ এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন তিনি, যেন মন্ত  
এক দৃশ্যস্তা থেকে রেহাই পেয়েছেন।

দ্বিধা করছে কিশোর। গাধার পিঠে চড়ার আগ্রহ নেই। কিন্তু ডজের অতি  
আগ্রহ অসংখ্য প্রশ্নের ভিড় জমিয়েছে ওর মনে। কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়  
রয়েছে এসবের পেছনে। গোয়েন্দা হিসেবে এখন তার উচিত সমন্ত সূত্র খতিয়ে

দেখা।

ডান পা তুলে দিয়ে লাফিয়ে গাধার পিঠে চড়ে বসল সে। ঘাড় বাঁকা করে বড় বড় কোমল চোখ মেলে ওকে দেখার চেষ্টা করল শারি। টাম টান হয়ে গেছে কান, খাড়া হয়ে আছে মাথার ওপর। সওয়ারি হিসেবে কিশোরকে নিতে মনে হয় আপরি নেই তার।

‘হ্যা, এবার চলতে বলো।’ ফিসফিস করে শিখিয়ে দিলেন ডজ। গলায় উত্তেজনা।

হঠাতেই কথাটা মনে পড়ে গেল কিশোরের। প্রকাশ করল না সেটা। চলতে বলল গাধাটাকে।

টলমল পায়ে আগে বাড়ল ওটা। জিন, লাগাম কিছুই নেই। শারির গলা জড়িয়ে ধরে রাখতে হলো কিশোরকে, যাতে পড়ে না যায়। একটা সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন তাকে ডজ। মেকসিকোতে তো বটেই, আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলেও কাউ-বয়রা ঘোড়া চালানোর সময় কিছু বিকৃত শব্দ ব্যবহার করে, যেমন, চলতে বললে বলে ‘গিডিআপ’, আর ধামতে বললে ‘হ্যাঁ’। সেটাই পরখ করে দেখার ইচ্ছে হলো তার। কয়েক কদম এগোতেই বলল সে, ‘হ্যাঁ, শারি, হ্যাঁ!’

সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করল গাধাটা। থেমে গেল।

‘বাহ্! এগিয়ে এলেন ডজ। কিশোরকে গাধার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করলেন। চমৎকার শিখে ফেলেছে তো তুমি। গাধাটাকেও পোষ মানিয়ে ফেলেছে।’

‘হ্যা,’ মুসা বলল। ‘মানুষ, জানোয়ার সব কিছুকেই পোষ মানতে ওস্তাদ কিশোর পাশা। ও যে কোন কাজটা পারে না, সেটাই বুঝি না মাঝে মাঝে।’

‘মজার কাও করল,’ ডজের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। ভুল করে হয়তো আমাকে অন্য কেউ ভেবেছে শারি, যার কথা সে শোনে।’

‘তা কি করে হয়?’ মাথা নাড়লেন ডজ। ‘এখানে যখন এসে চুকল, পুরোপুরি বুনো ছিল শারি। সারা জীবনে কেবল দু’জন লোককে দেখেছে। আমাকে, আর পি঱্ঠেটাকে।’

‘কিন্তু আপনাদের দু’জনের কারও মতই দেখতে-নই আমি।’ নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল গোয়েন্দাপ্রধান। জটিল কোন ভাবনা মাথায় চুকলেই মাঝে মাঝে এই কাজটি করে সে। তার ধারণা এতে তার ভাবনার একাগ্রতা আসে।

আধঘন্টা পরে যখন বিশাল ঘরটায় এসে বসল, তখনও চিমটি কাটা বন্ধ হলো না তার। রবিন আর মুসাও বসেছে ওর সঙ্গে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সে, মাঠের ধারের ছাউনিটার দিকে। বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সাদা গাধাটা। এদিকেই তাকিয়ে শারি জানোয়ারটাও। আন্তে করে ডাক দিচ্ছে, যেন চাইছে কিশোর গিয়ে আবার তাকে আদর করুক।

‘শারি!’ ছিপটা জোড়া লাগাতে লাগাতে আচমকা চিৎকার করে উঠল মুসা। ‘ঠিক, মনে পড়েছে। শারি হলো গিয়ে ড্যাগউডের স্তৰির নাম! যে ধাঁধাটার সমাধান করেছিলে সেদিন, তাতে একটা জবাব ছিল, শারি।’

‘তা ছিল,’ সায় দিয়ে বলল কিশোর। ‘তবে শুধু শারিই নয়। আরও কিছু জবাব ছিল ওটাতে। আরও সূত্র।’

'আর কি সূত্র?' ব্যাগ খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল রবিন। কাপড় বের করে শুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে লাগল ওয়ারদ্রোবের ড্রয়ারে। 'ওই গাধাটা কেন তোমার প্রেমে পড়ল, সেই সূত্র?'

রসিকতাটা এড়িয়ে গিয়ে কিশোর বলল, 'গাধাটাকে বলার জন্যে আমাদেরকে যেসব শব্দ বলেছে, ক্রসওয়ার্ড পাজলের উন্নরণলোই হলো সেসব শব্দ।'

'তাই?' মুসার প্রশ্ন। 'আর কোনটা?'

দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ মুদল কিশোর। ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'কাম। হিয়ার। গিডি আপ। উঙ্গ। দুর্ভাগ্য কিংবা দৃঃখ বোঝাতে ব্যবহার হয় এই উঙ্গ শব্দটা। আর, হয়া শারি, মানে হলো, থাম। শারি! এবং প্রতিটি কথা অঙ্করে অঙ্করে পালন করে গাধাটা।'

নিজের বাংকে গিয়ে বসে পড়ল রবিন। চিন্তিত ভঙ্গিতে ভূকুটি করল একবার। বলল, 'কিশোর, তুমি কিছু একটা ভাবছ।'

নীরবে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। জবাব দিল না।

আবার বলল রবিন, 'মুসাও তো ওই শব্দগুলোই ব্যবহার করেছিল। শারি তো ওর কথা শোনেনি?'

'জানি,' রবিনের মতই অবাক হয়েছে কিশোরও। 'বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। তবু বলতে হচ্ছে, ওই গাধাটার সঙ্গে কোথাও দেখা হয়েছে আমার। সে জন্যেই আমাকে চিনতে পারছে। অন্তত আমার গলা যে চিনেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

## পাঁচ

সে রাতে পিরেটোর তৈরি প্রচুর পরিমাণে শিক কাবাব আর বনকুটি দিয়ে ডিনার সেরে সকাল সকাল শুতে গেল তিন গোয়েন্দা।

কয়েক ঘণ্টা পরেই ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। তার বাংকের পাশে জানালার বাইরে দেয়ালে গা ঘষার শব্দ। মাথা উঁচু করে জানালা দিয়ে দেখল, শারি। কাচের ভেতর দিয়ে নাক ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

নিচু গলায় ধূমক দিল কিশোর। হাত মুঠো করে দেখাল। চলে যেতে বলল গাধাটাকে। কিন্তু গেল না ওটা। এখন মুসা কিংবা রবিন জেগে উঠে যদি ব্যাপারটা দেখে ফেলে, তাহলে টিটকারি দিয়ে দিয়ে তার জান জুলিয়ে দেবে। বিড়বিড় করে আপনমনেই গাল দিল গাধাটাকে। তারপর বিছানা থেকে নেমে পেছনের দরজার দিকে রওনা হলো। পাণ্ডু খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে মার্থা ঢুকিয়ে দিল শারি। তার বুকে নাক ঢেকিয়ে ঢেলতে আরঙ্গ করল। সরল না কিশোর। গাধার বুকে ঢেলা দিয়ে ওটাকে বাইরে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু জানোয়ারটা ছোট হলেও গায়ে ভীষণ জোর, বালির বস্তার মত গঁয়ট হয়ে রইল যেন। কিছুতেই নড়ানো গেল না। শেষে বাধ্য হয়ে নিজেই বাইরে বেরিয়ে এল। মোলায়েম গলায় ওটার নাম ধরে কথা বলতে বলতে।

চোখের পলকে ঘরে গেল গাধাটা। চাঁদের আলোয় কিশোর দেখল, ওটার

পায়ের দড়ি নেই। মুক্ত। আবার সে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করলেই ওটাও সঙ্গে চুকবে। আহ, মহা জ্বালাতন! এর হাত থেকে বাঁচা যায় কিভাবে? জবাব একটাই। ওটাকে মাঠে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। বাড়ির একমাথার বারান্দা থেকে কথ শোনা গেছে। একজন পুরুষ, একজন মহিলা। ডজের সঙ্গে কথা না বললেও তিনি গোয়েন্দার সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করেছে পিরেটো, কথা বলেছে। স্প্যানিশ ভাষায় কিশোরের কাছে আমেরিকার কথা জিজ্ঞেস করেছে। লেকটার কথা বলে হাঁশিয়ার করে দিয়েছে, ওটাতে যাতে সাঁতার কাটতে না যায়। পর্বত থেকে নেমে আসা পানি নাকি বরফের মত শীতল, কোন মানুষই কয়েক মিনিটের বেশি টিকতে পারবে না। শুনেই এখন পিরেটোর ভাবি কষ্ট চিনতে পারল কিশোর। তবে বেশ দূরে। অস্পষ্ট। কি বলছে বোৰা যায় না।

মহিলা কে? জানার কৌতুহল হলো কিশোরের। পা টিপে টিপে এগোন দরজার দিকে। পাশে থেকে চলল শারি। ওটার গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে চলল কিশোর, যাতে শব্দ না করে গাধাটা।

মহিলার কথা এখন বোৰা যাচ্ছে। 'আমাকে সাহায্য করতেই হবে, পিরেটো।' স্প্যানিশ ভাষা। 'পেয়ে যাওয়ার পর কি করবে আন্দাজ করতে পারছ? ওদেরকে খুনও করে বসতে পারে ডজ!'

মুখ খারাপ করে মেকসিকান ভাষায় ডজকে কয়েকটা গাল দিল পিরেটো। 'বেশ,' বলল সে। 'যতটা পারি, তোমাকে সাহায্য আমি করব। এখন থেকে আমি তোমার দলে।'

পিরেটোকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল মহিলা।

দ্রুত সেখান থেকে সরে এসে বাড়ির ছায়ায় অঙ্ককারে লুকিয়ে পড়ল কিশোর। হালকা পায়ের শব্দ এগিয়ে যাচ্ছে চতুরের দিকে। মহিলা চলে যাওয়ার আগে পলকের জন্যে ওকে দেখতে পেল সে। তবে এদিকে পেছন ফিরে থাকায় মুখ দেখা গেল না। চাঁদের আলো পড়েছে সোনালি চুলে।

কিশোরের গায়ে কাঁধ ঘষছে গাধাটা। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে মাঠে ঢোকার গেটটা খোলা। শারিকে সেখানে নিয়ে গেল কিশোর। তারপর চট করে গেটের এপাশে চলে এসে পান্তা লাগিয়ে ছড়কো আটকে দিল। বেড়া ডিঙিয়ে চলে এল আবার এপাশে। ওপর দিয়ে মাথাটা এপাশে টেলে দিয়ে কর্কশ গলায় ডাকতে শুরু করল গাধাটা। লাফিয়ে পেরোতে পারবে না ওটা, বুঝে স্বত্ত্বির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

ফিরে এল বিছানায়।

পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরোনোর আগে সংক্ষেপে সব জানাল দুই সহকারীকে। বলল, জরুরি একটা টেলিফোন করতে হবে। ডজকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে বের করে নিয়ে যেতে হবে বাড়ি থেকে, এবং এই কাজটা করতে হবে রবিন আর মুসাকেই।

কাচা মরিচ মিশিয়ে মেকসিকান কায়দায় ডিম ভেজে দিল পিরেটো। কিশোরের যুব পছন্দ এই খাবারটা, কিন্তু পেট ব্যথা করছে, এই ছুঁতো দিয়ে

খেল না।

ডজও বসেছেন ওদের সঙ্গে। তাঁকে জিজ্ঞেস করল মুসা, লেকে মাছ ধরতে যাওয়া যাবে কিনা। ডজ বললেন, যাবে। কিশোর বলে দিল, পেট ব্যথা নিয়ে সে যেতে পারবে না। ঘরেই থাকবে। আধ ঘন্টা পর ঘরে রাইল শুধু সে আর পিরেটো।

কি একটা কাজে সে ঘর থেকে চলে গেল পিরেটো। প্রেটে একগাদা রোল পড়ে আছে। চমৎকার সুগন্ধ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে মুখে পুরে চিবাতে শুরু করল সে। একেবারে খালি পেটে থাকা কঠিন। লাঞ্ছের সময় হতে অনেক দেরি।

থাওয়া শেষ করে টেলিফোন সেটের সঙ্গানে বেরোল সে। পাওয়া গেল লিভিং রুমের পাশে ডজের ছোট অফিসে। পেছনে পাছুটা লাগিয়ে দিয়ে এসে ডেক্সের সামনে বসল। ফোন বুক টেনে নিয়ে দেখতে লাগল ক্যালিফোর্নিয়ার ডাইরেন্ট নম্বর কত।

একবার রিঙ বাজতেই তুলে নিলেন ভিকটর সাইমন। বিখ্যাত সেই খোঁড়া গোয়েন্দা এবং লেখক, যাঁর সঙ্গে অনেক কাজ করেছে ওরা।

কোথা থেকে করছে, জানাল কিশোর। তারপর বলল, ‘আমাকে কয়েকটা তথ্য দিতে পারেন? আপনার টার্মিনাল থেকে আমার কম্পিউটার ইনফরমেশন সার্ভিসকে জিজ্ঞেস করলে পেয়ে যেতে পারেন।’

‘করছি।’

‘থ্যাংকস। আমার পাসওয়ার্ড ঢুকে পড়বেন। ডিটেক্ট লিখতে হবেঃ ডি ই টি ই সি টি। তারপর মেন উল্টে যাবেন যতক্ষণ এনসাইক্লোপিডিয়া পাওয়া না যায়।’

‘বেশ। সাবজেক্ট কি?’

‘বারো।’

‘কী?’

‘বারো নিশ্চয় চেনেন। ছোট জাতের গাধা। ভারবাহী জন্ম।’

‘বুঝেছি।’

‘বারো সম্পর্কে কি কি জানতে চায়, জানাল কিশোর।’

লিখে নিলেন মিষ্টার সাইমন। জেনে নিয়ে কিশোরকে জানাবেন বলে কেটে দিলেন লাইন।

কথা বলতে বলতেই ছোট অফিসটার চোখ বুলিয়ে নিয়েছে কিশোর। এমনিতে, অন্য কারও ঘরে হলে ঢোকার আগে অনুমতি নিয়ে নিত সে। কিন্তু এখানে ঢুকে কোন অপরাধবোধ হচ্ছে না তার। শুরু থেকেই ওদের সঙ্গে প্রচুর মিথ্যে কথা বলেছে ডজ। কাজেই সত্য জানার অধিকার রয়েছে তিন গোয়েন্দার।

অনেক প্রশ্ন ভিড় জমাচ্ছে কিশোরের মনে। কেন ক্রসওয়ার্ড পাজল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে ওকে এখানে আনা হলো? কেন তার প্রতি এই আগ্রহ? কেন মেকসিকান লোকটা তাকে এখানে আসতে বাধা দিতে চাইল? আর শারিই বা কি করে তাকে এভাবে চিনে ফেলল?

আকর্ষণীয় তেমন কিছু পাওয়া গেল না ডজের ড্রয়ারে, সিয়েরা মাদ্রের বড় বড় কয়েকটা ম্যাপ বাদে। ওগুলোতে পেন্সিল দিয়ে আঁকা প্রশ্নবোধকের ছড়াচূড়ি।

ডজই এঁকেছে হয়তো। সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ারটাতে রয়েছে র্যাষ্টের দলিলপত্র। ওগুলোতে চোখ বোলাতে লাগল সে। নিচের স্বাক্ষরটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার।

পিরেটো সানচেনজো!

র্যাষ্টা তাহলে পিরেটোই ডজের কাছে বিক্রি করেছে। এবং তারপরে নিজের র্যাষ্টেই নিযুক্ত হয়েছে বাবুর্চি এবং রাখাল। ডজের প্রতি তার রাগের একটা ব্যাখ্যা মিলল।

একেবারে নিচের ড্রয়ারে পাওয়া গেল একটা টেপ-রেকর্ডার। ওটা বের করে ভলিয়ুম কমিয়ে পুঁ করে দিল কিশোর।

সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল নিজের গলা। বার বার শুনল নিজের কষ্টঃ কাম। হিয়ার। শারি। গিডি। উভউ। শারি। কাম। হিয়ার...

কয়েকবার শোনার পর সাবধানে ক্যাসেটটা রিউইও করে ফিতেটা আবার আগের জায়গায় এনে রেকর্ডারটা ড্রয়ারে রেখে দিল সে।

কঘেক মিনিট পরে টেলিফোন বাজল। মিষ্টার সাইমন করেছেন। বললেন, ‘রেডি?’

‘হ্যাঁ, বলুন,’ কিশোর জবাব দিল। কাগজ কলম নিয়ে তৈরি হলো।

এক এক করে প্রশ্নের জবাব বলে গেলেন তিনি, আর প্রতিটি প্রশ্নের নিচে ফাঁকা জায়গায় লিখে নিল কিশোর। লেখা শেষ হলে ধন্যবাদ জানাল লেখককে।

সাইমন বললেন, ‘যে কোন দরকার হোক, টেলিফোন করো। তোমার ওই গাধা, সরি, বারো তোমাকে কোথায় নিয়ে যায় জানার জন্যে আগ্রহী হয়ে রইলাম।’

জানাবে, বলে আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। মুসা আর রবিনের সঙ্গে এখন আলোচনায় বসতে হবে। কিন্তু ওদের ফিরতে অব্রও কম করে হলেও ঘন্টাখানেক লাগবে। অফিস থেকে বেরিয়ে আবার পাল্লাটা লাগিয়ে দিল সে।

সকাল থেকেই শারিকে দেখছে না। প্রশ্নের জবাবগুলো পেয়ে যাওয়ার পর জানোয়ারটা সম্পর্কে আরও আগ্রহী হয়ে উঠেছে। গিয়ে ওটাকে দেখার সিদ্ধান্ত নিল সে।

মাঠেই পাওয়া গেল পিরেটোকে। বারোটার সঙ্গে রয়েছে। পানি ভরছে ওটার গাম্লায়। কিশোরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে ছুটে এল জানোয়ারটা। আদর করে ওটার গলায় চাপড়ে দিল সে।

দুপুরের রোদ বড় কড়া। শার্ট খুলে ফেলেছে মেকসিকান লোকটা। কিশোর দেখল, ওর বুক আর পিঠও মুখের মতই একই রকমের বাদামী। বুঝতে পারছে না এটাই কি ওর আসল রঙ, না দীর্ঘদিন রোদের মধ্যে কাজ করার ফলে ওই অবস্থা হয়েছে।

গাধাটাকে দেখিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, ‘পায়ের দড়ি খুলে নেয়া হয়েছে কেন?’

‘কারণ তুমি যতক্ষণ আছ আর পালাবে না। অথবা বেঁধে রেখে লাভ কি?’

‘আমি?’

স্প্যানিশ ভাষায় যা বলল পিরেটো, তার মানে করলে দাঁড়ায়, ‘ঢ়টা তোমার

প্রতি কৃতজ্ঞ।

‘কেন, কৃতজ্ঞ কেন?’

শারির ধারণা তুমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছ। ওরা খুব ভাল জানোয়ার। বিশ্বাসী।  
কৃতজ্ঞতা বড় বেশি।’

বালতি তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল পিরেটো। পেছনে চলল কিশোর। তার  
সঙ্গে গাধাটা। কিন্তু আর কোন প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি হলো না মেকসিকান।  
বলে দিল তার কাজ আছে।

বেশ কয়েকটাট্রাউন্ট মাছ ধরে আনল মুসা আর রবিন। শিকে গেঁথে সেগুলো  
দিয়ে কাবাব বানিয়ে দিল পিরেটো। দুপুরের খাবার সময় হাঁটাও করেই যেন পেট  
‘ভাল’ হয়ে গেল কিশোরের, বেশি খেয়ে সকালেরটা পুষিয়ে নিল।

খাওয়ার পর-পরই দুই সহকারীকে বলল, চলো, হেঁটে আসি। বেশি খেয়ে  
ফেলেছি, হজম করা দরকার।’

রবিন আর মুসা দুজনেই বুঝল ওদের সঙ্গে কথা বলতে চায় গোয়েন্দাপ্রধান।  
কোন প্রশ্ন না করে ওর সাথে চলল ওরা। হাঁটতে হাঁটতে মাঠ পেরিয়ে চলে এল  
লেকের ধারে ছেট একটা বনের কাছে। চুকে পৃত্তল ভেতরে।

বনের ভেতরে একটুকরো খোলা জায়গা দেখে সেখানে ঘাসের ওপর বসল।  
মিষ্টার সাইমনকে যে ফোন করেছিল সেকথা জানাল কিশোর। পকেট থেকে বের  
করল প্রশ্নের জবাব লেখা কাগজটা।

দেখে দেখে বলল, ‘বারোদের শ্রবণশক্তি খুব প্রথর। তবে কুকুরের মত  
চালাক নয়। গুরু শুকে চিনতে পারে না। কষ্টস্বর শুনে চিনতে পারে। কাউকে  
পছন্দ করলে তার ভীষণ ভক্ত হয়ে যায়। কষ্ট শুনলে সাড়া দেয়।’

‘তারমানে,’ রবিন বলল, ‘তোমাকে যে পছন্দ করেছে শারি, সেটা  
সারাজীবনই এক রকম থাকবে?’ মুচকি হাসল সে।

রেগে গেল কিশোর। ‘বাজে কথা বক্স করো তো!...হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এই  
গাধাটার জন্যেই ওই ক্রসওয়ার্ড পাজলের ব্যবস্থা করেছিলেন ডজ। এমন একটা  
কষ্টস্বর খুঁজছিলেন, যেটা একটা বিশেষ মানুষের কষ্টের সঙ্গে মিলে যায়। হবে  
কোন আমেরিকান, আমাদের বয়েসী, যে গাধাটাকে ভালবাসত।’

পিরেটো কি বলেছে জানিয়ে বলল সে, ‘সেই মানুষটা বারোটার প্রাণ  
বাঁচিয়েছিল। সে কে জানি না। টেপে আমার কষ্ট শুনে বুঝতে পারলেন ডজ, সেই  
লোকটার কষ্টস্বরের সঙ্গে আমার কষ্টের মিল আছে। যে যে শব্দ দরকার সেগুলোই  
ক্রসওয়ার্ড পাজলের মাধ্যমে কায়দা করে চুকিয়ে দিয়েছেন। টেপে আমি জবাব  
দিয়ে পাঠিয়েছি। শুধু সেই শব্দগুলো বাদে আর সব মুছে ফেলেছেন। সকালে তাঁর  
দ্রুয়ার খুলে টেপটা পেয়েছি। সেই শব্দ নিয়ে গিয়ে শুনিয়েছেন শারিকে। মনে হয়  
যান্ত্রিক শব্দ চিনতে পারেনি ওটা। কাজেই জ্যাত মানুষটারই প্রয়োজন হয়েছে  
ডজের। তখন আমাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করেছেন। আমার গলা শোনার  
আগে পর্যন্ত শিওর হতে পারেননি, কাজ হবে কিনা। সেজন্যেই কাল নাৰ্ভাস  
হয়েছিলেন। ব্যাপারটা জানার জন্যে আর তর সইছিল না তাঁর। নিয়ে গিয়েছিলেন  
আমাকে গাধাটার কাছে। তারপর যখন জানলেন...নিশ্চয় খেয়াল করেছে কি

পরিমাণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।'

মীরবে কিশোরের কথাগুলো ভেবে দেখল মুসা আর রবিন।

'হঁ, অবশ্যে মাথা দোলাল রবিন। ঘূর্ণি আছে তোমার কথায়...'

'হ্যা,' মুসাও একমত হলো। 'কিন্তু এতসব বামেলা করতে গেলে কেন? না হয় একটা গাধার বাচ্চা তোমার স্বর চিনে সাড়াই দিল। এর জন্য এতগুলো টাকা খরচ করবেন ডজ?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'এর জবাব আমারও জানা নেই। তবে একটা কথা বড় বেশি খচখচ করছে মনে।'

'কি?' জানতে চাইল রবিন।

'একটা ব্যাপার হতেই পারে,' বুঝিয়ে বলল কিশোর। 'দু'জন মানুষের কষ্টস্বরে মিল থাকা সভ্য। ইয়ার্ডের ডাকবাঙ্গে একটা টেপ পেয়েছিলাম, মুসা, মনে আছে? ওটাতে রেকর্ড করা কষ্টস্বরের সঙ্গে আমার গলা মিলে যায়।'

আবার নোটের দিকে তাকাল কিশোর। বারোদের দৃষ্টিশক্তিও খুব তীক্ষ্ণ। মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। শুধু যে গলার স্বর শুনে মানুষকে চিনতে পারে, তাই নয়, চেহারা দেখেও পারে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হ্যা, তার মানে...' খেমে গেল সে।

অন্য দু'জনও শুনতে পেল শব্দটা। দ্রুত সরে যাচ্ছে পদশব্দ, বনের গভীরে। উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। পিছু নিল নিঃশব্দে।

কিন্তু ওদের চেয়ে বনটা অনেক ভাল চেনে যে যাচ্ছে। একটু পরেই ওকে হারিয়ে ফেলল ওরা। আর শুনতে পেল না পায়ের শব্দ। কোন শব্দই নেই আর, পাখির ডাক ছাড়া।

ভাগভাগি হয়ে গিয়ে পুরো এলাকাটা খুঁজে দেখবে ঠিক করল ওরা।

সেই মতই কাজ করল। খুঁজতে খুঁজতে সবার আগে খোলা জায়গাটায় ফিরে এল কিশোর। তারপর এল মুসা। মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানাল, লোকটাকে পায়নি। বসে পড়ল ঘাসের ওপর।

আরও মিনিট দশেক পর রবিন ফিরল। পকেটে হাত ঢেকানো। মুখে হাসি। এমন একটা ভঙ্গি, যেন জেনে এসেছে কিছু।

'দেখেছ নাকি কাউকে?' জিজ্ঞেস করল মুসা

'না,' জবাব দিল রবিন। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বলল, 'তবে এই জিনিসটা পেয়েছি।'

পকেট থেকে হাত বের করল সে। আঙুলে ধরা জিনিসটা দেখাল।

দেখল কিশোর আর মুসা। তিন ইঞ্জিন লম্বা একটুকরো উল। মেকসিকান শালের। রঙ লাল।

## ছয়

'শারিকে নিয়ে ভাবনা হচ্ছে আমার,' পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বললেন ডজ।

ডিম ভাজা মুখে পুরে দিয়ে মুসা বলল, 'কি হয়েছে? মন খারাপ? মখ

গোমড়া? আকাশের তারা দেখে থালি?’

টেবিলের নিচ দিয়ে ওর পায়ে লাঠি মারল কিশোর।

মুসার কথা যেন কানেই যায়নি ডজের। আবার নার্ভাস লাগছে তাঁকে। থাবার প্রায় খেলেনই না। মাঠে থাকলে বিপদে পড়ে যাবে বারোটা।

সকালে ওটাকে মাঠে দেখেছে মুসা। তার মনে হয়েছে আরামেই আছে জানোয়ারটা। তাজা চেহারা। ঘাস থাছিল। চোখ চকচকে, চামড়া উজ্জ্বল, মস্তুণ। ছাউনির বাইরে ছিল, কিশোরকে দেখেই ছুটে এসেছে। গাধার তুলনায় জোরেই ছেটে।

সেসব বলল না কিশোর। বলা যায় না, চুপ করে থাকলে রহস্যের আরেকটা সূত্র ধরিয়ে দিতে পারেন ডজ। নিরীহ ভঙ্গিতে বললেন, ‘শারি কি থাচ্ছে না?’

‘ওর খুর নিয়ে ভাবনা হচ্ছে আমার।’ কফির কাপে চুম্বক দেয়ার আগে ভূকুটি করলেন ডজ। ‘জানো হয়তো, বারোদের আদি নিবাস ছিল উন্নত আফ্রিকায়। যা শক্ত, পাথুরে মাটিতে হেঁটে অভ্যন্ত। মানুষের নথের মতই ওদের খুরও দ্রুত বাড়ে। শক্ত মাটিতে ঘৰা লেগে ক্ষয়ে গিয়ে স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু এখানকার মত নরম মাটিতে থাকলে বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেলেও অবাক হব না।’ কাপটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। ‘আর এ হারে বাড়তে থাকলে খোঁড়া হতে সময় লাগবে না।’

‘ছেটে ফেলা যায় না?’ জানতে চাইল মুসা।

একবার একজনকে ক্ষুর দিয়ে গাধার খুর চেঁচে দিতে দেখেছিল সে।

‘নাহ!’ ভুরু কুঁচকেই রেখেছেন ডজ। ‘ওর মত একটা বুনো বারো কাছেই ঘেষতে দেবে না আমাকে। ওর পা ছোঁয়ার চেষ্টা করলেই লাঠি মেরে ঘিন্ট বের করে দেবে আমার।’

কিশোর ভাবল, শারি হয়তো তাকে পা ছুঁতে দেবে। চুপ করে রইল সে। ওর মনে হলো কিছু একটা বলতে যাচ্ছেন ডজ। শারির খুরের ব্যাপার নয়, অন্য কিছু।

‘মনে হচ্ছে,’ ডজ বললেন, ‘শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিতে হবে ওকে। যেখান থেকে এসেছে সেই পর্বতেই ফিরে যাক।’ কিশোরের দিকে তাকাল সে। ‘কিন্তু, গোলমালটা হলো, ও এখন যেতে চাইবে না। কারণ তুমি রয়েছ এখানে।’

কিশোরের মনে হলো, বহুদিন ধরেই তো আছে শারি, তার খুরও বেড়েছে, তাহলে এতদিন ওকে ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবেননি কেন ডজ? তবে জিজ্ঞেস করল না। আপনা-আপনিই সে কথায় যাবেন। আর ওটা একটা জরুরি সূত্র। তিনি গোয়েন্দাকে রহস্য সমাধানে এগিয়ে দেবে একধাপ।

‘কিশোর, ওকে ছেড়ে আসতে হলে তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন ডজ। ‘আসলে, যেতে হবে আমাদের সবাইকেই। ভাবছি, পর্বতের ওদিকটায় ক্যাস্পিং করতে গেলে কেমন হয়?’ এক এক করে তিনি গোয়েন্দার দিকে তাকালেন তিনি। ‘কি বলো?’

কিশোরের কাছে ব্যাপারটা একেবারেই হাস্যকর আর ছেলেমানুষী মনে হলো। একটা গাধাকে ছাড়তে সবাই মিলে যাওয়া! রবিনের দিকে তাকিয়ে দেখল স-ও ওরই দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ টিপল কিশোর।

সাথে সাথে বৃষতে পারল রবিন। তিনজনে মিলে একান্তে আলোচনা না করা

পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে মানা করছে গোয়েন্দাপ্রধান।

ডজের দিকে তাকাল রবিন। 'ঠিক আছে। আমরা জানাব আপনাকে।' 'কখন?' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন ডজ। 'কত তাড়া-তাড়ি...'

'যত তাড়াতাড়ি আমরা মনস্থির করতে পারব,' জবাব দিল মুসা। উঠে দরজার দিকে রওনা হলো সে। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিশোর, চলো ঘুরে আসি।'

ইসিতটা বুঝতে পারলেন কিনা ডজ, কে জানে। চূপ করে রইলেন।

কিশোর আর রবিনও উঠে মুসার পেছনে চলল। বারান্দা থেকে নেমে মাঠের দিকে এগোল তিনজনে। ঘর থেকে যাতে না শোনা যায় এতটা দূরে এসে থামল।

'মনে হয় আসল সময় এসে গেছে,' ঘাসের ওপর বসে বলল রবিন। 'পর্বতে যাওয়ার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। কিশোর, তোমার কি মনে হয়?'

'আছে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আর সেটার জন্যেই আমাকে প্রয়োজন ডজের। আমার কঠ তাঁর প্রয়োজন। যাতে শারি পালিয়ে না যায়। কোথা ও আমাদেরকে নিয়ে যাবে গাধাট। পর্বতের কোন জায়গায়, যেখান থেকে এসেছে।'

'কোনখান থেকে এল?' দূরের উঁচু পাহাড় চূড়ার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'কি আছে ওখানে? স্বৰ্ণ?'

কিংবা সিয়েরা মান্দ্রের গুণধন,' কিছুটা ব্যঙ্গের সুরেই বলল রবিন। একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে লাগল। 'তো, কি ভাবছ, কিশোর? যাবে?'

'আমি তো যাবই,' কিশোরের আগেই বলে উঠল মুসা। ক্যাপ্সিং ওর ভীষণ ভাল লাগে। রাতে আগুনের ধারে বসে মাংস খালসে খাওয়া, খোলা আকশের নিচে স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে ঘুমানো আহ, কি মজা! 'তোমরা যাবে না? পথ নিশ্চয় খুব খারাপ হবে।'

'খারাপ মানে?' রবিন বলল। 'খারাপের চেয়ে খারাপ। পাথর আর বালির ছড়াছড়ি।' কিশোরের দিকে তাকাল। 'তুমি কি বলো?'

বেড়াতে খারাপ লাগে না কিশোরে। যেতে কঠ হবে। কি আর করা। রহস্যের সমাধান করতে গেলে খাটনি তো একটু লাগবেই। যত কঠই হোক, ভাবল সে, এই রহস্যের কিনারা করেই ছাড়বে।

'যাব,' রবিনের কথার জবাবে বলল কিশোর। 'চলো, ডজকে গিয়ে জানাই।'

ডজের জন্যে এটা সুব্রত। মুসা বলতেই চওড়া হাসি হাসলেন। 'তাহলে কালই রওনা হওয়া যাক, কি বলো?' রাজি হলো তিন গোয়েন্দা।

হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন ডজ। গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন লারেটোতে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্যে। তিন গোয়েন্দা চলে গেল একেক জন একেক কাজে। মুসা গেল লেকে মাছ ধরতে। রবিন বারান্দায় বসল ওর মেকসিকোর ইতিহাস নিয়ে। কিশোর চলল পিরেটোর খোঁজে।

রান্নাঘরে পাওয়া গেল ওকে। একটা ওয়াকি-টকি মেরামত করছে। সব যন্ত্রপাতি খুলে ছাড়িয়ে ফেলেছে, কিন্তু জোড়া লাগাতে পারছে না আর।

'নাহ, আমাকে দিয়ে এসব হবে না!' আনমনেই বিড়বিড় করল লোকটা। 'আমি রেডিওর কি বুবি? গাধার মত খুলতে গেছি! আমি হলাম গিয়ে ঘোড়ার

ରାଖାଲ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିସ୍କ୍ରେର କି ବୁଝି ?'

'ଦେଖି, ଆମାର କାହେ ଦିନ,' ହାତ ବାଡ଼ାଳ କିଶୋର । 'ଏସବ ମେରାମତ କରତେ ପାରି । କି ହେଯେଛିଲ ?'

'ବୋବା ହେଯେ ଗିଯେଛିଲ । ଏକେବାରେ ଚୂପ ।'

'ଠିକ କରେ କି କରବେନ ?'

'ଓୟାକି-ଟକି ଦିଯେ କି କରେ ? କଥା ବଲବ ।'

'ଏଥାନେ ଏଇ ଜିନିସ ଆର କାରେ କାହେ ଆଛେ ନାକି ?' କାର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲତେ ଚାଯ ପିରେଟୋ, ଭେବେ ଅବାକ ହଲୋ କିଶୋର । ଲେକେର ଅନ୍ୟ ପାଡ଼େର ଟାଓୟାରଟୋ ଛାଡ଼ା ଆଶପାଶେ ଆର କୋନ ବାଡ଼ିଇ ଚୋଖେ ପଡ଼େନି ତାର । ର୍ୟାଙ୍କେର କଯେକ ମାଇଲେର ମଧ୍ୟେ ନେଇ ।

'ଜାନି ନା,' ଜବାବ ଦିଲ ପିରେଟୋ ।

'ତାହଲେ ଠିକ କରତେ ଚାଇଛେନ କେନ ?'

'ଆରେ ! ନଷ୍ଟ ହଲେ ଠିକ କରବ ନା ?'

ତାର ଜବାବେ ସମ୍ମୁଦ୍ର ହତେ ପାରଲ ନା କିଶୋର । ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ନା କରେ ଜିନିସଟା ନିଯେ ବସଲ । ଗୋଲମାଲଟୋ କୋଥାଯ ଖୁଁଜେ ବେର କରାର ଚେଷ୍ଟା କରଲ । ମେରାମତ କରତେ ସାଧାରଣତ ଯେ ଧରନେର ତାର ବ୍ୟବହାର ହୟ, ସେଟୋ ପେଲ ନା । ତାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକେର ତାରେର ଭେତରେର ସରମ ତାର ବେର କରେ ନିଯେ କାଜ ଚାଲାନୋର ଚେଷ୍ଟା କରତେ ଲାଗଲ ।

'ଅନେକ ଆମେରିକାନେର ସଙ୍ଗେଇ ଆପନାର ପରିଚୟ ଆଛେ ମନେ ହୟ,' କାଜ କରତେ କରତେ ବଲଲ କିଶୋର । 'ଅଛି ବ୍ୟେସୀ କ'ଜନେର ସଙ୍ଗେ ଜାନାଶୋନା ଆଛେ ?'

'ନେଇ,' ଗଭୀର ଆଗହେ କିଶୋରେର କାଜ ଦେଖିଛେ ପିରେଟୋ । 'ଦାର୍ଢଣ ହାତ ତୋ ତୋମାର ! ଆମେରିକାର ସବୀଇ ପାରେ ନାକି ?'

'ବସାଇ ପାରେ ନା । କେଉ କେଉ ପାରେ ।' ତଥ୍ୟ ଜୋଗାଡ଼େର ଜନ୍ୟେ ଆବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରଲ କିଶୋର, 'ଅଛି ବ୍ୟେସୀ କୋନ ଆମେରିକାନ ଏଇ ର୍ୟାଙ୍କେ ଛିଲ ନାକି ? ବେଡ଼ାତେ-ଟେଡ଼ାତେ ଏମେଛିଲ ?'

'କବେ ?'

'ତିନ-ଚାର ମାସେର ମଧ୍ୟେ ? ଶାରି ଯଥନ ଏଲ ତଥନ ?'

ହାତ ଓଲ୍ଟାଲ ପିରେଟୋ । 'କତ ଲୋକଇ ତୋ ଯାଯ ଏପଥେ । ମାଝେସାଥେ ଥାମେ ।'

'ଓଦେର କାରେ ଗଲାର ସ୍ଵର କି ଆମାର ମତ ଛିଲ ? ମନେ ଆଛେ ?'

ଚେହାରାର କୋନ ଭାବାନ୍ତର ହଲୋ ନା ମେକସିକାନ ଲୋକଟାର । ତବେ ତାର କାଲୋ ଚୋଖଜୋଡ଼ା ହାସଛେ । 'ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ସମ୍ମତ ମାନୁଷକେ ଏକରକମ ଲାଗେ ଆମାର ।'

'ଆମି ଗଲାର ସ୍ଵରେର କଥା ଜିଜ୍ଞେସ କରେଛି । ଯାଇ ହୋକ, ଆପନାର କାହେ ଏକରକମ ଲାଗଲେଓ ଶାରିର କାହେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଲାଗେ ନା ।'

'ମାନୁଷର ଚେଯେ ବାରୋର କାନେର କ୍ଷମତା ଅନେକ ବେଶି ।'

ନାହ, ସୁବିଧେ ହଛେ ନା । କିଶୋର ତଥ୍ୟ ଜୋଗାଡ଼ କରତେ ଚାଇଛେ ଏଟା ବୁଝେ ଫେଲେଛେ ପିରେଟୋ । କାଜେଇ ମୁଖ ଖୁଲେଛେ ନା । ଚାପାଚାପି କରେ ଲାଭ ନେଇ ।

ସତ୍ରୁଟା ମେରାମତ କରେ ଜୋଡ଼ା ଲାଗିଯେ ଫେଲଲ କିଶୋର । ସୁଇଚ ଅନ କରଲ । କଲ ସାଇନ ଦିଯେ କୋନ ସାଡ଼ା ମିଲିଲ ନା । ଅନେକ ଭାବେ ଅୟାନ୍ତେଲା ଘୁରିଯେ ଦେଖଲ, ଜବାବ ଏଲ ନା । ତବେ ଓୟାକି-ଟକିଟା ଯେ କାଜ କରଛେ ତାତେ ସନ୍ଦେହ ନେଇ । ସାଡ଼ା ଯେହେତୁ

মিলছে না, তার মানে আর কারও কাছে ওয়াকি-টকি নেই। কিংবা হয়তো অন করা নেই।

‘হয়ে গেছে,’ বলল সে।

‘তোমরা আমেরিকানরা বড় চালাক।’

কিছু কিছু ব্যাপারে আমেরিকানরা চালাক বটে, তবে কিছু ব্যাপারে আবার বোকাও, ভাবল কিশোর। যাই হোক, সে শুধু আমেরিকান নয়, বাঙালীও। আগামী দিন সকালে ওই মেকসিকান লোকটার চালাকি ধরতে চাইলে ওর আগেই ঘূম থেকে উঠতে হবে তাকে।

ওয়াকি-টকিটা তুলে নিয়ে কিশোরকে ধন্যবাদ জানাল পিরেটো। তারপর কিশোরের হাতটা ধরে আন্তরিক ভঙ্গিতে ঝাঁকিয়ে দিল। ‘সময় করে একদিন অনেক কথা বলব তোমার সঙ্গে। একদিন, যখন...’ ফোন বেজে ওঠায় বাধা পড়ল তার কথায়। জবাব দেয়ার জন্যে অফিসে চলে গেল। ফিরে এল মুহূর্ত পরেই। ‘তোমার ফোন।’

নিশ্চয় ডিকটর সাইমন, ভাবল কিশোর। এখানে আর কারও তাকে ফোন করার কথা নয়।

কিন্তু মিষ্টার সাইমন নন। সাড়া দিল একটা মহিলা কণ্ঠ। আমেরিকান। ‘কিশোর পাশা?’

‘হ্যাঁ। কে বলছেন?’

‘তা না জানলেও চলবে। বললেও চিনবে না। তোমাকে একটা জিনিস দেখানো দরকার। তোমার জন্যে খুব জরুরি।’

উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। কোন কেস হঠাতে করে নতুন মোড় নিলে এরকম হয় তার। ‘এখানে, র্যাক্ষে চলে এলেই পারেন।’

‘না!’ র্যাক্ষের ব্যাপারে ভীত মনে হলো মহিলাকে। ‘ডজ মরগানের র্যাক্ষে যাওয়া উচিত হবে না আমার। বিপদে পড়ে যাব।’

‘ডজ বাড়িতে নেই। ল্যারেটোতে গেছেন।’

‘না, তবু যেতে পারব না,’ ভয় কাটাতে পারছে না মেয়েটা। ‘অন্য কেউ দেখে বলে দিলে পারে ডজকে। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। লেকের অন্য পাড়ে চলে এসো।’

কি করে যেতে হবে বলে দিল মহিলা। র্যাক্ষে ছাড়িয়ে কয়েক শো গজ গেলে লেকের পাড়ে একটা নৌকা দেখতে পাবে কিশোর। দাঁড় বেয়ে অন্য পাড়ে গিয়ে উঠে পড়বে ওপরে। বনের ভেতর দিয়ে গির্জার টাওয়ারের কাছে গেলে ছেট একটা গ্রাম দেখতে পাবে। গ্রামের প্রধান চতুরে অপেক্ষা করবে মহিলা।

‘একা আসবে,’ বলে দিল মহিলা। ‘কেউ যদি তোমার সঙ্গে থাকে, কিংবা আসার সময় কেউ তোমাকে দেখে ফেলেছে বলে মনে হয় আমার, লুকিয়ে পড়ব। আর আমাকে দেখতে পাবে না।’

‘কি দেখাতে চাইছেন?’

জবাব নেই।

কেটে দিয়েছে লাইন।

## সাত

বারান্দায় এল কিশোর। একমনে মেকসিকোর ইতিহাস পড়ছে রবিন। সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল। 'কি?'

মহিলার কথা জানাল কিশোর।

'হয়তো সেই আমেরিকানের ছবি দেখাবে,' আন্দজ করল রবিন। 'শারি যার ভঙ্গ।'

শ্রাগ করল কিশোর। 'তারও এ কথাই মনে হয়েছে। তবে সেটা শুধুই অনুমান।

'আমি আসব?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

একা যেতে বলেছে, জানাল কিশোর।

'হ্ম! তাহলে তো আর কিছু করার নেই। যাও। লোকজন জোগাড় করে রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে তোমার জুড়ো ব্যবহার করতে হবে আর কি।' হাসল রবিন।

জবাব দিল না কিশোর। নেমে পড়ল বারান্দা থেকে। লেকের দিকে চলল।

লেকের পাড়ে এসে মূসাকে দেখতে পেল না। কোথায় বসল?

নৌকাটা খুঁজে পেল সহজেই। কাঠের ছোট একটা ডিঙি। সীটের নিচে টুকিয়ে রাখা হয়েছে একটা দাঁড়। নৌকাটাকে পানিতে ঠেলে দিয়ে লাঁফিয়ে উঠে বসল তাতে। দাঁড়ের আংটার মধ্যে টুকিয়ে দিল দাঁড়টা।

বাইতে শুরু করল সে।

যতটা সহজ হবে ভেবেছিল ততটা হলো না। নাক সোজা রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাকে। কারণটা বুঝতে পারছে। তীরে দাঁড়িয়ে অতটা বোকা যায় না। পানিতে স্নাতের খব জোর।

বেশি চাঁপাচাঁপি করতে গিয়ে হঠাৎ মট করে ভেঙে গেল দাঁড়টা। একটানে স্নোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল ভাঙা অংশটাকে। হাতের টুকরোটার দিকে বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোর। পুরানো মনে হয়েছিল তখনই, কিন্তু পচে যে এতটা নরম হয়ে আছে কল্পনাই করতে পারেনি।

দাঁড় দিয়ে নৌকা সোজা রাখতে কষ্ট হচ্ছিল, এখন তো রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। লেজ চুলকালে সেটাকে কামড়ানোর জন্যে কুকুর যেভাবে এক জায়গায় ঘূরতে থাকে তেমনি করে ঘূরতে লাগল নৌকাটা। নানা ভাবে চেষ্টা করে দেখল কিশোর। কোন কাজ হলো না। স্নোতের টানে ভেসে চলল।

স্নোতের টানে লেকের মাঝামাঝি চলে এসেছে নৌকা, দুই তীরই এখন সমান দূরত্বে। স্নোতের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ভাঙা বৈঠা দিয়ে নৌকা বাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালাল কিশোর। লাভ হচ্ছে না।

সাহায্যের জন্যে চিৎকার করবে কিনা ভাবল। কিন্তু তাতেই বা কি লাভ? তার চিৎকার পিরেটো কিংবা রবিনের কানে গেলেও আরেকটা নৌকা ছাড়া ওরা এসে সাহায্য করতে পারবে না তাকে।

ছুটে চলেছে নৌকা। লেক বেয়ে গিয়ে পড়বে নদীতে।

সাতার ভাল জানে কিশোর। ডাইভ দিয়ে পড়ে দুব সাঁতার দিয়ে তীরে ওঠার চেষ্টা করতে পারে। মনে পড়ল পিরেটোর হাঁশিয়ারি। পানিতে গোসল করার চেষ্টা কোরো না, কয়েক মিনিটের বেশি এই পানিতে টিকতে পারবে না কোন মানুষ। পানিতে হাত দুবিয়ে দিয়ে বুঝতে পারল কিশোর, মিথ্যে বলেনি মেকসিকান লোকটা। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি।

যতক্ষণ নৌকায় রয়েছে ততক্ষণ জমে মরার ভয় অন্তত নেই। স্বোত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে নদীতে। কতক্ষণ লাগবে যেতে?

গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য গ্রামটার কথা ভাবল সে। হয়তো ওখানে কারও নৌকা আছে।

আর কোন উপায় না পেয়ে শেষে ‘বাঁচাও বাঁচাও’ বলে চিংকারই শুরু করল কিশোর। স্প্যানিশ ভাষায়। কিন্তু দুপুরের এই প্রচণ্ড গরমের সময় লেকের তীর নিজর্জন। একটা মানুষকেও চোখে পড়ল না। ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর। কোন মানুষ সাড়া দিল না।

মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করল কিশোর। বুদ্ধি একটা বের করতে হবে। নদীতে হয়তো এমন জায়গা আছে, যেখানে পানির গভীরতা কম। তাহলে হয়তো কোনমতে উঠে যেতে পারবে তীরে।

এখান থেকে বোঝা যাবে না পানি কতটা গভীর। নদীতে গেলে তার পর। মোহনা আর বেশি দূরে নেই। দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নদীটা কোথায়?

তাই তো! কোথায়! উধাও হয়ে গেছে নাকি!

বুঝে ফেলল হঠাৎ। লেকটা সোজাসুজি নদীতে পড়েনি। কারণ লেকের সমতলে নেই নদীটা। তারমানে জলপ্রপাত হয়ে নদীতে ঝরে পড়ছে লেকের পানি। সর্বনাশ!

‘কিশোর!’

চমকে ফিরে তাকাল কিশোর। তীরে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। সে তাকাতেই ছিপ নাড়ল।

দাঁড় ভেঙে যাওয়ার কথা নিশ্চয় জানে না মুসা। কিন্তু বুঝতে পারছে কি ভয়ানক বিপদে পড়েছে তার বন্ধু। কিশোর দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সে পাচ্ছে, তিরিশ ফুট নিচে রয়েছে নদী। প্রচুর পাথর আছে ওখানটায়। পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে পানি। নৌকা নিয়ে ওখানে পড়লে আর বাঁচতে হবে না। পাথরে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ডিঙ্গি...

দৌড় দিল মুসা। লেকের পাড় ধরে প্রপাতের দিকে। যেখান থেকে ঝরে পড়েছে পানি, তার কিনারে এসে থমকে দাঁড়াল। আর বড় জোর ষাট গজ মত পেরোতে হবে কিশোরকে, তারপরেই পৌছে যাবে সে যেখানে রয়েছে সেখানটায়।

সুতোর রিলের ক্যাচটা রিলিজ করে দিল মুসা। ছিপটা তুলে ধরল মাথার ওপর। একটা সুযোগ পাবে সে। মাত্র একটা। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার সময়ই মিলবে না আর। শক্ত হয়ে দাঁড়াল সে। ডিঙ্গিটার অপেক্ষায়।

সামনে চলে এল নৌকা। মাথার ওপর ছিপ ঘুরিয়ে বড়শি আর সীসা বাঁধা

সুতোর মাথাটা যত জোরে সম্ভব ছুঁড়ে দিল লেকের পানির ওপর দিয়ে।

কিশোরের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল সীসাটা। পড়ল গিয়ে ওপাশের পানিতে। হাত বাড়িয়ে সুতোটা ধরে ফেলল সে।

‘টেনো না!’ সাবধান করল মুসা, ‘ছিঁড়ে যেতে পারে! সীসাটা ধরে রাখ শুধু।’  
সুতো ধরে পানি থেকে সীসাটা টেনে তুলে ধরে রাখল কিশোর।

খুব হঁশিয়ার হয়ে আন্তে আন্তে সুতো গোটাতে আরঞ্জ করল মুসা। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে, এমন ভাবে, যাতে টান খুব কম পড়ে। অনেক বড় মাছ যেভাবে খেলিয়ে তোলে অনেকটা তেমনি করে। নাইলনের সুতো যথেষ্ট শক্ত, কিন্তু তারপরেও যে-কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে।

সুতোয় টান লাগছে, আর একটু একটু করে এদিকে ঘুরে যাচ্ছে নৌকার গলুই।

সুতো আরও কয়েক ফুট গুটিয়ে ফেলতে পারল সে।

মাঝখানের চেয়ে তৌরের কাছাকাছি স্রোত অনেক কম। সেখানেই নিয়ে আসার চেষ্টা করছে মুসা।

আরও কিছুটা গোটাল। কমে আসছে নৌকা আর তার মাঝের দূরত্ব।

স্রোতের টান থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছে নৌকাটা।

সুতো ছিঁড়ল নৌকাটা তীর থেকে দশ গজ দূরে থাকতে। তবে এখন আর অতটা ভয় নেই।

তাঙ্গা দাঁড়া দিয়ে জোরে জোরে বাইতে শুরু করল কিশোর। কিন্তু দাঁড়ের চ্যাপ্টা মাথার বেশির ভাগটাই ভেঙে যাওয়ায় পানিতে তেমন চাপ রাখতে পারছে না ওটা।

সুতোর টানে যেমন ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়েছিল নৌকা, এখনও তেমনিই এগোতে লাগল।

তারপর হঠাৎ করেই তাঙ্গা ডাঙ্গার মাথা দিয়ে মাটি নাগাল পেয়ে গেল কিশোর। লগি দিয়ে বাওয়ার মত করে বাইতে শুরু করল সে। আরেকটু এগোল নৌকা। পানি ওখানে ফুটখানেক গভীর। লাফিয়ে নেমে পড়ল সে। গলুই ধরে টেনে নৌকাটাকে টেনে নিয়ে এল কিনারে।

দৌড়ে এল মুসা। ওকে নৌকাটা ডাঙ্গায় তুলতে সাহায্য করল।

‘থ্যাংকস!’ এছাড়া বলার মত আর কিছুই তখন খুঁজে পেল না কিশোর।

‘আজকে সব চেয়ে বড় মাছটা ধরলাম,’ হেসে বলল মুসা। ‘পিরেটোকে বলব, তোমাকে যেন শিকে গেঁথে কাবাব বানিয়ে দেয়। লাঞ্ছে যেতে পারব।’

‘আরেকটু হলেই কবরে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল।’

পায়ের শব্দ শোনা গেল। দু’জনেই দেখল দৌড়ে আসছে রবিন। কিশোর ওকে রেখে চলে আসার পর পড়ায় আর মন বসাতে পারেনি। ক্ষেত্ৰহল চাপতে না পেরে কিশোর কি করে দেখার জন্যে চলে এসেছিল লেকের ধারে। দেখেছে, অসহায় হয়ে নৌকায় করে ভেসে চলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। ওকে বাচানোর কোন বুদ্ধিই বের করতে পারেনি সে।

‘দারুণ, মুসা,’ কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। ‘একটা কাজ

করেছ। হলিউডের পরিচালকরা ওরকম একটা দৃশ্যের শট নিতে পারলে বর্তে যেত।'

হাসল মুসা। 'আমি তো ভেবেছিলাম দ্য টেজার অভ দ্য সিয়েরা মাদ্রে শুটিং হবে, তুমি বানিয়ে দিলে জ'জ! মুশকিল হলো, এই কথাটা কিছুতেই শোনানো যাবে না মেরিচাটাকে। বাহবা নিতে গিয়ে বকা খেয়ে মরব, কেন তোমাকে একলা যেতে দিলাম এই জন্যে।'

কিশোরও হাসল। 'এই না হলে বস্তু!' বসে পড়ে ভেজা জুতো আর মোজা টেনে টেনে খুলছে সে। পানিতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড ছিল, তাতেই নীল হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়। ভাগ্যস সাঁতরে তীরে পৌছার চেষ্টা করেনি।

রিলের হাতল ঘুরিয়ে সুতোটা গুটাতে লাগল মুসা। রবিনকে বলতে লাগল কিশোর, কি ঘটেছে। মুসাও শুনছে ওর কথা। টেলিফোনে অচেনা কষ্ট। তারপর দাঁড় ভেঙে যাওয়া। কি যেন একটা রহস্য আছে বলে মনে হচ্ছে তার।

জিজ্ঞেস করল মুসা, 'স্ট্রেফ ভেঙে গেল?'.

'গেল। এতটাই পচা ছিল। ইচ্ছে করেই হয়তো রেখেছে ওই জিনিস।' ডাঙ্গা মাথা পরীক্ষা করে দেখে বলল কিশোর, 'যাতে জোরে চাপ লাগলেই ভেঙে যায়। আমাকে খুন করতে চেয়েছে। এমন কায়দা করেছে, সবাই যাতে মনে করে ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা।'

রবিনের দিকে তাকাল সে। 'কাউকে দেখেছ লেকের পাড়ে?'

নৌকার কিনারে বসেছে রবিন। মাথা ঝাঁকাল। 'দেখেছি। অন্য পাড়ে। একজন মহিলা। একপলক দেখলাম, তারপরেই হারিয়ে গেল বনের ভেতরে। মনে হচ্ছিল, তোমার ওপর নজর রেখেছিল সে। তুমি তখন প্রপাতের দিকে চলেছ।'

'দেখতে কেমন?' জিজ্ঞেস করল মুসা। বলেই মাথা নাড়ল, 'না না, বলার দরকার নেই, বুঝতেই পারছি। সেই মেকসিকান মহিলা। লাল শাল পরেছিল যে।'

মাথা নাড়ল রবিন। 'না। ও নয়। আমার কাছে একে আমেরিকান মনে হয়েছে। নীল জিনিস পরনে, গায়ে হালকা রঙের শার্ট আর...'

'আর সোনালি চুল,' বলে দিল কিশোর।

অবাক হলো রবিন। 'অতি-মানবিক কোন ক্ষমতা আছে নাকি তোমার!'

## আট

পরদিন সকালে পর্বতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো তিন গোয়েন্দা।

জীপের পেছনে বেঁধে লারেটো থেকে একটা হর্স বস্তু নিয়ে এসেছেন ডজ। চাকা লাগানো, চারপাশে কাঠের বেড়া দেয়া একটা টেলাগাড়ির মত। মাঠ থেকে একটা ঘোড়া ধরে নিয়ে এসেছে পিরেটো। ওটার পিঠে জিন বাঁধতে ওকে সাহায্য করছে মুসা। ঘোড়াটা খুব শান্ত। মুসা যখন ওটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল টেলার হোমে তোলার জন্যে, একটুও বাধা দিল না।

ওটার সঙ্গে রইল সে, পরিচিত হওয়ার জন্যে। গলা চাপড়ে আদর করল, ডলে ডলে চকচকে করে দিতে লাগল চামড়া। পিরেটো আর কিশোর এই সময় গেল

শারিকে আনার জন্যে। মেকসিকান লোকটার সঙ্গে একা থাকার সুযোগ পেয়ে খুশই হলো গোয়েন্দাপ্রধান। সাবধানী পিরেটোর কাছ থেকে কোনভাবে যদি কিছু তথ্য জোগাড় করতে পারে।

‘লেকের ধারে ওই যে নৌকায় উঠেছিলাম আমি,’ জিজ্ঞেস করল কিশোর। ‘ওটা কি সব সময়ই ওখানে থাকে?’

‘নৌকা তাহলে আর কোথায় রাখবে? রান্নাঘরে?’

‘ওটা কার?’

‘এই র্যাপ্পের।’

‘কেউ কি ব্যবহার করে?’

‘মাঝেসাবে।’

‘কি কাজে?’

‘মাছ ধরার কাজে।’

ভীষণ চালাক লোকটা। অভাবে ওর কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করতে পারবে বলে মনে হলো না কিশোরের। তবে একটা কথা জানতে হবে যে করেই হোক।

লেকের অপর পাড়ে সোনালি চুলওয়ালা যে আমেরিকান মহিলাকে দেখেছে, নিশ্চয় সে-ই ফোন করেছিল ওকে, সন্দেহ নেই। হতে পারে ওই মহিলাই পচা দাঁড়টা রেখেছিল। কিন্তু তাহলে ওই দাঁড় দিয়ে নৌকাটাকে এপাড়ে আনল কি করে? আর সে নিজেই বা ফিরে গেল কিভাবে?

‘ওপাড়ের গাঁয়ে যেতে চাইল,’ চেষ্টা চালিয়ে গেল কিশোর, ‘কিভাবে যাবেন?’

‘হেঁটে।’

‘কিন্তু লেক তো অনেক গভীর। হাঁটা যায়?’

‘ওদিকটায় অত গভীর নয়।’ নদীর উজানের দিকে দেখাল পিরেটো। ‘তাছাড়া বড় বড় পাথর আছে, ওগুলোর ওপর দিয়েই হাঁটা যায়।’

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। জবাব এটাই হবে। ওই পাথরের ওপর দিয়েই হেঁটে পার হয়ে গেছে আমেরিকান মহিলাটা। আর রাতের বেলা বারান্দায় ওর সঙ্গেই হয়তো কথা বলেছিল পিরেটো। তারমানে ওকে চেনে সে।

‘গাঁয়ে আপনার কোন বস্তু আছে নাকি?’

‘একজনকে চিনি। বার আর ক্যানটিনার মালিক, আমার খালাত ভাই।’

‘কোন আমেরিকানকে চেনেন না? সোনালি চুলওয়ালা একজন মহিলা?’

শারি যে মাঠে থাকে ওটার গেটের কাছে পৌছে গেছে ওরা। ফিরে তাকাল পিরেটো। ‘বোকামি করছে ও। সে কথা বলেছিও ওকে। ভীষণ ভয় পেয়েছে। ভয় পেলে লোকে উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে। তোমার যে কোন ক্ষতি হয়নি, তাতে আমি খুশি। কিন্তু...’

কিশোরের কাঁধে হাত রাখল পিরেটো। ‘পর্বতে গিয়ে সাবধানে থাকবে।’ সতর্ক করে দিল সে। ‘ভয়ানক বিপদের জায়গা।’

কিশোরকে দেখে উত্তেজিত হয়ে ছুটে আসছে শারি।

দরজা খুলে দেয়া হলো। কিশোরের গায়ে নাক ঘষতে লাগল জানোয়ারটা।

ওটাৰ কানেৰ পেছনটা চুলকে দিল কিশোৱ। ও-যাই কৰুক, চুপ কৰে থাকে বারোটা। কিন্তু আৱ কাউকে কাছেই যেঁতে দেয় না। পিৱেটোকেও না। দৃঢ় দাঁড়িয়ে আছে সে। কিশোৱকে বলল, ‘জিন আৱ লাগাম ছাড়া চড়তে পাৱবে; কিন্তু পৱানোটাই হলো মুশকিল। যতই পছন্দ কৰুক তোমাকে, যেই জিন পৱাবে মাটিতে গড়তে শুল্ক কৰবে, পিঠ থেকে ওটা খুলে না ফেলে আৱ থামবে না।’

চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোৱেৰ। ‘তাই নাকি?’

‘জীপটা রসদপত্ৰ দিয়ে প্ৰায় ভৱে ফেলেছেন ডজ। বীন আৱ চালেৰ বস্তু চিনি, কফি ও প্ৰয়োজনীয় আৱও খাবাৰ নিয়েছেন। ঘোড়াৰ জন্যে নিয়েছে জই স্বীপিং ব্যাগ আৱ রাইফেল নিয়েছেন। মালপত্ৰেৰ ফাঁকে জায়গা নেই বললেই চলে ওখানেই কোনমতে গাদাগাদি কৰে বসেছে মুসা আৱ রবিন। কিশোৱ বসে ডজেৰ পাশে। হাতে লম্বা একটা দড়ি, এক মাথা বাঁধা রয়েছে গাধাৰ গলায় জীপেৰ পেছন পেছন আসছে বারোটা।

গেট থেকে বেৱিয়ে এসে ফিৰে তাকাল কিশোৱ। দাঁড়িয়ে রয়েছে পিৱেটো কিশোৱ তাকাতে হাত তুলল। কি বোৰাতে চাইল? সাৰধান কৱল? না গুডবাই?

ঘুৱে ঘুৱে উঠে গেছে পাহাড়ী পথ। চাৱ-পাঁচ মাইলেৰ বেশি গতি বাড়াচ্ছে ডজ। যাতে শাৱিৱ আসতে অসুবিধে না হৱ।

বালি আৱ পাথৰ বিছানো রয়েছে পথ জুড়ে। এক ঘণ্টা চলাৰ পৰ সকু হচ্ছে এল পথ। চুকে গেল পাইন বনেৰ ভেতৱে।

আৱও এক ঘণ্টা পৰ জীপ থামালেন ডজ, ইঞ্জিন ঠাণ্ডা কৱার জন্যে। পাৰ্হ পড়াৰ শব্দ কানে আসছে। দড়ি ছোটনোৰ জন্যে টানাটানি শুল্ক কৱল শাৱি।

‘মনে হয় পানি খেতে চাইছে,’ কিশোৱ বলল। ‘আমি যাচ্ছি ওৱ সঙ্গে। নইতে পালাতে পাৱে।’

বারোটাই ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল ছোট একটা পাৰ্বত্য নালার কাছে টলটলে পৱিষ্ঠাৰ পানি। দেখাৰ পৰ কিশোৱেৰও খেতে ইচ্ছে কৱল। পিপায় অবশ্য আগেই পেয়েছে। পিৱেটোৰ কাছে শনেছে, সিয়েৱা মাদ্দেৱ ঝৰ্না থেকে পাৰ্হ খেতে মানা নেই, তবে বন্ধ জলাশয় থেকে খাওয়া একদমই উচিত নয়। হাঁটু গেতে বসে আঁজলা ভৱে পানি তুলে খেতে শুল্ক কৱল সে। তাৱ পাশেই মুখ নামিয়ে খাচ্ছে শাৱি।

পানি খাওয়া শেষ কৱে পাতা চিবুতে লাগল বারো। ওৱ জন্যে সঙ্গে কৱে কি আনা হয়নি। ঘোড়াৰ মত বেছে খায় না বারো, কাজেই ওগুলোৰ জন্যে তেম ভাবনা নেই। ছাগলেৰ মত যা খুশি খেতে পাৱে। পিৱেটো একথা বলে কিশোৱকে। ঠিকই বলেছে। এখন তাৱ প্ৰমাণ পাওয়া গেল।

মিনিট কয়েক ঘাস আৱ লতাপাতা খেল শাৱি। এই সময় শোনা গেল ডজে ডাক। অধৈৰ্য হয়ে উঠেছেন। বারোটাকে নিয়ে যাওয়াৰ জন্যে টানতে লাগ কিশোৱ। চেঁচিয়ে বলল, ‘আয়, আয়, দেৱি হয়ে গেল!’ কানেই তুলল না ওটা পেট না ভৱা পৰ্যন্ত খেয়েই চলল।

রেগে গেলেন ডজ, কিন্তু কিছু বলাৰও নেই। বারোটা আসতে না চাইতে কিশোৱ কি কৱবে? সমস্ত রাগ যেন গিয়ে পড়ল ইঞ্জিনেৰ ওপৰ। স্টার্ট দিয়ে

অযথাই এক্সিলারেটর বাড়িয়ে গৌ গৌ করালেন কয়েক সেকেণ্ট। খাবার বানিয়ে প্যাকেট করে দিয়েছিল পিরেটো। সেগুলো দিয়ে লাঞ্চ করেছে সবাই। রবিন, মুসা আর উজ খেয়েছেন। কিশোর কেবল বাকি। তার স্যাগুইচগুলো নিয়ে বড় বড় কামড় দিয়ে খেতে শুরু করল। জীপ ততক্ষণে চলতে আরম্ভ করেছে। একহাতে গাধার দড়ি ধরে রেখে আরেক হাতে থাক্কে কিশোর।

আরও ঘন্টা তিনেক চলার পর বালিতে ঢাকা সরু পথও অদৃশ্য হয়ে গেল।

‘এখানে জীপ রেখে যেতে হবে আমাদের,’ উজ বললেন।

মালপত্র নামাতে লাগল ওরা। বাক্স থেকে ঘোড়াটাকে নামিয়ে আনল মুসা। হস্ববৰ্ত্ত সহ জীপটাকে পাইন বনের ভেতরে নিয়ে গেলেন উজ। ডালপাতা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো দুটো গাড়িকেই। ভারি ভারি বোঝাগুলো তোলা হলো ঘোড়ার পিঠে। শারির কাঁধে স্লীপিং ব্যাগগুলো তুলে দিয়ে বেঁধে ফেলল কিশোর।

‘তুমি আগে আগে যাও,’ কিশোরকে বললেন উজ। ‘বারোটাকে চিল দিয়ে দাও। ও যেদিকে যায় সেদিকেই যাবে। ওটাই পথ দেখাক।’

চট করে বক্সদের দিকে তাকাল একবার কিশোর।

আবার শুরু হলো চলা। শারির পিঠে বসল কিশোর। যার যার ব্যাকপ্যাক পিঠে নিয়ে হেঁটে চলল রবিন আর মুসা। সবার পেছনে ঘোড়ায় চেপে আসছেন উজ।

কয়েক মিনিট চলার পরেই বুরো গেল কিশোর, গাধার পিঠে চেপে যাওয়াটা কতটা কষ্টকর। একটা মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হতে পারছে না।

দেখতে দেখতে গাছপালার মাথার ওপরে উঠে এল দলটা। ঢালের গায়ে এখন আর গাছ নেই, বন নিচে পড়ছে ক্রমশ। খাড়া পাথুরে ঢালে হাঁটতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে রবিন আর মুসার। বার বার পা পিছলে থাক্কে আলগা পাথুরে।

শারির কিছুই হচ্ছে না। পিরেটো বলেছে, পাহাড়ি ছাগলের মতই পাহাড় বাইতে পারে বারোরা। তা তো হলো, কিন্তু কিশোর তো আর ছাগল নয়, বারোও নয়, কাজেই পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া এড়ানোর জন্যে শারির গলা জড়িয়ে ধরে রাখতে হলো ওকে। ছেড়ে দিলে গড়িয়ে পড়ে যাবে পিঠ থেকে, এবং তারমানে পাহাড় থেকেও গড়িয়ে পড়া।

কষ্ট হচ্ছে কিশোরের, তবে উজের চেয়ে কম। বারোর মত পাহাড় বাওয়ায় দক্ষ নয় ঘোড়াটা। ঠিকমত ঠিক জায়গায় পা ফেলতে পারছে না। মাঝে মাঝেই এগোতে না পেরে থেমে থাক্কে। পিঠ থেকে নেমে তখন এগোনোর জন্যে ওটাকে ঠেলতে হচ্ছে উজকে। কখনও বা লাগাম ধরে টেনে কোন উঁচু পাথর পার করিয়ে আনছেন। ফলে সময় নষ্ট হচ্ছে। থামিক পরেই দেখা গেল মুসা আর রবিনের প্রায় আধ মাইল পেছনে পড়ে গেলেন তিনি।

সবার আগে রয়েছে কিশোর। আর সবাই অনেক পেছনে। ওদেরকে এগিয়ে আসার সময় দেয়ার জন্যে শারিকে থামতে বলল সে, ‘হয়া! হয়া!’

শনতেই পেল না যেন বারোটা।

তখন ওটার কানের কাছে চিংকার করে বলল কিশোর, ‘হয়া! হয়া!’

থামার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই বারোটার। অনেক দিন পর পাহাড়ে ঢাকার সুযোগ

পেয়েছে বোধহয়, এগিয়ে চলেছে মহা আনন্দে। কারও জন্যে অপেক্ষা করার প্রয়োজনই বোধ করছে না। লাগাম টেনে বোঝাতে চাইল কিশোর, ওর হকুম মেনে চলা উচিত। পাতাই দিল না বারো।

তারপর কিশোর যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, এই সময় হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়াল।

এতই আচমকা, আরেকটু হলেই পিঠ থেকে পড়ে যেত কিশোর। যেন ব্রেক কষে দাঁড়িয়েছে জানোয়ারটা। একটা সমতল জায়গার কিনারে এসে পৌছেছে। পাথরের ছড়াছড়ি, তার ফাঁকে ফাঁকে গঁজিয়ে উঠেছে ঘাস। ঠিক সামনেই মাথা তুলেছে একগুচ্ছ ক্যাকটাস।

কিশোর আন্দাজ করল, আবার খেতে চায় শারি। শরীরটা ঢিল করে দিয়ে লাফিয়ে নামল পিঠ থেকে। তার নিজের বিশ্রামের জন্যেও জায়গাটা চমৎকার। ক্যাকটাসের পাশে একটা চ্যাপ্টা মসৃণ পাথর দেখতে পেল। ওটার দিকে এগোতে গেল সে।

সঙ্গে সঙ্গে গলা বাড়িয়ে দিল শারি, পথ আটকাল কিশোরের। পাশ কাটিয়ে সে যখন ঝুঁগোনোর চেষ্টা করল, তার শার্টের ঢোলা জায়গায় কামড়ে ধরল ওটা।

রেগেই গেল কিশোর। ‘এই, কি হয়েছে? কি করতে চাস? ঘাস খেতে কি মানা করেছি নাকি তোকে!’ টেনে শার্টটা ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু ধরে রাখল শারি।

হাল ছেড়ে দিল কিশোর। বারোর সঙ্গে পারবে না। ওটা যখন কিছু করবে বলে গো ধরে, কারও সাধ্য নেই সেকাজ থেকে বিরত করে। আপাতত যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকতে চাইছে। কিশোরকেও থাকতে বলছে। কাজেই নড়ানো সম্ভব না।

যখন ওটার ঘাড়ে চাপড় দিয়ে আদর করল কিশোর, তখন ছাড়ল শার্ট। কিন্তু পথ ছাড়ল না। যেতে দিতে চায় না কিশোরকে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ক্যাকটাসের জটলাটার দিকে।

এই সময় বারোটার কানের দিকে চোখ পড়ল কিশোরের।

ঘাড়ের সঙ্গে একেবারে লেপটে রয়েছে।

ঘাড়ের বড় বড় রোমগুলো লেপটে নেই, সাধারণত যেভাবে থাকে। দাঁড়িয়ে গেছে। ভয়ে কঁপছে থিরথির করে।

## নয়

হ্রি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। চোখ ক্যাকটাসের দিকে।

ইঁচড়ে-পাচড়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল রবিন আর মুসা।

‘কি হয়েছে?’ মুসা জিজ্ঞেস করল।

‘বুঝতে পারছি না। কিছু দেখে ভয় পেয়েছে শারি।’

পা বাড়াতে গেল রবিন। ধরে ফেলল তাকে মুসা। বারোর ঘাড়ের রোম যে দাঁড়িয়ে গেছে সেটা সে-ও লক্ষ্য করেছে। ‘দেখি, কি করে ও।’

কিছুই করল না শারি। তাকিয়েই রয়েছে ক্যাকটাসের দিকে। পেছনে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল ডজের ঘোড়া। ‘কি হয়েছে?’

শব্দটা কানে এল এই সময়। মৃদু একটা খড়খড়। ওদের কানে শব্দ পৌছার আগেই জেনে ফেলেছে বারোটা, সামনে মারাত্মক বিপদ।

শব্দটা আসছে ক্যাকটাসের পেছনের একটা পাথরের ওপাশ থেকে। কিসে করছে? আবার হলো শব্দ, আরও জোরাল। এবার আর খড়খড় নয়, অনেকটা মৌমাছির গুঞ্জনের মত।

ঘোড়টার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন ডজ। জোরে শ্বাস টানলেন একবার। হাত বাড়ালেন রাইফেলের দিকে। ‘র্যাটল স্লেক! ক্যাকটাসের পেছনেই! ভয় দেখিয়ে খোলা জায়গায় বের করে আনতে হবে, যাতে গুলি করতে পারি।’

পাথর কুড়িয়ে নিল তিন গোয়েন্দা। ছেঁড়ার জন্যে তৈরি হলো। ক্যাকটাসের দিকে রাইফেল তুলে ধরলেন ডজ।

‘মার!’ বলে উঠল মুসা।

একই সঙ্গে পাথর ছুড়ল তিনজনে। থেমে গেল গুঞ্জন। তবে নীরব হলো না।

জোরাল খটাখট আওয়াজ করে ক্যাকটাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সাপটা। চার ফুট লম্বা। চ্যাপ্টা মাথাটা ওপরে তোলা। সাংঘাতিক দ্রুত গতি। শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে পলক ফেলতে না ফেলতে ছুটে আসছে।

লাফিয়ে পেছনে সরে এল তিন গোয়েন্দা।

গুলি করলেন ডজ।

মনে হলো, লাগেনি। লাফিয়ে একপাশে সরে গিয়ে আবার আসতে লাগল।

তাকিয়ে রয়েছে যেন রবিন। সোজা তারই দিকে আসছে সাপটা। গোল গোল চোখ, লম্বা জিভটা দ্রুত বেরোছে আর চুকছে, লেজটা তুলে ধরা। লেজের ডগায় অনেকগুলো হাড় বোতামের মত একটার ওপর আরেকটা আলগা ভাবে বসানো, বাড়ি লেগে লেগে ওই অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। সরে যেতে চাইছে, কিন্তু পা উঠছে না। সম্মোহিত করে ফেলেছে যেন তাকে সাপটা।

রাইফেলের বোল্ট টানার শব্দ হলো। রাইফেল তুললেন ডজ।

কিন্তু ট্রিগার টেপার সুযোগ পেলেন না। নলের সামনে রয়েছে শারি, ওটার গায়ে গুলি লাগতে পারে।

চ্যাপ্টা হয়ে একেবারে ঘাড়ের সঙ্গে মিশে গেছে যেন বারোর কান। ঘূরছে। সাপটা ষষ্ঠী এগিয়ে আসছে, চক্ষু হয়ে উঠছে ওটা। কিন্তু রবিনের মতই যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে।

ফনা আরও উঁচু হল সাপটার। ছোবল মারার জন্যে প্রস্তুত।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘূরে গেল হঠাত শারি। পেছনের দুই পা তুলে লাখি চালাল।

সাপের শরীরের মাঝামাঝি জায়গায় আঘাত হানল এক পায়ের লাখি। উড়ে গিয়ে বিশ ফুট নিচে পাথরের ওপর পড়ল ওটা। একটা সেকেও নিখর হয়ে পড়ে বইল, যেন মরে গেছে। রবিনও তাই ভেবেছিল। কিন্তু ওদেরকে অবাক করে দিয়ে নাড়ি উঠল ওটা। পিছলে গিয়ে চুকে পড়ল পাথরের ফাকে।

স্যাডল হোল্টারে রাইফেলটা চুকিয়ে রাখলেন ডজ।

কেউ কথা বলল না। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে। তারপর, নীরবে আবার পা বাড়াল।

সামনের দিকে এগোল না আর শারি। উপরেও উঠল না। সমতল জায়গাটাকে ঘুরে এগোল। আবার জঙ্গল চোখে পড়ল কিশোরের। তাড়াহড়ো করে সেদিকে এগিয়ে চলল বারো-টা। মূল পথ থেকে সরে যাচ্ছে, কিন্তু থামানোর চেষ্টা করল না কিশোর। যেদিকে খুশি যাক। ডজ বলেছেন ওটাকে ওটার ইচ্ছের ওপরই হেঢ়ে দিতে।

বনে চুকে কিছুদূর এগিয়ে থেমে গেল শারি। ওটার গলা চুলকে দিল কিশোর।

‘আর কিছু বলব না তোকে,’ বলল সে। ‘তোর ইচ্ছে মত চলবি। বুঝে গেছি, এখানে আমার চেয়ে তোর বুদ্ধি অনেক বেশি।’

মুসা আর রবিন এল। ওদের পেছনে এলেন ডজ। চারপাশে তাকিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, রাতে ক্যাম্প ফেলার জন্যে চমৎকার জায়গা বেছেছে বারো। প্রচুর লাকড়ি আছে, সবুজ ঘাস আছে। কাছেই একটা সুন্দর বর্ণা, কিশোরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সেখানে।

স্বর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা কমে গেল। শার্টের ওপরে সোয়েটার পরে নিল তিন গোয়েন্দা। লাকড়ি জোগাড় করে চমৎকার একটা আগুনের কুণ্ড বানিয়ে ফেলল মুসা। তারপর ঘোড়া থেকে মালপত্র নামাতে সাহায্য করল ডজকে।

শারির পিঠ থেকেও বোৰা নামিয়ে ফেলল কিশোর। জিন খুলে নিল। ঘাস-পাতা খাওয়াল, বর্ণার ধারে নিয়ে গেল পানি খাওয়াতে। তারপর সে আর রবিন মিলে রান্না করতে বসল। বড় একটা পাত্রে চাল আর বীন নিয়ে সিদ্ধ করে নিল।

এই জিনিস খাওয়া যায়! বিরস দৃষ্টিতে তাকাল ওগুলোর দিকে কিশোর। কিন্তু কি আর করা। বেঁচে থাকতে হলে খেতেই হবে। এই খাবারে দু'জন লোক কিছুই মনে করল না। একজন ডজ, তাঁর অভ্যাস আছে, আরেকজন মুসা, যার কোন খাবারেই অকুচি নেই।

খেতে খেতে ভাবছে কিশোর—আর কোন সন্দেহ নেই, সাংঘাতিক রহস্যময় একটা কেস পেয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। সমাধান করতে ভালই লাগবে। রহস্যটার কথা ভাবতে ভাবতে কোনু দিক দিয়ে যে চাল আর বীন সেদ্ধ গিলে শেষ করে ফেলল সে, খেয়ালই রইল না।

খোঞ্জা শেষ করে জুতো খুলে ফেলল রবিন। পায়ের পাতায় হাত বোলাতে লাগল। ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে ব্যথা হয়ে গেছে। ফোসকাও পড়েছে।

‘আর কদূর যেতে হবে?’ ডজকে জিজ্ঞেস করল সে।

‘তীক্ষ্ণ হলো ডজের দৃষ্টি। ‘কেন, তোমার ভাল্লাগছে না?’

রবিনের দৃষ্টি আরও বেশি তীক্ষ্ণ হলো। ‘এভাবে এগোনোর কথা কিন্তু ছিল না। ছিল, শারির খুরের ব্যবস্থা করার কথা। ওকে পাহাড়ে ছেড়ে দিয়ে খাওয়ার কথা। এমন কোথাও যেখানে ওর খুর ঠিক থাকবে। এখানে প্রচুর পাথর আর পাহাড় আছে। জায়গাটা ভালও লাগছে মনে হয় ওর। তাহলে আর দেরি কেন?’

ক্লাচ কঢ়ে কথাগুলো বলল সে। ডজের মিথ্যে বলা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে

গেছে। লোকটাকে বুঝিয়ে দিতে চায় ওরা কচি খোকা নয় যে এভাবে মাথায় হাত বুলিয়ে আর অন্গরাশ মিথ্যে বলে বলে ধোকা দেবেন। বোঝাতে চায়, শারির খুর নিয়ে যে বিনুমাত্র মাথাব্যথা নেই ডজের, এটা বুঝে গেছে ওরা।

‘হ্যাঁ,’ রবিনের কথার প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা, ‘এটা শারির জন্যে চমৎকার জায়গা। পাহাড়ের ঢালে কিছু কিছু জায়গা তো দেখলাম লোহা ঘষার উপর চেয়েও ধার। এখানেই ছেড়ে দিছেন না কেন?’

সাথে সাথে জবাব দিলেন না ডজ। কয়েকটা ডাল ছুঁড়ে দিলেন আগুনে। ‘বারোটা নিজেই বুঝিয়ে দেবে কোথায় ওকে ছাড়তে হবে। যেখান থেকে এসেছে সেখানেই চলেছে। সেখানে পৌছলেই থামবে।’

‘হোম, সুইট হোম,’ আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। ‘বাড়ির জন্যে অস্ত্রিং হয়ে উঠেছে ও, একথা কেন মনে হচ্ছে আপনার?’

‘বলা কঠিন,’ অধৈর্য কঠে জবাব দিলেন ডজ। ‘কখনও কখনও বুনো বারোরা বাড়ির কাছাকাছিই থাকতে চায় সব সময়। কেন, কে জানে!'

এখনও যে মিথ্যে বলছেন ডজ, বুঝতে পারছে কিশোর। রবিন আর মুসাও পারছে।

‘তাহলে বাড়ি থেকে অতদূরে র্যাখে গিয়ে উঠল কেন?’ ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল মুসা।

‘বুনো বারোরা অনেক সময়ই দলচুট হয়ে দূরে চলে যায়।’ তারপর আবার একই কথা বললেন ডজ, ‘কেন, কে জানে!’

এটাও মিথ্যে কথা, ভাবছে কিশোর। দলচুট হয়ে নিছক খেয়ালের বশে র্যাখে গিয়ে হাজির হয়েছে বারো, কিছুতেই বিশ্বাস করে না সে। কেউ ওকে নিয়ে গিয়েছিল ওখানে। এমন কেউ, যাকে বিশ্বাস করে, পছন্দ করে শারি। সেই লোকের সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিয়েছিল। হয়তো ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিল ওই লোক। এবং যার কঠ কিশোরের মত।

ঘাস খেতে খেতে আগুনের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে বারো-টা। ওটার দিকে তাকিয়ে অস্ত্রিং বাড়ছে ডজের। শেষে আর থাকতে না পেরে কিশোরকে বললেন, ‘অনেক খেয়েছে। এবার বেঁধে ফেল। রাতে যেন ছুটতে না পারে।’ জোর করে হাসি ফোটালেন চেহারায়। ‘নইলে আবার কি খেয়াল হয় কে জানে! র্যাখে ফিরে চলে যেতে পারে। বারোর কথা কিছুই বলা যায় না।’

উঠে দাঁড়াল কিশোর। শারির পিঠে ঢাকার সময় বুঝতে পারেনি, কতটা ধক্ক গেছে, এখন পারছে। এত শক্ত হয়ে গেছে পায়ের পেশী, ঠিকমত দাঁড়াতেই পারছে না। পায়ের পাতায় যেন কাঁটা বিঁধেছে, এরকম ভঙ্গিতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জানোয়ারটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। আদর করে চাপড় দিল পিঠে। বলল, ‘দূরে যাসনে। আমার কাছাকাছি থাকবি।’

‘ওসব বলে লাভ হবে না,’ ডজ সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। ‘গাধা গাধাই। ওটাকে বেঁধে ফেল, গাছের সঙ্গে।’

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। ডজের মুখোমুখি। মাথা নাড়ল। ‘না। রাতে পিপাসা লাগতে পারে ওর। পানি খেতে যেতে পারবে না বেঁধে রাখলে।’

‘পানি আর কত খাবে? যা খাওয়ার খেয়েছে।’

রাখাটাকের সময় শোষ হয়ে এসেছে। কাজেই নমনীয় হলো না কিশোর। ‘বেঁধে রাখতে চাইলে আপনি যান। দেখুন ছুঁতে দেয় কিনা।’

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে তাকিয়ে রইল দু'জনে। চলার সময় বসু হয়ে যায় বারোটা, কিন্তু এখন বসু হলো কিশোর। সেটাই বুঝিয়ে দিতে চাইল। সে যা বলবে তাই হবে।

‘বেশ,’ অবশ্যে নরম হলেন ডজ। হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে চুকলেন স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে। ‘আমার বিশ্বাস, যতক্ষণ তুমি আছ, কাছাকাছিই থাকবে বারোটা।’

‘কেন?’ কর্কশ কষ্টে জিজ্ঞেস করল কিশোর, ‘আপনার এ বিশ্বাস হলো কেন? আমার প্রতি কেন এত আকর্ষণ গাধাটার?’

‘কুইয়েন সাবে! মেকসিকানদের ভাষায়ই বললাম।’ কাত হয়ে শুলেন ডজ। চোখ মুদল। মানে করে দিল কথাটার, ‘কে জানে!’

অগ্নিকুণ্ডের কাছে ফিরে চলল কিশোর। যাওয়ার সময় তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল রবিন।

স্লীপিং ব্যাগে চুকল কিশোর।

ঘুমিয়ে পড়ল চারজনে।

অঙ্কার থাকতেই ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। আঙুন নিতে গেছে। চোখে ঘুম। প্রথমে বুবতে পারল না কি কারণে ঘুমটা ভাঙল। তারপর শুনতে পেল শব্দ।

গাধার ডাক।

শারি!

একভাবে পড়ে থেকে শক্ত হয়ে গেছে শরীর। কোনমতে বেরিয়ে এল স্লীপিং ব্যাগের ভেতর থেকে। গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটল ঝর্নার দিকে।

বনের ভেতর থেকে বেরিয়েই চোখে পড়ল টর্চের আলো। ওপরে, নিচে, চক্রাকারে নড়ছে আলোক রশ্মি। সেই আলোয় প্রথমে দেখল শুধু বারো-টাকে। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠছে বার বার, সামনের পা দিয়ে লাথি মারার চেষ্টা করছে। প্রচণ্ড খেপে গেছে।

ক্ষণিকের জন্যে স্থির হল আলো, চোখে পড়ল মহিলাকে। একহাতে টর্চ, আরেক হাতে বারোর দড়ি, টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। দড়িটা ফাঁসের মত করে পরিয়ে দিয়েছে শারির গলায়। কিশোরের ভয় হলো, দম না আটকে যায় টানাটানিতে।

আবার চিংকার করে উঠল শারি। গলায় দড়ি আটকানো থাকায় শব্দটা কেমন ভোংতা হয়ে গেল। আবার লাফিয়ে উঠল ওটা। সামনের পা দিয়ে লাথি মারার চেষ্টা করল অচেনা আগস্তুককে। একই সঙ্গে টেনে ছোটানোর চেষ্টা করছে গলায় লাগানো দড়ি।

সাপটার কি গতি করেছে, দেখেছে কিশোর। আশঙ্কা হলো মহিলার জন্যে। ওই লাথি যদি মাথায় লাগে, খুলি ভেঙে ঘিলু বেরিয়ে যাবে।

‘ছেড়ে দিন!’ চিংকার করে বলল সুস।

ছুটতে শুরু করল কিশোর। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'শারি, চুপ কর, শারি! শান্ত হ!'

দড়ি ছেড়ে দিয়েছে মহিলা।

টান বন্ধ হয়ে যেতেই আবার চারপায়ের ওপর স্থির হলো শারি। ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। ওটার নাকে হাত বুলিয়ে দিল সে। গলার দড়িটা দেখল। আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে হাঁচকা টানে ঢিল করে দিল ফাঁসের বন্ধনী। আবার স্বাভাবিক ভাবে দম নিতে পারল শারি। মহিলার দিকে তাকাল কিশোর।

নিতে গেছে টর্চ।

অন্ধকার হয়ে গেছে আবীর। ছুটত্ত পায়ের শব্দ কানে এল কিশোরের। পালিয়ে যাচ্ছে মহিলা। ঠিক এই সময় কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল রবিন। 'শারি অমন চেঁচামেচি করল কেন?'

'ওকে চুরি করতে চেয়েছিল,' জানাল কিশোর। 'এক মহিলা...'

'খাইছে!' মুসা বলে উঠল। 'আবার সেই সোনালি চুল! তোমাকে যে খুন করতে চেয়েছিল! সে এসেছে বারো চুরি করতে?'

'না।' মাথা নাড়ল কিশোর। টর্চের আলোয় আবছাভাবে দেখেছি তাকে। মুহূর্তের জন্যে। তবে চিনতে অসুবিধে হয়নি। সেই মেকসিকান মহিলা, বাসে যাকে দেখেছি। লাল শাল। কালো বেণি।'

## দশ

পরের দুটো দিন প্রথম দিনের মতই একটানা পথ চলল ওরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মাইলের পর মাইল, চলে চলে সিয়েরা মাদ্রের আরও গভীরে ঢুকে যেতে লাগল। এই পর্বতমালার যেন আর শেষ নেই, চলেছে তো চলেছেই। অনেক কষ্টে ঢাল বেয়ে যখন ওঠে, ভাবে ওপারে আর কিছু নেই। কিন্তু চূড়ায় উঠে দেখে ঠিকই মাথা তুলে রেখেছে আরেকটা পাহাড়।

মাঝে উপত্যকা। কোনটা সরু, কোনটা চওড়া। একখানে কয়েক মাইল ধরে চলল পাইনের বন। তারপর, সেই বন পেরিয়ে, আরেকটা ঢাল বেয়ে উঠে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে এল একসময়, ওপরে রুক্ষ পাথুরে ঢাল প্রায় খাড়া হয়ে উঠে গেছে।

'ভাগিয়ে এখন গরমকাল,' মুসা বলল। পাথর মাড়িয়ে ওঠার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতে হচ্ছে অনেকখানি, পর্বতের খাড়াইয়ের জন্যে। 'শীতকাল হলে তুষারেই ডুবে যেতাম।'

'তাতে মন্দ হত না,' রবিন বলল। দরদর করে ঘামছে পরিশ্রমে। কপাল থেকে একফোটা গড়িয়ে নামল চোখের পাতায়। 'এই গরম তো আর লাগত না।'

ওদের দিন শুরু হয় এখানে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। সকালে নাস্তা সারে বীন আর ঢাল সেন্ধ দিয়ে, দুপুরে লাঞ্ছে ঠাণ্ডা বীন আর ঢাল সেন্ধ-সকালে খাওয়ার পর যা বেঁচে যায়, রাতে আবার একই খাবার, গরম গরম, নতুন রান্না করে। মহা

বিরক্তিকর। ঘেন্না ধরে গেছে কিশোরের। রবিনের তো এখন দেখলেই বমি আসে। মুসারও আর ভাল লাগছে না।

ফিরে যাওয়ার কথা বলল রবিন আর মুসা। কিন্তু গৌ ধরে আছে কিশোর। এই রহস্যের শেষ না দেখে সে ছাড়বে না। দেখাই যাক না, কোথায় ওদেরকে নিয়ে যায় শারি। তবে, আর দু'চারদিন ওই ভয়াবহ খাবার খেতে হলে তারও মনোবল ভেঙে যাবে।

দিনে তিন-চার বার করে খাওয়ার জন্যে থামে শারি। অন্যদেরকেও থামতে হয় বাধ্য হয়ে। এই খামাটাকে স্বাগতই জানায় তিন গোয়েন্দা। বিশ্বামের সুযোগ পাওয়া যায়। উজ তো এক মুহূর্তের জন্যেও থামতে নারাজ। তবে একটা সুবিধে হয় তাঁর এতে। ঘোড়াটাকে নিয়ে অনেক পেছনে পড়ে যান তো, এগিয়ে আসতে পারেন। প্রচুর জই খাওয়ানো হয় ঘোড়াটাকে, তার পরেও প্রতিদিনই একটু একটু করে দুর্বল হয়ে পড়ছে ওটা। মাঝে মাঝে মাইল থানেক পেছনে পড়ে যায়। রবিন আর মুসার মত পা টেনে টেনে চলে তখন।

এ রকমই একটা বিশ্বামের সময় হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে আছে তিন গোয়েন্দা, ঘাস চিবুচ্ছে শারি। রবিন বলল, 'ওই মহিলাগুলো কেন এর মধ্যে ঢুকেছে, বুঝতে পারছি না। প্রথমে কিশোরকে ঢুবিয়ে মারার চেষ্টা চালাল সোনালি ছুলওয়ালা এক মহিলা, তারপর কালো বেনি এসে ঢুবি করার চেষ্টা করল বারো-টাকে।'

'হয়তো মেকসিকান মহিলার বারোর পা ভেঙে গেছে,' আন্দাজ করল মুসা। 'কাজেই বোৰা টানার জন্যে আরেকটা দরকার হতেই পারে।'

রবিন এই যুক্তি মানতে পারল না। 'বারোর চরিত্র ভাল করেই জানা আছে মেকসিকানদের। জোর করে যে পিঠে সওয়ার হওয়া যায় না, জানে।'

'ভাবছি,' কিশোর বলল। 'বারো-টাকে নিজের জন্যেই চেয়েছে কিনা মহিলা। কিংবা অন্য কোন কারণে ওটাকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছে।'

'তাই?' মুসা আর কোন যুক্তি দেখাতে না পেরে চুপ হয়ে গেল।

কিশোরেরও আর কিছু বলার নেই।

আবার শুরু হলো পথচলা।

প্রতি সন্ধ্যায়ই একটা করে জায়গা খুঁজে বের করে শারি, যেখানে আগুন জ্বালানোর জন্যে প্রচুর লাকড়ি আছে, আর খাওয়ার পানির ব্যবস্থা আছে। ওখানেই রাতের জন্যে ক্যাম্প ফেলে ওরা। এর মাঝে ওই মহিলাকে ছাড়া আর কোন মানুষ চোখে পড়েনি ওদের। মাঝে সাবে একআধটা কুঁড়ে চোখে পড়ে, মাটির দেয়াল আর পাতার ছাউনি, অ্যাডাব বলে ওগুলোকে। সবই দূরে দূরে। ওগুলোতে কেউ থেকে থাকলেও গোয়েন্দাদের চোখে পড়ল না।

দ্বিতীয় দিনে কিশোরের পায়ের পেশী শক্ত হয়ে থাকা সেরে গেছে। আড়ষ্টতা দূর হয়ে একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে। হাটতে এখন অনেক সহজ লাগে। কোমরের বেল্ট ঢিলে হয়ে গেছে, রওনা দেয়ার সময় যে ছিদ্রটায় চুক্ত বাকলেসের কাঁটা, এখন তার আগের ছিদ্রটায় ঢেকে।

'বাপরে বাপ!' বঙ্গুদেরকে বলল সে, 'বারোর পিঠে চাপা-ও কম পরিশ্রম নয়!'

সেদিন, একটা শৈলশিরার কাছ দিয়ে চলার সময় সামনে সাদা ধোঁয়া দেখতে পেল ওরা। থেমে গেল। তাকিয়ে রইল সেদিকে।

‘বিড়বিড় করল রবিন, ‘দাবানল না তো!’

‘হলেও অনেক দূরে,’ মুসা বলল। ‘আমাদের কাছে আসতে পারবে না।’

‘যদি বাতাস এদিকে না বয়।’

এ ব্যাপারে কিশোর কোন মন্তব্য করল না। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে ধোঁয়ার দিকে।

সেদিন এত বেশি পেছনে পড়ে গেল উজের ঘোড়া, সন্ধ্যায় তিন গোয়েন্দার এক ঘণ্টা পরে পৌছল ক্যাম্পে। খুবই উদ্বিগ্ন ডজ। রাতের খাওয়ার সময় বললেন, ‘একটা দিন বিশ্রাম দিতে হবে ঘোড়াটাকে। নইলে চলতে পারবে না। ঘোড়াও হয়ে যেতে পারে।’

খাওয়া শেষ হলে বললেন, ‘তোমরা আমাকে রেখেই এগিয়ে যাও। যত তাড়াতাড়ি পারি তোমাদের কাছে পৌছব।’

‘আমাদের খুজে পাবেন তো?’ মুসার গলায় সন্দেহ।

‘তা পাব। এসব অঞ্চলে চিহ্ন অনুসরণ করে চলা খুব সহজ। দু’জন মানুষের জুতো আর একটা বারোর খুরের ছাপ জুলজুল করবে মাটিতে।’

পরদিন সকালে খাবার ভাগ করে দিলেন ডজ। রওনা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। স্ট্রাইপিং ব্যাগের ওপরে আরও কিছু বোৰা, এই যেমন খাবার আর রান্নার সরঞ্জাম, বহন করতে আপত্তি করল না শারি। এবার আর ওটার পিঠে চাপল না কিশোর। হেঁটে চলল। রবিন আর মুসা ও রইল সঙ্গে।

সেরাতে ক্যাম্প ফেলার পর প্রচুর কথা বলল ওরা, হাসি-মশকরা করল। ডজ কানের কাছে না থাকায় কথা বলতে পারছে সহজ ভাবে।

‘রাতে কি খাওয়া যায়, বলো তো?’ কিশোরকে রান্নার জোগাড় করতে দেখে ঠাণ্ডা করে বলল রবিন। ‘রাইস আর বীন?’

‘নাহ!’ জবাব দিল মুসা, ‘বীন আর রাইস।’

‘আসলে,’ হেসে বলল কিশোর। ‘তোমরা দু’জনেই ভুল করলে। রান্না করব বীনস আ লা রাইস। দয়া করে বাসন নিয়ে তৈরি হয়ে যাও।’

ডিনারের পর আগনের কুণ্ড ঘিরে বসল তিনজনে। হঠাৎ উত্তেজিত ডাক ছাড়ল শারি। লাফিয়ে উঠল তিনজনে। কান খাড়া।

মুহূর্ত পরেই আগনের আলোয় একটা বড় বারোকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল গাছের আড়াল থেকে। এল এদিকেই। শারির চেয়ে বয়েস অনেক বেশি। পিঠে জিন নেই। তবে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে কয়েকটা পঁটলা।

ওটার পেছন পেছন এল কালো বেণি করা সেই মহিলা।

ডাকাডাকি থামিয়ে দিল শারি। স্বজাতীয়কে দেখে খুশি হয়েছে। দুলকি চালে এগিয়ে গেল। নাক ঘষাঘষি করে স্বাগত জানাল পরম্পরকে।

কাছে এল মেকসিকান মহিলা।

‘ঘাবড়িও না,’ হাত নেড়ে স্প্যানিশ ভাষায় বলল সে। ‘এবার বারো চুরি করতে আসিনি। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার নাম ইসাবেল। তোমরা

কে, জানি। তবে, কথা বলার আগে, আমাকে কিছু খেতে দাও। খুব খিদে পেয়েছে।'

এক প্রেট রাইস আর বীন দিল ওকে কিশোর। আগুনের ধারে বসল ইসাবেল। ভাল খিদেই পেয়েছে ওর। সমস্ত খাবার শেষ করার আগে মুখই তুলল না।

বাসে বেশ কিছুটা দূর থেকে ওকে দেখেছে কিশোর। এই প্রথম কাছে থেকে ভালমত দেখার সুযোগ পেল। মহিলা থাচ্ছে, আর সে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে।

বয়েস চল্লিশ মত হবে। মোটামুটি সুন্দরীই বলা চলে। চেহারাই বলে দিচ্ছে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। পকেটওয়ালা টিলাটালা একটা উলের স্কার্ট পরেছে। পায়ে মেকসিকান বুট। গায়ে খাটো হাতাওয়ালা একটা ব্রাউজ। চামড়ার রঙ গাঢ় বাদামী, চোখ পিরেটোর মতই কালো। সব মিলিয়ে, কিশোরের মনে হলো, ওই মহিলা ভাল ভাল, মন্দের যম।

খালি বাসনটা সরিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল ইসাবেল। পুরুষের ঘড়ি পরেছে। বেন্টটা টিলে। হাত খাড়া করতেই নিচের দিকে নেমে গেল ওটা। তাড়াতাড়ি আবার ওপরের দিকে কজির কাছাকাছি তুলে দিল সে।

'সময় বেশি নেই,' ইসাবেল বলল। 'লেকের কাছে ফিরে যেতে হবে আমাকে। যতটা তাড়াতাড়ি পারি সংক্ষেপে সব বলে যাচ্ছি তোমাদেরকে।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'আমি ইংরেজি বলতে পারি না। তবে তোমরা স্প্যানিশ জানো, জানি আমি।'

পুরাণো চামড়ার জ্যাকেট পরা লোকটার কথা মনে পড়ল কিশোরের। যে ওদেরকে বাসে উঠতে বাধা দিছিল। লোকটার সঙ্গে তর্ক করার সময় নিশ্চয় মহিলা শুনেছে। বুঝতে পেরেছে ওরা স্প্যানিশ জানে।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বলতে ততটা পারি না। তবে বুঝতে পারি। আস্তে আস্তে বলুন, বুঝব।'

'গুড়।' হাটু ভাঁজ করে আরাম করে বসল ইসাবেল। টেনে দিল স্কার্ট। পরের শপনেরো মিনিট নিচু স্বরে প্রায় একটানা কথা বলে গেল। মাঝে সাবে একআধটা প্রশ্ন করল কিশোর। ইতিমধ্যে একবার উঠে চলে গিয়েছিল রবিন। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসেছে।

তারপর উঠে দাঁড়াল ইসাবেল।

তিনি গোয়েন্দা ও উঠল।

এক এক করে ওদের সঙ্গে হাত মেলাল ইসাবেল। তারপর, যেমন হঠাত করে উদয় হয়েছিল, রহস্যময় ভাবে, তেমনি করেই আবার বারো-টাকে টেনে নিয়ে আবৃশ্য হয়ে গেল রাতের অঙ্ককারে।

আগুনে কাঠ ফেলল মুসা। 'কি বুঝালে?'

'একটা সাংঘাতিক গল্প বলে গেল!' মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে বলল কিশোর। 'রবিন, পঞ্চে ভিলার ব্যাপারে যা যা জানো বলো তো?'

'আমাকে কি মেকসিকান পাবলিক লাইব্রেরি বলে মনে হচ্ছে?'

'বাজে কথা রাখ। রকি বীচ থেকেই মেকসিকোর ইতিহাস পড়া শুরু করেছে।'

তুমি। শেষ করোনি এখনও?’

‘করেছি,’ হাসল রবিন। ‘যেদিন তুমি লেকের পানিতে দুবে আরেকটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছিলে, সেদিনই।’

‘আমিও জানি, শেষ করে ফেলেছি।’ হাসিটা ফিরিয়ে দিল কিশোর। ‘উনিশ শো মোলো সালের ব্যাপারে আমার আগ্রহ। পঞ্চে ভিলার কথা কি জানো?’

‘ওই বছর একটা বিরাট বিদ্রোহ হয়ে গিয়েছিল মেকসিকোতে। সেই বিদ্রোহেই এক বড় নায়ক ছিল পঞ্চে ভিল। অনেকের ধারণা, আউট-ল ছিল সে, জেসি-জেমসের মত। ব্যক্তিগত একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল। অনেকগুলো লড়াই জিতেছে।’

‘এখানে, সিয়েরা মাদ্রেতেও এসেছিল নাকি?’

‘এসেছিল। তার একটা ঘাঁটি তৈরি করেছিল এখানেই। মরুভূমিতে নেমে গিয়ে টেনের ওপর আক্রমণ চালাত। লুটপাট করে ফিরে এসে আবার লুকিয়ে পড়ত এখানে।’

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ‘এই কথাটা তাহলে সত্যিই বলেছে ইসাবেল।’

‘তারমানে, তুমি বলতে চাইছ ওর ব্যাপারেই যত আগ্রহ মহিলার? মৃত একজন মানুষের ব্যাপারে?’

‘না, তার ব্যাপারে নয়,’ কিশোর জবাব দিল। ‘মনে হচ্ছে সিয়েরা মাদ্রে গুপ্তধনের পেছনেই ছুটেছি আমরা, না জেনে, যেটার কথা বহুবার বলেছ তুমি। পঞ্চে ভিলার লুটের মাল। শুনলে না, ইসাবেল বলে গেল, একদিন একটা টেন লুট করে হাজার হাজার ডলার দামের সিলভার পেসো নিয়ে এসেছিল পঞ্চে। এখানে উঠে এসে কোন একটা গুহাটুহায় লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল সে সব পেসো।’ ইসাবেলের বলে যাওয়া গল্প আবার বলতে লাগল কিশোর। নিজেকেই যেন শোনাচ্ছে। খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে এর ভেতরে। ‘একটা ভুল করেছিল পঞ্চে, কিংবা তার দুর্ভাগ্যই বলা যায়, পেসোর সঙ্গে একই গুহায় বারুদ রেখেছিল সে। অসাবধানে দেশলাইয়ের কাঠি ফেলেছিল তার এক সহচর, বিক্ষেপণ ঘটল বাকুদে। পর্বতের একটা অংশ ধসে গেল। টন টন পাথরের নিচে চাপা পড়ল পঞ্চের লুটের মাল, সেই সঙ্গে তার সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশ। পাথর পরিষ্কার করতে শুরু করল পঞ্চে। কিন্তু এই সময় তার শক্রুরা এসে আক্রমণ চালিয়ে বসল পর্বতের অন্য পাশ থেকে। পালাতে বাধ্য হলো সে।’

এক মুহূর্ত চূপ করে রইল কিশোর।

‘তারপর,’ গল্পটা শেষ করল সে। ‘ইসাবেল বলে গেল, শুনলেই তো, মুদ্রাগুলো এখনও সেখানে আছে।’

নীরবে কিশোরের কথা শুনছিল মুসা আর রবিন।

‘ইসাবেল জানল কি করে এসব?’ রবিনের প্রশ্ন। উঠে চলে যাওয়ায় অনেক কিছুই শোনেনি সে।

‘ও বলল, তার দাদা নাকি নেওয়ার সৈন্য দলে ছিল। ও-ই গল্পটা শুনিয়ে গেছে ওদের পরিবারকে,’ জবাবটা দিল মুসা।

‘ডজের কথা কি বলল?’ জানতে চাইল রবিন। ‘ওর নাম বলতে শুনলাম। বারোটার কথা কি যেন বলল?’

কিশোর বলল, ‘মাস তিনিক আগে নাকি ইসাবেলের এক বন্ধু, টনি নামের এক আমেরিকান তরুণ, এখানে এসেছে। সে আর তার বাবা সোনা খুঁজে বেড়িয়েছে এখানকার পর্বতে। আসলে ওরা খুঁজতে এসেছিল পঞ্চে ভিলার গুহা। ওদের ধারণা, গুহাটা খুঁজেও পেয়েছিল ওরা। ইসাবেলকে টনি সে কথাই বলেছে।’

চূপ করল কিশোর।

‘বলো,’ তাগাদা দিল রবিন। ‘কথার মাঝখানে থামলে কেন? ডজ আর শারি এর মধ্যে এল কিভাবে শুনতে চাই?’

‘টনি যখন লেকে গেল, বলল কিশোর। তার সঙ্গে ছিল একটা ছোট সান্দা বারো। গুহার কাছে পেয়েছিল ওটাকে। বাছাটার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলল। যাওয়ার সময় নিয়ে গিয়েছিল ডজের র্যাঞ্চে। তারপর আবার ফিরে গিয়েছিল পর্বতে।’

‘কেন? সাথে করে যখন আনতেই পারল, নিতে পারল না কেন? কেন ফেলে গেল র্যাঞ্চে?’

‘কারণ টনির ভয়, শারি আবার পর্বতে গেলে মরে যাবে। বারোটার চিকিৎসার দরকার ছিল, আর এখানে সব চেয়ে কাছের পশ্চিকিংসক থাকেন লারেটোতে। পিরেটো গিয়ে নিয়ে এসেছিল তাঁকে। বারোটাকে চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলা হলো।’

‘কি হয়েছিল ওর? এত্তাই যদি অসুস্থ হবে, ডজের র্যাঞ্চ পর্যন্ত গেল কি করে?’

‘চোখে একটা বাজে ধরনের ইনফেকশন হয়েছিল। তাতে প্রায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল বারোটা।’ ইসাবেলের গল্পের এই জায়গাটায় বিশেষ আগ্রহ কিশোরের। গলা শুনেই যে তাকে চিনেছে বারোটা, তার সঙ্গে ওই চোখের অসুখের কি কোন যোগাযোগ আছে? কেন শারি বুঝতে পারল না, সে টনি নয়, যে তাকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে বাঁচিয়েছে? অন্ধ হয়ে পর্বতে কোনদিন টিকে থাকতে পারে না কোন বারো। পিরেটোর কথা মনে পড়ল কিশোরেরঃ শারি ভাবে, তুমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছ।

মোলায়েম শিস দিল মুসা। ‘ইঁ, মিলতে আরম্ভ করেছে। ডজ জেনে গেছে টনি আর তার বাবা পঞ্চে ভিলার গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছে...’

‘তখন,’ মুসার মুখের কথা টেনে নিয়ে কিশোর বলল, ‘ডজ টনিকে গুহাটা চিনিয়ে দেয়ার জন্যে চাপাচাপি করেছে। কিন্তু টনি খুব চালাক। পালাল। চলার পথে নিজের চিহ্ন সব মুছে দিয়ে গেল, যাতে ডজ পিছু নিতে না পারে। ডজের কাছে রয়ে গেল শারি। পথ চেনে যে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে গুহার কাছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও শারিকে বাগ মানাতে পারল না সে, কিছুতেই তাকে নিয়ে গেল না বারোটা। ডজ বুঝতে পারল, যাকে পছন্দ করবে একমাত্র তার কথা ছাড়া আর কারও আদেশ মানবে না শারি। এমন কেউ, যাকে কষ্টস্বর শুনেই বন্ধু হিসেবে চিনে নেবে।’

‘তথন ওরকম কাউকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করল ডজ,’ মুসা বলল, ‘যার কষ্টব্যের সঙ্গে টনির ব্যরের মিল আছে। এ জন্যেই রহস্যময় ওই ধাঁধা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল সে।’

‘এবং কিশোরকে খুঁজে বের করল,’ যোগ করল রবিন। ‘কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ইসাবেল কেন এসব কথা ওকে বলে গেল?’

‘ঠিক়; মুসা বলল। ‘আমাদেরকে র্যাঞ্চেই যেতে দিতে চায়নি যে, সে কেন এখন যেচে পড়ে সব কথা শুনিয়ে যায়?’

কথাটা কিশোরের মনেও খচখচ করছে।

‘আমাকে কোন প্রশ্ন করতে দেয়নি ইসাবেল,’ কিশোর বলল। ‘কেবল তার কথা যখন বুঝিনি, জিজ্ঞেস করেছি, বুঝিয়ে দিয়েছে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। যা বলার সে নিজেই বলেছে, আমাকে কেবল শুনতে হয়েছে। ডজকে একবিন্দু বিশ্বাস করে না। ওর ঘোড়া ঘোড়া হয়ে যাবে, চলতে পারবে না, এটা বিশ্বাস করেনি। ইসাবেলের ধারণা, ঘোড়ার পা ঠিকই ছিল, ইচ্ছে করেই আমাদের পেছনে পড়েছে ডজ। কোন উদ্দেশ্য আছে। মহিলার ভয়, টনি আর তার বাবাকে দেখলেই গুলি করে মারবে ডজ। ইসাবেলকে দেখলে তাকেও মারবে। কাজেই লেকে ফিরে যাচ্ছে সে। আমাদেরকে অনুরোধ করেছে গুহায় গিয়ে টনি আর তার বাবাকে যেন সাবধান করে দিই ডজের ব্যাপারে।’

আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল তিন গোয়েন্দা। দীর্ঘক্ষণ কারও মুখে কথা নেই।

অবশ্যে মুখ খুলল মুসা, ‘কিশোর, ইসাবেলকে বিশ্বাস করো তুমি?’

‘বুঝতে পারছি না করব কিনা। তাকে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। টনি আর তার বাবাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন? এমনও তো হতে পারে, সে চাইছে আমরা গিয়ে পেসোগুলো খুঁজে বের করি।’

‘হ্যা, হতেই পারে,’ রবিন বলল। ‘আমাদের পেছন পেছন যাবে সে। তারপর যেই আমরা গুলো বের করব, কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।’

## এগারো

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। নাস্তা সারতে সারতে আরও আলোচনা করল ইসাবেলের ব্যাপারে।

‘আমাকে বোকা বানাতে চেয়েছে সে,’ কিশোর বলল।

‘কিভাবে?’ মুসার প্রশ্ন।

‘লেকে ফিরে যাচ্ছে বলে। বেশ তাড়াহড়া, এমন একটা ভাব, যেন তক্ষণি রওনা হয়ে যাবে লেকের উদ্দেশ্যে।’

মাথা দোলাল রবিন। ‘রাতের বেলা এসব পাহাড়ে পথ চলাই মুশকিল। যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে সকালেও তো রওনা হতে পারত। পুরো ব্যাপারটাই আসলে ভাওতাবাজি।’

‘আর ওই ঘড়িটা,’ কিশোর বলল, ‘বার বার কজি থেকে নেমে যাচ্ছিল, ঠেলে

ঠেলে বলতে ইচ্ছিল ওপরে। মনে হলো...’ আগ করল সে...’ জানি, না, আলোর কারসাজি হতে পারে। ভুলও দেখে থাকতে পারি।’

‘কি?’ জিজেস করল মুসা।

‘ওর কজিতে একটা দাগ দেখেছি। শিওর মা।’

মুসা দেখেনি, জানল সে কথা।

রবিন বলল, ‘মহিলা ভীষণ চালাক। ওর অনেক কিছুই খটকা লাগার মত। আমার অবাক লেগেছে, যখন জানলাম, কন্টাষ্ট লেস পরে। সাধারণত যা পরে না মানুষ...’

‘কন্টাষ্ট লেস?’ বাধা দিল মুসা।

‘হ্যাঁ। বাসে মুছতে দেখেছি। মাথা নিচু করে রেখেছিল, প্রথমে বুঝতে পারিনি কি করছে। পরে ভালমত দেখে বুঝলাম। আরেকটা ব্যাপার আরও বেশি অবাক করেছে।’ চুপ হয়ে গেল রবিন।

‘সেটা কি?’ জানতে চাইল কিশোর। বলতে এত দেরি করছে রবিন, এটা সহ্য হচ্ছে না ওর।

‘আরেকটা ব্যাপার হলো...’ কিশোরের অবস্থা বুঝে হাসল রবিন। ইচ্ছে করেই দেরি করছে বলতে। তথ্য গোপন করে কিশোরও অনেক সময় ওদেরকে এরকম অস্থিরতার মাঝে রাখে। সুযোগ পেয়ে শোধ তুলছে সে।

‘কী! বলো না!’ খেপে গেল কিশোর।

‘ওয়াকি-টকি দিয়ে এই পর্বতের ভেতর কি করে সে?’ প্লেটের বীন সেন্ড শেষ করে কয়েকটা পাইনের পাতা কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলো দিয়ে মুছে পরিষ্কার করতে লাগল পেটটা রবিন। আবার চুপ।

অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনল। তারপর যখন খেংকিয়ে উঠতে যাবে তখন রবিন বলল, ‘বারোর পিঠের একটা পেঁটুলা থেকে ওয়াকি-টকির অ্যাটেনা বেরিয়ে আছে দেখলাম মনে হলো। পক্ষে ভিলার ব্যাপারে যখন তোমাকে জান দিছে, তখন। উঠে গেলাম ভাল করে দেখার জন্যে। ওয়াকি-টকি একটা আছে ওর কাছে।’

‘ওয়াকি-টকি দিয়ে এই পর্বতের ভেতর কার সঙ্গে কথা বলে সে?’ অবাক হলো মুসা। ‘ডজ হতে পারে না। কারণ ওকে দেখতে পারে না মহিলা। তাহাড়া ডজের সমন্ত পেঁটুলা-পাঁটুলি ভাল মত দেখেছি আমি। ওয়াকি-টকি নেই।’

‘পিরেটোর আছে,’ কিশোর বলল। ‘নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি মেরামত করে দিয়েছি। কিন্তু র্যাখ্ণ এখান থেকে অনেক দূর। ওয়াকি-টকিতে যোগাযোগ অসম্ভব।’

‘উঠল ওরা। সাবধানে আগুন নেভাল, যাতে ছড়িয়ে গিয়ে দাবানল সৃষ্টি করতে না পারে। শারির কাঁধে মালপত্র বাঁধল কিশোর।

‘লেকে যদি,’ বারোর পিঠে আলতো চাপড় দিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর। ‘সত্যিই না গিয়ে থাকে ইসাবেল, তাহলে কি করবে? হতে পারে, এই মুহূর্তে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আমাদের ওপর নজর: রাখুছে সে।’ আলো বেড়েছে। বাড়ছে ত্রুমেই। চারপাশে তাকাল সে। ‘আমরা

এগোলেই আমাদের পিছু নেবে, চিহ্ন ধরে ধরে। আমাদেরকে জানতে দিতে চায় না হয়তো, সে-ও যে ওই পেসোর পেছনে লেগেছে।'

হাত ওল্টাল মুসা। 'যদি সেটা করতেই চায়, করবে, আমাদের কিছু করার নেই। চিহ্ন তো আর লুকাতে পারব না।'

'তা পারব না।' শারিকে চলার নির্দেশ দিল কিশোর। 'তবে একটা সুবিধা আমাদের আছে।'

কি?'

'কাল রাতে ইসাবেলের বারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে শারি। আর মিষ্টার সাইমন জানিয়েছেন, বারোরা চেনা বারোকে অনেক দূর থেকেও গন্ধ ঝঁকে চিনতে পারে। একজন আরেকজনকে ডাকাডাকি করে জানান দেয়। তাই, ইসাবেলের বারোটা যদি খুব কাছাকাছি চলে আসে, ডাক দেবেই। শারিও জবাব দেবে। মাইল দুয়েকের মধ্যে থাকলেও জেনে যেতে পারব আমরা।'

সেদিনকার পথচলা অন্যদিনের চেয়ে কঠিন হল। সব চেয়ে খাড়া আর উচু চূড়ায় উঠতে থাকল শারি। ঢালের গভীর সব খাঁজ আর শৈলশিরার ভেতর দিয়ে একেবেকে উঠে চলল অনেক উচু চূড়াটার দিকে।

একটি বারের জন্যেও থামল না কিংবা ডাকল না ওটা। বার বার পেছনে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা, কিন্তু ইসাবেল বা তার বারোর ছায়াও চোখে পড়ল না।

আরেকবার ধোঁয়া দেখতে পেল ওরা। এক জায়গা থেকে লম্বা হয়ে উড়ছে ঘন সাদা ধোঁয়া। মনে হলো, যে চূড়াটায় উঠছে ওরা, তার ওপাশ থেকে উঠছে ওই ধোঁয়া।

'অন্তু তো!' মুসা বলল। 'বনই নেই, আগুন লাগল কিসে? ক্যাকটাস ছাড় আর কিছুই দেখি না।'

'ইঁ, মাথা দোলাল কিশোর। 'পাহাড়ের অন্যপাশে আছে হয়তো।'

তিক কঠে রবিন বলল, 'এখানে যেন সবাই মিথ্যক। ডজ মিছে কথা বলে, ইসাবেল মিথ্যে বলে, এখন পাহাড়ও দাবানল লেগেছে বলে ফাঁকি দিয়ে চলেছে আমাদের।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। 'ধোঁয়ার রঙও কেমন আজব! সাধারণ ধোঁয়ার মত নয়।'

অনেক ওপরে উড়ছে শিকারি পাখিরাঃ শকুন, ইগল, চিল। সেদিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'দাবানল পাখিদের কিছু করতে পারে না। বনের সবাই মরলেও ওরা পালায়। আগুন ছুঁতেও পারে না ওদের। এদিক থেকে ওরা ভাগ্যবান।'

এগিয়ে চলেছে ওরা। রহস্য সমাধানের প্রচণ্ড নেশাই ঝুক্ষ দুর্গম পথে শারির পিছু পিছু টেনে নিয়ে চলেছে কিশোরকে। বিকেলের শুরুতে মুসা আর রবিনকে অনেক পেছনে ফেলে এল ওরা।

'এই থাম!' আচমকা চিৎকার শোনা গেল। 'এক পা এগোবে না আর!'

থেমে গেল রবিন আর মুসা। মুখ তুলে দেখল ওদের অনেক ওপরে হাত তুলছে কিশোর।

‘এইবার আন্তে এগোও,’ বলল সে। ‘বারোটাকে অনুসরণ করো।’

আবাক হয়ে পরম্পরের মুখের দিকে তাকাল দুই সহকারী গোয়েন্দা। তাই তো করছে ওরা। তাহলে কি বলতে চাইছে কিশোর?

ধীরে ধীরে যেন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করল আবার রবিন আর মুসা। শারির একেবারে পেছনেই রয়েছে কিশোর। কোন রহস্যময় কারণে হাত তুলেই রেখেছে সে। বুঝতে পারছে না ওরা।

তারপর থেমে গেল গোয়েন্দাপ্রধান।

‘আর কাছে এসো না,’ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিখনি তুলে আবার তেসে এল কিশোর পাশার কষ্ট। ‘কে তোমার? এখানে কি চাই?’

আবার একে অন্যের দিকে তাকাল মুসা আর রবিন। পুরো ব্যাপারটাই কেমন ভূতুড়ে লাগছে এখন ওদের কাছে। হচ্ছে কি? পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি ওরা? ওদের মাথায় যেন গোলমাল করে দেয়ার জন্যেই আবার শোনা গেল ‘আমি কিশোর পাশা। তোমার জন্যে খবর নিয়ে এসেছি।’

ওর কথা যে কি প্রতিক্রিয়া করছে ওর বন্ধুদের ওপর ভাবল না কিশোর, আবার অবকাশও নেই। ওর কাছেও পরিস্থিতিটা বিপজ্জনক। পথের একটা মোড় ঘূরতেই চোখ পড়েছে একটা রাইফেলের নলের ওপর। পাথরের আড়াল থেকে উকি দিয়ে আছে ওটা।

‘থাম! আবার আদেশ দিল আগের কষ্টটা। ‘এগোবে না আর!’

ওই কষ্টস্বর স্তুক করে দিয়েছে শারিকেও। খাড়া হয়ে গেছে কান। মোলায়েম ডাক ছাড়ল একবার।

আবার ধীরে এগোনোর আদেশ হলো। শারিকে নিয়ে এগিয়ে চলল কিশোর। নলের গজখানেক সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। এখনও রাইফেলের নল স্থির হয়ে আছে কিশোরের বুকের দিকে।

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কিশোরেরই বয়েসী একটা ছেলে। তবে ওর চেয়ে লম্বা। এলোমেলো সোনালি চুল, রোদে পোড়া তামাটে মুখ। পরনে জিনস, পায়ে মেকসিকান বুট, গায়ে ডেনিম জ্যাকেট। রাইফেল নামাল না। নজর শারির দিকে।

‘শারি,’ বলল সে। ‘তুই এখানে এলি কি করে?’

কেঁপে উঠল বারোর কান। মুখ ঘূরিয়ে তাকাল ছেলেটার দিকে। তারপর কিশোরের দিকে, তারপর আবার ছেলেটার দিকে। দ্বিদ্বায় পড়ে গেছে।

আদুর করে ওর গলা চাপড়ে দিল কিশোর।

‘আমি নিয়ে এসেছি,’ শারির হয়ে জবাব দিল সে। ‘কিংবা বলা যায়, আমাকে এনেছে ও। তুমি কি টানি?’

জবাব দিল না ছেলেটা। কিশোরের দিকে একই ভাবে রাইফেল তাক করে রেখে সরে এল কিনারে, নিচে তাকাল। তিরিশ গজ নিচে ধীরে ধীরে উঠে আসছে রবিন আর মুসা।

‘ওরা কারা?’ ছেলেটার কষ্টে সল্লেহ।

অল্প কথায় জানাল কিশোর, ওরা তার বন্ধু, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছে

‘তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি আমরা।’ আবার নাম জিজ্ঞেস করল  
কিশোর, ‘তোমার নাম টনি, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’ রাইফেল নামাল না টনি। ‘কি সাহায্য করতে এসেছ?’

‘তোমাকে সাবধান করে দিতে যে, ডজ মরিস...’

‘ও কোথায়?’ সহসা শক্ত ফুটল টনির চোখে। ‘তোমার বক্সুদের সঙ্গে আছে?’

‘না। আমাদেরকে নিয়ে একসাথেই বেরিয়েছিল। তারপর তার ঘোড়ার পায়ে  
অসুখ দেখা দিল। ও তাই বলেছে। কয়েক মাইল পেছনে ফেলে এসেছি ওকে  
আমরা। কাল নাগাদ হজির হয়ে যেতে পারে।’

‘থ্যাংকস। আমাকে জানানোর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে।’ সেফটি  
ক্যাচ অন করে রাইফেলটা কাঁধে ঝোলাল টনি। ‘তোমরা এলে কি করে এখানে?’

‘বললাম না শারি নিয়ে এসেছে। যেখান থেকে গিয়েছিল ও সেখানেই ফিরে  
এসেছে।’

‘এত তাড়াতাড়ি ওকে পোষ মানাল কি করে ডজ?’

‘ও পারেনি। এখনও বুনোই রয়ে গেছে বারোটা। কেবল আমাকেই কাছে  
ঘৰ্ষণতে দেয়। ওর হয়তো ধারণা, আমিই ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি। আমাকে তুমি  
ভেবেছে।’

‘আমি? কেন?’

‘কারণ, আমাদের দু'জনের কষ্টস্বরই এক রকম- মনে হচ্ছে তুমি এটা খেয়াল  
করনি। শারির কাছে তাই আমরা দু'জনেই এক। আমার গলা প্রথমে শনে ভেবেছে  
আমিই তুমি। ওর কাছে এটা সেই কষ্ট, যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে লেকের  
কাছে, যখন সে অন্ধ ছিল। ওকে ভাল করার জন্যে। কৃতজ্ঞতা বোধ থেকেই  
আমাকে পছন্দ করেছে সে। আমার কথা শোনে। তোমার কথা শনে অবাক  
হয়েছে। কারণ, একই রকম কষ্টস্বর।’

বারোটার দিকে তাকিয়ে হাসল টনি। ‘আয়, শারি। লক্ষ্মী শারি।’

এখনও কাঁপছে বারোর কান। ঘোরের মধ্যে যেন কথা শনল টনির, এগিয়ে  
গেল। তারপর যখন ওকে আদুর করল টনি, আন্তে আন্তে ঘোর ভাঙল যেন। টনির  
বুকে নাক ঘষল।

রবিন আর মুসা উঠে এল সেখানে।

পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর, ‘আমার বক্সু মুসা আমান। আর ও রবিন  
মিলফোর্ড।...রবিন, ও টনি...’ পুরো নাম শোনার জন্যে তাকাল ওর মুখের দিকে।

‘টনি ইয়ালার।’ হাত বাড়াল সে, ‘হাই, তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি  
হলাম।’

রবিন আর মুসা হাসল। এখন বুঝতে পারছে, কিশোরের উল্টো পাল্টা কথার  
মানে। আসলে কিশোর বলেনি ওসব কথা, বলেছে টনি। তার কষ্টকেই কিশোরের  
কষ্ট বলে ভুল করেছে ওরা।

‘মনে হয় পিপাসা পেয়েছে তোমাদের,’ টনি বলল। ‘যে রকম পথে হেঁটে  
এসেছ, পাওয়ারই কথা। এসো। দিছি। আমার ঘরটা ও দেখবে।’

শারির দড়ি ধরে নিয়ে চলল টনি। একটা শৈলশিরার পাশের ঘোরানো পথ

ধরে ওপরে উঠে পর্বতের গায়ে দেখতে পেল প্রায় লুকানো একটা ফোকর। সুড়ঙ্গ মুখ।

‘মাথা নুইয়ে রাখ,’ সরু, নিচু সুড়ঙ্গে ঢোকার আগে সাবধান করে দিল টনি। কিছুদূর এগোনোর পর বলল, ‘ঠিক আছে, এবার সোজা হও।’

ডেতরে আবছা আলো। সেই আলোয় তিন গোয়েন্দা দেখল, বিশাল এক গুহায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। ছাত অনেক উঁচুতে। \*

দেশলাই দিয়ে মোম ধরাল টনি। কিশোর আন্দাজ করল, বেশ কিছুদিন ধরে এখানে বাস করছে সে। মেঝেতে গোটানো রয়েছে একটা শ্লীপিং ব্যাগ। বাসন, হাঁড়ি-পাতিল, একটা কেরোসিনের চুলা, আধবোৰাই কয়েকটা বস্তা, গাঁইতি, শাবল রাখা হয়েছে দেয়াল ঘেঁষে। ছাত দেখেই অনুমান করা যায় এখানে কথনও বারংব বিক্ষেপেরিত হয়নি। পক্ষে ভিলার গুহা নয় এটা।

একটা বস্তা তুলে নিয়ে মেঝেতে জই ঢালল টনি। ‘আবো এনেছিল, ঘোড়ার জন্যে। ভালই হয়েছে, কিছুটা রয়ে গেছে। এখানে ঘাসপাতার যা আকাল। এই জই না থাকলে না খেয়ে থাকতে হত শারিকে।’

একমাত্র শ্লীপিং ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। ‘তোমার আবো কোথায়?’

‘কেন? তার কি দরকার?’ আবার সন্দেহ জাগল টনির চোখে।

‘কারণ তাঁকেও ডজের ব্যাপারে সাবধান করে দিতে চাই।’

মাটির জগ তুলে নিয়ে একটা মাটির ছোট গামলায় শারির জন্যে পানি ঢালল টনি। \*

‘আবো নেই। ঘোড়া নিয়ে গেছে, খাবারদাবার আনার জন্যে।’ জগটা বাড়িয়ে দিল তিন গোয়েন্দার দিকে। ‘নাও, পানি।’

‘কোনদিকে গেছেন তিনি?’ জানতে চাইল কিশোর। ‘লেকের দিকে? তাহলে ডজের সামনে পড়ে যেতে পারেন।’

‘না, ওদিকে যায়নি। পর্বতের অন্যপাশে একটা গ্রাম আছে। গোটা দুই দোকান আছে ওখানে। সব জিনিস পাওয়া যায় না। তবে বাস থামে। আর বাস দিয়ে...’

থেমে গেল টনি। সন্দেহ যাচ্ছে না। দ্বিধা করছে। মনস্তির করার চেষ্টা করছে, ওদেরকে বিশ্বাস করবে কিনা।

‘এখানে কেন এসেছ, বলো তো?’ জিজ্ঞেস করল সে।

‘ডজের ধারণা...’

বলতে গিয়ে চুপ হয়ে গেল কিশোরও। সব কথা টনিকে বলার সময় এসেছে। জোরে একবার দম নিল সে। তারপর শুরু করল। ক্রসওয়ার্ড পাজল প্রতিযোগিগত থেকে। একে একে বলল, কি করে ওরা জানতে পেরেছে পক্ষে ভিলার পেসোর কথা।

নীরবে শুনছে টনি। মেঝেতে তিন গোয়েন্দার পাশা পাশি বসেছে। পেসোর কথা শনে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। ‘ওগুলোর কথা ডজ বলেছে? আর কি বলেছে? পেলে লুটের মাল ভাগাভাগি করে নেবে?’

‘না,’ মুসা সন্দেহমুক্ত করার চেষ্টা করল তাকে। তুলেও একবার পেসোর কথা উচ্চারণ করেনি ডজ। ও আমাদেরকে বলেছে, পর্বতে যেতে হবে বারোটাকে ছেড়ে দিয়ে আসার জন্যে। ওটার জন্মভূমিতে। শারির খুর নাকি বড় হয়ে যাচ্ছে, পর্বতের পাথুরে অঞ্চলে ঘষা না খেলে সমান হবে না।’

‘কী!'

মুসা আরও বলল, ‘ইসাবেল আমাদেরকে বলেছে রূপার পেসোর কথা।’

‘ইসাবেল?’ চিনতে না পেরে ভ্রুকুটি করল টনি। ‘এই ইসাবেলটা আবার কে?’

চেহারার বর্ণনা দিল রবিন। কালো বেনির কথা বলল। কালো চোখ আর লাল শালের কথা বলল।

‘মেকসিকান?’ এখনও ভ্রুকুটুকুঁচকেই রেখেছে টনি।

‘মনে তো হলো,’ জবাব দিল কিশোর। ‘স্প্যানিশ ছাড়া আর কোন ভাষা বোঝে না। ওর চামড়ার রঙও মেকসিকানদের মত বাদামী।’ নিজেও অবাক হয়ে ভাবতে আরঝ করেছে এখন, আসলেই মহিলা মেকসিকান কিনা! ‘ডজের ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করে দিতে বলেছে আমাদেরকে। তোমার নাকি বক্স। তুমি তাকে চেন?’

মাথা নাড়ল টনি। ‘নামই শুনিনি কখনও। আর চেহারার যা বর্ণনা শনলাম, তাতে বুঝতে পারছি, ওর সঙ্গে জীবনে কখনও দেখা হয়নি আমার।’

## বারো

‘এই পর্বতে গুহার অভাব নেই,’ টেনি বলল। ‘পঞ্চে ভিলা আর তার সাগরেদেরা নিশ্চয় একেক সময় একেক গুহায় ঢুকত, লুকিয়ে থাকার জন্যে। তবে আবার ধারণা, সে যেটাতে পেসো লুকিয়েছিল সেটা পেয়ে গেছি আমরা।’

সন্ধ্যায় যার যার স্লীপিং ব্যাগ বের করে তার ওপর আরাম করে বসেছে তিনি গোয়েন্দা। কেরেসিনের চুলায় এক হাঁড়ি খাবার রান্না করেছে টনি, একঘেয়ে সেই বীন আর চাল সেন্ধ। তিনটে মোম জ্বলছে এখন। সুড়ঙ্গমুখে একটা কহল ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছে সে, যাতে বাইরে আলো বেরোতে না পারে। এককোণে জই চিবাচ্ছে শারি।

যার যার পুটে খাবার দেয়া হলো।

‘কি করে জানলে তোমরা, আসল গুহটাই খুঁজে পেয়েছ?’ মুসা জিজ্ঞেস করল। ‘এত গুহার মধ্যে আলাদা করে চিনলে কি করে?’

‘কিছু কিছু চিহ্ন দেখে। পাথর পড়ে বক্স হয়ে ছিল গুহামুখ। ওগুলো কিছু কিছু সরিয়ে যখন ঢুকলাম, পেয়ে গেলাম ইগনাসিওকে।’

‘ইগনাসিও?’

ভিলার এক সিপাহী। উনিশশো ষালো সাল থেকে গুহায় থেকে থেকে তার চেহারা অবশ্যই আর চেনার জো ছিল না। আসলে, চেহারাই আর অবশিষ্ট নেই। শুধুই কঙ্কাল। ইউনিফর্মের কয়েকটা টুকরো তখনও লেগে ছিল। আর তার খুলিটা...’

‘দয়া করে এখন একটু চুপ করবে,’ বাধা দিয়ে বলল মুসা। ‘আমি এখন এই  
রাজকীয় খানা গেলার চেষ্টা করছি।’

হাসল রবিন। ‘মরা মানুষের কথা শুনলে ভয় পায় আমাদের মসা। বিশেষ  
করে অপঘাতে মৃত্যুর কথা শুনলে।’ মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে হাসল,  
‘ঝাওয়ার রুচি ও নষ্ট হয়ে যায়, তাই না?’ আবার টনির দিকে তাকাল সে। ‘ভূতের  
বড় ভয়।’

‘ও,’ টনিও হাসল। ‘ভাবনা নেই, ভূত হতে পারবে না। খ্রিস্টানদের মত  
করেই কবর দিয়েছি তাকে।’ আবৰা তার কবরের ওপর একটা ক্রশ লাগিয়ে  
দিয়েছে। লিখে দিয়েছে মেকসিকোর মহান মিলিটারি হিরো ইগনাসিওর স্মৃতির  
উদ্দেশ্যে। ইগনাসিও অ্যালেও ছিল অনেকটা আমেরিকানদের জর্জ ওয়াশিংটনের  
মত, আর...’

‘গুহার মধ্যে তুমি তুকেছিলে?’ প্রসঙ্গটা ভাল লাগছে না মুসার, অন্য বিষয়ে  
চলে যাওয়ার জন্যে বলল।

মাথা নাড়ল টনি। ‘গাইতি আর শাবল দিয়ে কিছু পাথর সরিয়েছি। ওই  
পর্যন্তই। এর বেশি আর কিছু করতে পারিনি। পেসোগুলো দেখিনি। সে জন্যেই  
বিস্ফোরক কিনতে গেছে আবৰা।’

‘কখন ফিরবেন?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘তিন-চার দিনের আগে না। গাঁয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না, মাত্র কয়েক  
ঘন্টা। ওখানে ঘোড়া রেখে যাবে আবৰা। দুটো ঘোড়া নিয়ে গেছে। দরকার আছে।  
আসার সময় তারি বোৰা বয়ে আনতে হবে। যাই হোক, আবৰা চলে যাবে চিহ্ন্যা  
ত্ব্যায়। ওটাই স্ব চেয়ে কাছের শহর, যেখানে ডিনামাইট আর দরকারী অন্যান্য  
জিনিস কিনতে পাওয়া যায়।’

‘তার মানে,’ রবিন বলল। ‘ডজকে আমাদেরই সামলাতে হবে। হয়তো  
ইসাবেলাকেও। তবে, আমরা চারজন। দুজন মানুষকে কাবু না করতে পারার কিছু  
নেই।’

নতুন বস্তুদের দিকে তাকাল টনি। ‘ভাল লাগছে আমার। একা আর সামলাতে  
হবে না ওদেরকে। আরও তিনজনের সাহায্য পাব। ডজের ব্যাপারে যে আমাকে  
সাবধান করে দিলে তার জন্যে আরেকবার ধন্যবাদ দিছি তোমাদেরকে। তোমরা  
আমাকে চিনতেও না।’

‘ইয়ে...’ কিশোরের মনে পড়ল, ওদের পরিচয়ই এখনও দেয়া হয়নি টনির  
কাছে। শুধু নাম বলেছে। বলল, ‘তোমার জন্যেই যে কেবল একাজ করছি, তা  
নয়। আমাদেরও আগ্রহ আছে। এটা আমাদের জন্যে আরেকটা কেস।’

‘মানে?’ টনি বুঝতে পারছে না। ‘ডিটেকটিভের মত কথা বলছ তুমি।’

‘ডিটেকটিভই আমরা। শখের গোয়েন্দা।’ পকেট থেকে একটা কার্ড বের  
করে দিল কিশোর।

অনেকক্ষণ কার্ডটার দিকে তাকিয়ে রইল টনি। ভুরু কঁচকাল। তারপর  
বিড়বিড় করল, ‘এটা কি ভাষা?’

‘দেখি? আরে, বাংলাটা দিয়ে ফেলেছি। এটা আমার মাতৃভাষা।’

‘তার মানে তুমি আমেরিকান নও?’ অবাক হলো টনি।

‘বাংলাদেশী। তবে আমেরিকার নাগরিকত্বও আছে আমার।’ ইংরেজিতে লেখা আরেকটা কার্ড বের করে দিল কিশোর।

সেটাও ঠিক মত পড়তে পারল না টনি। ইনভেস্টিগেটরের উচ্চারণ করল নিভেসিটিগেটর। শেষে কিশোরের হাতে দিতে দিতে বলল, ‘তুমই পড়ে শোনাও।’

কার্ডের দিকে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না কিশোর। জোরে জোরে বলল, কি লেখা আছে।

‘ও,’ আরেক দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল টনি। বলল, ‘আমি পড়তে পারি না, তা নয়। আসলে, ডিজলেকজিয়া আছে আমার। ওটা কি জানো?’

‘জানি,’ ঘাড় কাত করল রবিন। টনির জন্যে কষ্ট হল তার। ‘এর মানে হল, অক্ষর উল্টোপাল্টা দেখ তুমি। ইটালিতে এই রোগ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। রঙিন লেন্স দিয়ে এখনও চেষ্টা চলছে, সারানোর উপায় খুঁজছেন বিজ্ঞানীরা।’

‘হ্যাঁ। বাড়ি ফিরলে ডাঙ্গারের কাছে নিয়ে যাবে বলেছে আশ্মা। সেটা তো বাড়ি যাবার পর। এখানে তো আমি এখন পড়তে পারি না। খুবই কষ্ট হয়। চিঠিও পড়তে পারি না। তাই যোগাযোগ রাখার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করেছি। টেপে কথা রেকর্ড করে আদান-প্রদান করি। আশ্মা আমাকে টেপ পাঠায়, আমিও আশ্মাকে টেপ পাঠাই।’

কিছু বলল না কিশোর। মাথার ভেতরের মগজ নামের কম্পিউটারটা তার চালু হয়ে গেছে বেদম গতিতে।

আরেকটা ধাঁধার সমাধান হলো, বসে গেল খাপে খাপে। ইয়ার্ডের ডাকবাঞ্ছে পাওয়া টেপটায় রেকর্ড করা ছিলঃ মেকসিকোতে এসো না, পুরীজ! মারাত্মক বিপদে পড়বে...

নিচয় ওটা টনিরই কষ্ট ছিল। ওর মাকে কোন কারণে সতর্ক করে দিয়ে পাঠানো একটা দীর্ঘ চিঠিরই কিছু অংশ আবার রেকর্ড করা হয়েছিল। কিংবা বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো রেখে বাকি সব মুছে ফেলা হয়েছিল। তারপর রেখে আসা হয়েছিল ইয়ার্ডের ডাকবাঞ্ছে। কিশোরকে ভয় দেখানোর জন্যে, হমকি দেয়ার জন্যে। এবং এটা করতে গিয়ে একটা চমৎকার সূত্র রেখে এসেছিল।

টনির দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, ‘তোমার আশ্মা কি এখন লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকেন?’

‘হ্যাঁ। মনে হয়। আসলে, কখন যে কোথায়...’ চুপ হয়ে গেল টনি। আবার অন্য দিকে তাকাল। বলতে চায় না।

চাপাচাপি করল না কিশোর। তবে আরেকটা কথা জানা দরকার। ‘তুমি কি তোমার আশ্মার মত দেখতে? তোমার মতই সোনালি চুল?’

‘হ্যাঁ। আমার মত চোখও নীল। কেন?’

‘না, ভাবছি।’ হাই তুলল কিশোর। ওয়ে পড়ল লস্বা হয়ে। ‘যুমালে কেমন হয়?’

সবাই রাজি। কয়েক মিনিট পর ফুঁ দিয়ে মোর্মবাতি নিভিয়ে দিল ওরা। সুড়ঙ্গ

মুখের কাছে ঝোলানো কম্বলটা গিয়ে খুলে নিয়ে এল টনি। স্লীপিং ব্যাগে তুকল চারজনেই। তারপর ঘূর্ম।

পরদিন খুব সকালে ঘূর্ম ভাঙল কিশোরের। দেখল, বাইরে থেকে সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে যেন চুইয়ে চুইয়ে চুকছে আবছা আলো। প্রথমেই তাকাল, শারি কি করছে দেখার জন্যে। আরে! নেই তো!

তাড়াহড়ো করে ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল সে। শারিকে খুঁজতে লাগল। গুহায় ঢোকার পথের ওপরই দেখতে পেল ওটাকে, বিশ গজ দূরে। তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মাথা তুলে মোলায়েম ডাক ডাকল বারোটা। ছিঃশিয়ারি নয়, বন্ধুত্বপূর্ণ। মুহূর্ত পরেই আরেকটা বারোর ডাক কানে এল, শারির ডাকের সাড়া দিল ওটা বাইরে থেকে। সুড়ঙ্গমুখের নিচে কোনখানে রয়েছে।

ইসাবেলের বারো, ভাবল কিশোর। দ্রুত সরে এল পেছনে। লুকিয়ে পড়ল পাথরের আড়ালে। মুহূর্ত পরেই তার পাশে চলে এল টনি, মুসা আর রবিন। ওরাও ডাক শুনেছে।

মোলায়েম ডাক বিনিময় চলতেই থাকল শারি আর অন্য বারোটার মধ্যে। তারপর একসময় দেখা গেল দ্বিতীয় বারোটাকে। পর্বতের ঢালের একটা নালা ধরে উঠে আসছে।

দুলকি ঢালে এগিয়ে গেল শারি। অন্য বারোটা কাছাকাছি এলে ওটার গায়ে গা ঘষতে শুরু করল।

ইসাবেলের বারোর লাগাম এখনও পরানো রয়েছে, কিন্তু পিট্টের বোঝাগুলো নেই। সৰ্ব উঠেছে। রোদ বাড়ছে, বাড়ছে আলো। আশপাশটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল চারজনে।

‘ইসাবেলকে দেখা গেল না।’

‘চলো, দুটোকেই গুহায় নিয়ে যাই,’ প্রস্তাব দিল মুসা। ‘শারিকে দেখলেই বুঝে ফেলবে ইসাবেল, আমরা এখানে আছি।’

কিশোর আর টনি মিলে দুটো বারোকে বলে বলে নিয়ে গেল গুহার ভেতরে। ওদের অনুসরণ করল অন্য দু’জন।

‘ইসাবেলকে তোমরা পছন্দ করো না, তাই না?’ টনির প্রশ্ন।

‘ওই মহিলা আরেকটা ধাঁধা,’ কিশোর বলল। ‘সে আমাদেরকে বলেছে ডজের ব্যাপারে তোমাদেরকে সাবধান করে দিতে। বলেছে, সে তোমাদের পরিচিত। বন্ধু। অথচ তুমি বলছ, কখনও দেখইনি। এর মানেটা কি? মনে হচ্ছে রবিনের কথাই ঠিক। ধাঁধাবাজ মহিলা।’

দুটো বারোই ক্ষুধাত্ত। গুহার ভেতরে নিরাপদ জায়গায় এনেই ওগুলোকে খাবার দিল টনি, পানি ঢেলে দিল গামলায়। মুসা বসল রান্না করতে। তাদের সেই একই খাবার, বীন আর চাল সেদ্ধ।

একসাথে থেতে বসল না ওরা। বাসন নিয়ে সুড়ঙ্গমুখের কাছে চলে গেল কিশোর, পাহারা দেয়ার জন্যে। উপুড় হয়ে শয়ে পড়ল সে, যাতে নিচ থেকে তাকে চোখে না পড়ে। আস্তাগোপন করে রাইল পাথরের আড়ালে। উঁকি দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে দেখল নিচের অঞ্চল। আঁতিপাতি করে খুঁজেও ইসাবেলকে চোখে পড়ল

না।

কল্পনটা প্রথমে টের পেল বুকের কাছে। হংপিণের ঝাঁকি নয়, বাইরে থেকে আসা। যেন পাহাড়ের অনেক গভীর থেকে আসছে। এতটাই জোরাল হলো, হাত থেকে চামচ পড়ে গেল। ভূমিকম্প নয়। লস অ্যাঞ্জেলেসে আজীবন বাস করে আসছে, ভূমিকম্প হলে কি হয় ভাল করেই জানে। এখনকারটা হঠাৎ কোন ঝাঁকুনি নয়। বরং মহাসড়কের ধারে দাঁড়ালে আর পাশ দিয়ে ভারি কোন লরি চলে গেলে যেমন কাঁপতে থাকে মাটি অনেকটা তেমন।

ঘন্টাখানেক পরে তার জ্যায়গায় পাহারা দিতে এল রবিন। সেই রকম কথা হয়েছে। এক এক করে সবাই দেবে, এক ঘন্টা পর পর।

কাঁপুনি টের পেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘পেয়েছি,’ রবিন জানাল। ‘ভূমিকম্পের মত কিন্তু মনে হলো না। অন্য রকম। এই পর্বতমালাকে বিশ্বাস নেই, বইয়ে পড়েছি। এখন তার প্রমাণ পাচ্ছি। কখন যে কি ঘটে যাবে বলা মুশ্কিল। আচ্ছা, কাল যে বনে আগুন লাগতে দেখলাম... না না, আগুন তো না, ধোয়া, এর কি ব্যাখ্যা, বলো তো?’

ফিরে তাকাল সে। পেছনে কিছুই দেখতে পেল না। দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের উচু চূড়া। গুহামুখের ওপর থেকে উঠে গেছে অনেকখানি।

‘কুইন সাবে?’ রাবনের প্রশ্নের জবাব দিল কিশোর। অর্থাৎ, জানে না।

পাহারায় বসল রবিন। নিচের দিকে তাকিয়ে ইসাবেলকে ঝুঁজতে লাগল তার চোখ।

কিশোর যখন এসেছিল, তার দুই ঘন্টা পরে এসে রবিনকে মুক্তি দিল মুসা। নিচে তাকিয়ে মনে হলো তার, একটা নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পারল না। পাখির ডাক ডেকে গুহার ভেতরে বন্ধুদেরকে জানিয়ে দিল তার সন্দেহের কথা।

‘কোথায়?’ সুড়ঙ্গমুখের কাছে আবার উপুড় হয়ে শয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘ওই যে, ওখানটায়।’ বাঁয়ে হাত তুলে দেখাল মুসা।

চারজনেই দেখতে পেল, অনেক নিচে মৃত্যিটাকে।

একজন লোক। মাথায় টেটসন হ্যাট। হাতে রাইফেল নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসছে এদিকেই।

ডজ মরিস।

## তেরো

‘গুহায় লুকিয়ে থাকার কোন মানে নেই,’ কিশোর বলল। ‘ডজ আসতে চাইলে ঠিকই চলে আসবে চিহ্ন দেখে দেখে। গুলি করতে করতে চুকলে তখন আমাদের কিছুই করার থাকবে না...’

‘তাহলে লুকিয়ে থেকে প্রথম আক্রমণটা আমাদেরকেই করতে হবে,’ বলল রবিন।

‘হ্যা,’ মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ‘একটা বৃক্ষ এসেছে মাথায়। এতে কাজ হতে ও ওয়ার্নিং বেল

পুরে।

‘বলে ফেল।’

‘চলো, ভেতরে গিয়ে বসি। এখানে প্রাইভেসি নেই।’ হামাঙড়ি দিয়ে ঢুকতে আরম্ভ করল কিশোর। তাকে অনুসরণ করল অন্যেরা।

মিনিটখানেক পরে কিশোর, টনি আর রবিন বেরিয়ে এল আবার। টনির হাতে তার রাইফেল। বুকের কাছে ধরে রেখেছে। অপেক্ষা করে রইল ডজ পথের বাঁকে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। তারপর দ্রুত নামতে শুরু করল। পাথরে পা পিছলে যাচ্ছে, পরোয়াই করল না। নেমে চলে গেল একটা বড় পাথরের আড়ালে। তাকে অনুসরণ করে গিয়ে রবিনও লুকিয়ে পড়ল।

সুড়প্রমুখের কাছে পড়ে আছে কিশোর। মাথা নিচু করে রেখেছে। যতটা না হলে ডজকে দেখতে পাবে না তার বেশ তুলছে না। রাইফেল বাগিয়ে সাবধানে উঠে আসছে ডজ, শারির পায়ের ছাপ দেখে দেখে। বিশ গজের মধ্যে চলে এল ডজ।

‘ডজ!’ চিৎকার করে বলল কিশোর, ‘ডজ! আমি, টনি!'

‘টনি!’ ঝট করে ট্রিগার গার্ডের ভেতর আঙুল চলে গেল ডজের। ‘কোথায় তুমি?’

‘এই যে এখানে, ওপরে,’ চেঁচিয়ে জবাব দিল কিশোর। ‘আমার হাতে রাইফেল আছে। আপনার দিকে তোলা।’

হেসে উঠল ডজ। ‘তাহলে করো গুলি। ঠিক কোথায় আছ তুমি, জেনে যেতে পারব তাহলে। তারপর খুল ছাতু করে দেব।’

নালার ঠিক মাঝখান দিয়ে এসেছে পায়েচলা পাহাড়ী পথ। সেটা ধরে আবার এগোতে লাগল সে। উঠে আসতে থাকল ওপরে।

‘কি চাই আপনার?’ ভয় পেয়েছে যেন, কষ্টব্যরকে এমন করে তুলল কিশোর। ‘এখানে এসেছেন কেন?’

‘কথা বলতে। তুমি আর তোমার বাবার সঙ্গে পদ্ধে ভিলার ব্যাপারে কথা বলতে চাই।’

‘রাইফেল ফেলে দিন।’ কর্কশ কঠে আদেশ দিয়ে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল টনি। ডজের পেছনে। নলের মাথা দিয়ে জোরে গুঁতো মারল লোকটার পিঠে।

অবাক হয়ে গেল ডজ। বিমৃঢ়।

‘কি হলো? ফেলছেন না কেন?’ আবার গুঁতো লাগাল টনি।

কিশোরের বুদ্ধি কাজে লেগেছে। তার ফাঁদে পা দিয়ে বোকা বনেছে ডজ। সে ভেবেছিল টনির সঙ্গেই বুঝি কথা বলছে। কি কাণ্ড! মুহূর্ত আগে ছেলেটার কথা শনেছে ওপরে, এখন শনছে পেছনে।

রাইফেল ফেলল না সে। তবে দ্বিধায় পড়ে গিয়ে নামাতে বাধ্য হলো।

‘এদিকে ফিরবেন না। মাথা ও ঘোরাবেন না।’ আবার কঠোর গলায় আদেশ দিল টনি।

কিশোর যা আশা করেছিল তাই ঘটল, অন্তত ঘটার উপক্রম হলো।

লাফ দিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রবিন।

মাথা না ঘোরাতে বলা হয়েছে, তবু ঘোরাতে গেল ডজ। সবে অর্ধেকটা ঘূরিয়েছে ঘাড়, এই সময় বেরোল রবিন। কাজেই তাকে চোখে পড়ল না ওর।

এক হ্যাচকা টানে ডজের হাতের রাইফেল কেড়ে নিয়ে দশ গজ দূরের একটা ক্যাকটাস খোপে ফেলে দিল রবিন।

গর্জে উঠল ডজ।

কারাতে ঘোন্ধার পজিশন নিয়ে ফেলেছে রবিন। মুসার মত অতটা ওন্তাদ নয় সে, অত শক্তি কিংবা ক্ষিপ্তাও নেই, তবে মন্দ বলা যাবে না। তার বিশ্বাস, ডজকে কাবু করে ফেলতে পারবে।

কিন্তু রবিনকে আক্রমণ করল না ডজ। আচমকা চরকির মত পাক খেয়ে ঘূরল। হাত লস্ব করে দিয়েছে। ধাপ করে খোলা আঙুলের থাবা গিয়ে বাঢ়ি মারল টনির মাথায়। টলে উঠে পিছিয়ে গেল টনি। লাফিয়ে এগিয়ে গেল রবিন। কিন্তু ততক্ষণে টনির রাইফেলের নল চেপে ধরেছে ডজ। জোরে এক মোচড় দিয়ে হ্যাচকা টান দিতেই অন্তর্টা চলে এল তার হাতে। পিছিয়ে গিয়ে সেটা তুলে ধরল রবিনের দিকে। দাঁত বের করে হিসিয়ে উঠল, ‘বিচ্ছুর দল! হাঁটো। নিচের দিকে। রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে যাওয়ার আগে থামবে না।’

অন্তর্হীন হয়ে গেছে। কিছুই করার নেই আর দু'জনের। টনি কিছু করার চেষ্টা করলেই তাকে গুলি করবে ডজ। ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল দু'জনে।

পথ ধরে নেমে গেল প্রায় একশো গজ। তারপর ঘূরল ডজ। উঠতে শুরু করল কিশোরের দিকে।

কয়েক গজ উঠে চিকার করে ডাকল, ‘বেরিয়ে এসো! নইলে গুলি শুরু করব!’

উঠে দাঁড়াল কিশোর।

টিগারে আঙুল চেপে বসল ডজের। আরেকটু বাড়লেই গুলি বেরিয়ে যাবে। ‘বেশ, নেমে এসো এবার। দ্রুত চলে যাও বন্ধুদের কাছে। তবে আগে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও।’

লোকটাকে জুড়ের পাঁচটে ফেলার সুযোগ খুঁজতে লাগল কিশোর। কিন্তু রাইফেলের নল যেভাবে ওর দিকে মুখ করে আছে তাতে কিছু করা সম্ভব নয়।

‘টনির বাবা কোথায়?’ জানতে চাইল ডজ।

দ্রুত ভাবনা চলছে কিশোরের মাথায়। ডজকে বিশ্বাস করাতে হবে গুহার ডেতে কেউ নেই।

‘মুসাকে নিয়ে পানি আনতে গেছে।’

‘ওদের দেখা পাব কি করে?’

‘কর্ণাটা মাইল দুই দূরে। পাহাড়ের আরেক পাশে। এখন থেকে দেখা যায় না।’

আলতো করে মাথা ঝাঁকাল একবার ডজ। হস্ত ত্বরণে পেন্নোগ্লাকে পাহারা দেয়ার এখন কেউ নেই, তুমি ছাড়া। শুড়। এখন ধোরো। গিয়ে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে বসে থাক। লুকিয়ে থাকবে। আমার চোখে যাবে ন পড়। পিঠে গুলি

থেতে না চাইলে জলন্দি ভাগ।'

হতাশ ভঙ্গি করল কিশোর। পরাজিত বিধৃত হয়ে যেন দ্রুত নামতে শুরু করল নালার ডেতর দিয়ে।

ও পাথরের আড়ালে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ডজ। তারপর মাথা নিচু করে দুহাতে রাইফেল ধরে চুকল সুড়সের ডেতরে।

ওকে আসতে শুনল মুসা। গুহার ঠিক ডেতরেই অপেক্ষা করছে। আশা করছে, মাথা নিচু করেই চুকবে ডজ, চুকতে হবে ওভাবেই। ঘাড়ে কারাতের কোপ মারার জন্যে চমৎকার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে তাহলে।

হাত তুলল সে। আঙুলগুলো সোজা করে শক্ত করে রেখেছে, গায়ে গায়ে চেপে লেগে রয়েছে একটা আরেকটার সঙ্গে। এভাবে ডজের ঘাড়ে একটা কোপই যথেষ্ট। মাথা তোলার আর সুযোগ পাবে না। ঢলে পড়বে মাটিতে।

গুহায় চুকল ডজ। সাপের মত ছোবল হানল যেন মুসার উদ্যত হাত। কিন্তু একটা বারো শব্দ করে ফেলল আর শেষ মুহূর্তে মাথা সোজা করে ফেলল লোকটা। মুসার কোপটা ঘাড়ে না লেগে লাগল তার কাঁধে। হেঁচট খাওয়ার মত ঝাঁকুনি খেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল তার শরীরটা। হাত থেকে রাইফেল ছাড়ল না।

লাফ দিয়ে পেছনে চলে এল মুসা। আরেকবার আঘাত হানার জন্যে উঠে গেল হাত। কিন্তু সামলে নিয়েছে ততক্ষণে ডজ। রবিন আর টনিকে পরাজিত করার সময় যেমন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল শরীরে, তেমনি খেলল আরেকবার। অসাধারণ ক্ষিপ্র লোকটা। চিতাবাঘকেও হার মানায়। কখন ঘূরল বুঝতেই পারল না যেন মুসা। শুধু দেখল, তার দিকে ঘূরে গেছে ডজ। রাইফেলের নল বুকের দিকে তাক করা।

হাত নামাল মুসা।

পরমুহূর্তে আন্দাজ করল, ডজের তুলনায় তার একটা সুবিধা বেশি। রোদ থেকে ডেতরে এসেছে লোকটা, তীব্র আলো থেকে আবছা অঙ্ককারে, চোখে সয়নি এখনও। দ্রুত কিছু করতে পারলে হয়ত কাবু করেও ফেলতে পারবে ডজকে, গুলি করার আগেই।

একপাশে সরে গেল সে। বোঝার চেষ্টা করল, ডজ দেখতে পেয়েছে কিনা, কিছু করতে গেলে গুলি খাবে কিনা। কিছুই বুঝতে পারল না। এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। বুঁকি নিল সে। একপায়ের গোড়ালিতে তর দিয়ে ঘূরল। পাক শেষ হওয়ার আগেই ঝট করে ওপরে তুলে সোজা বাড়িয়ে দিল ডান পাটা। ডজের বুকের সামান্য নিচে লাগল লাথি।

পুরো একটা সেকেও বাঁকা হয়ে রাইল ডজ। শ্বাস নিতে পারছে না।

যথেষ্ট সময় পেল মুসা। লাফিয়ে সামনে এগিয়ে কনুই দিয়ে একেবারে মেপে একটা ভয়াবহ আঘাত হানল ডজের ঘাড়ে। মারটা আরেকটু জোরে হলে মরেই যেত র্যাখ্তার।

গোটোশি-হিজি-অ্যাটি সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, ডজও পারল না। ঢলে পড়ল মেঝেতে। কিছু সময়ের জন্যে বেহশ।

অন্য তিনজন যখন গুহায় চুকল, তখনও মেঝেতেই পড়ে আছে সে। দড়ি

বের করে শক্ত করে বাঁধল তাকে টনি। খানিক আগেও রাইফেল হাতে যে হস্তিষ্ঠি  
করছিল, সে এখন পুরোপুরি অসহায়। তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে চারজনে।  
উভেজনা টের পেয়েই বোধহয় খাওয়া থামিয়ে দিয়েছিল বারো দুটো। আবার মুখ  
নামিয়ে জই ভুলে নিয়ে চিবাতে শুরু করল।

মিনিট থানেক পর রবিন বলল, 'হঁশ ফেরে না কেন? দশ পর্যন্ত গুনি।'

'দরকার কি গোনার,' কিশোর বলল। যখন ফেরে ফিরবে।'

বাইরে বেরিয়ে এল চারজনে।

'যেভাবে আশা করেছিলাম ঠিক সেভাবে ঘটল না,' হাসল কিশোর। মুসাই  
শেষ রক্ষা করল। নইলে গিয়েছিল সব ডঙ্গু হয়ে।'

হেসে বাতাসেই হাত দিয়ে একটা কোপ মারল মুসা। 'জিনিস বটে, কারাতে।  
খালি দুটো হাত আর পা-ই যথেষ্ট, মারাঞ্চক অন্ত হয়ে যায় ব্যবহারের গুণে।'

'ঠিক,' রবিন বলল। 'কোন দিন ক্রুস লী হয়ে যাও কে জানে! কিশোর,  
এরপর কি করব আমরা?'

'প্রথমে ডজের রাইফেলটা বের করে আনব,' কিশোরের আগেই জবাব দিল  
টনি। 'একটা রাইফেলের চেয়ে দুটো থাকলে অনেক সুবিধে।'

দ্রুত সেই ক্যাকটাসের ঝোপে নেমে এল ওরা, যেখানে রাইফেলটা ছুঁড়ে  
ফেলেছিল রবিন। খুঁজতে শুরু করল।

খুঁজেই চলল, খুঁজেই চলল। প্রতিটি খাঁজ, গর্ত, পাথরের ফাঁকফোকর, কিছু  
বাদ দিল না। প্রতিটি কাঁটা ওয়ালা ক্যাকটাসের পাতা সরিয়ে সরিয়ে দেখল।

পাওয়া গেল না রাইফেলটা।

'ইসাবেল!' রবিন বলল, 'ধারেকাছেই কোথাও ছিল। নিয়ে গেছে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর। কয়েকবার জোরে জোরে চিমটি  
কাটার পর বলল, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

'কত বুদ্ধি যে থাকে তোমার মাথায়!' গুড়িয়ে উঠল মুসা।

'আমার ধারণা,' কিশোর বলল, 'ইসাবেল এখানে কোথাও লুকায়নি।' চিন্তিত  
ভঙ্গিটা রয়ে গেছে। ঘাটিতে ফিরে গেছে সে।'

'ঘাটি?' ভুরু কোচকাল মুসা। 'সেটা আবার কি?'

'বারোর পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে নিয়ে গেছে, যাতে কোথাও ক্যাম্প করতে  
পারে। মিষ্টার সাইমন জানিয়েছেন আমাকে, বারোরা খুব বিশ্বস্ত জানোয়ার।  
সেটার প্রমাণও পেয়েছি আমরা। মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে তাকে আর ছাড়তে  
পারে না। ফিরে ফিরে যায় তার কাছে। এখন ইসাবেলের বারোটার আকর্ষণ শারির  
ওপর বেশি, তাই যেতে চাইছে না। কিন্তু যদি শারিরকে ওর সঙ্গে যেতে দিই,  
তাহলে নিশ্চয় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে ইসাবেলের কাছে। যেখানে ঘাটি  
করেছে মহিলা।'

'তোমাকে?' বাঁকা চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'একাই সব  
ক্রেডিট নিতে চাও? আমরা বাদ পড়ব কেন? সবাই গেলে অসুবিধে কি?'

'অসুবিধেটা হলো, চারজন অনেক বেশি। একসাথে গেলে দেখে ফেলতে  
পারে ইসাবেল। আমি একা হলে সারাঙ্গণ বারোগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থেকে

এগুতে পারব। আর শারিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তোমাদের নেই। কাজেই  
আমাকেই যেতে হচ্ছে।'

চূপ হয়ে গেল রবিন। সঙ্গে যাবার মত জোরাল যুক্তি দেখাতে পারল না আর  
কেউ।

ইসাবেলের ব্যাপারে অস্তুত একটা ধারণা বাসা বাঁধছে কিশোরের মনে।  
ধারণাটা হয়েছে খুব ক্ষীণ সূত্র থেকে। ক্যাপ্সের সামান্য আলোয় দেখা কজির  
দাগ। রবিন বলছে কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে মহিলা। সামান্য সূত্র, তবে অবহেলা করা  
উচিত নয়। অতি সাধারণ জিনিসও মাঝে মাঝে জটিল রহস্যের সমাধান করে  
দেয়। ইসাবেলের কজিতে দাগ সত্যিই আছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার  
একটাই উপায়, আরেকবার কাছে থেকে ভালমত দেখা।

'বেশ, যাও,' মুসা বলল অবশ্যে। 'তবে সাবধানে থেক। মহিলার কাছে  
এখন একটা রাইফেল আছে।'

বারোদুটোকে গুহা থেকে বের করে আনল টনি। জানাল, 'ডজের হঁশ  
ফিরেছে। আমাকে দেখেই গালাগাল শুরু করল। ছাড়া পেলে আমাকে কি কি  
করবে, পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে।'

ইসাবেলের বারোর পেটে জোরে এক চাপড় মারল কিশোর। চলতে শুরু করল  
ওটা। পাশে পাশে এগোল শারি। কিশোর তুকে পড়ল দুটো জানোয়ারের  
মাঝখানে। মাথা নুইয়ে রেখেছে, যাতে সহজে কারও চোখে না পড়ে।

ওপরেও উঠল না বারোদুটো, নিচেও নামল না। যতটা সম্ভব সমান্তরাল  
জায়গা ধরে চলতে লাগল। এখানকার পাহাড়ের এটা এক অস্তুত ব্যাপার। খাড়া  
ঢাল আছে, আবার অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঢালের গায়ে সমান জায়গাও আছে,  
টেবিলের মত।

ওপর দিকে মুখ তুলতে আরও অনেক গুহামূখ নজরে পড়ল কিশোরের। কিন্তু  
মাটিতে কোন চিহ্ন দেখতে পেল না, যেগুলো বলে দেবে কোন গুহাটার দিকে  
মানুষ গেছে।

চলছেই ইসাবেলের বারো।

তারপর কোন রুকম জানান না দিয়েই আচমকা থেমে গেল।

ওটার পাশে থমকে দাঁড়াল শারি। মাটিতে উপুড় হয়ে গুয়ে পড়ল কিশোর।  
শ'খানেক গজ ওপরে পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটল মত চোখে পড়ল। পাথরের  
আড়ালে থেকে, যতটা সাবধানে সম্ভব ত্রুল করে এগোল সেটার দিকে।

তাকে অনুসরণ করল না ইসাবেলের বারো। তবে নড়লও না। যেখানে ছিল  
সেখানেই দাঙ্গিয়ে রইল। কাছেই ছোট একটা সেজ বোপ দেখতে পেয়ে সেদিকে  
এগিয়ে গেল শারি। পাতা ছিড়ে চিবাতে শুরু করল। দেখাদেখি অন্য বারেটাও  
গিয়ে তাতে মুখ দিল। কোন শব্দ করল না।

ভুল স্বরলাম না তো? ভাবল কিশোর। পাহাড়ের ওই সরু ফাটলে নিশ্চয়ই  
ঢেকার পথ নেই, আর তাহলে ওখানে কাম্প করাও সম্ভব নয় ইসাবেলের পক্ষে।  
তবু, আরেকটু কাছে এগিয়ে দেখা যাক, কিছু আছে কিনা।

ঘাড়ে হাত পড়ল এই সময়। শীতল স্পর্শ। শক্ত করে চেপে ধরেছে যেন।

তার মুখের কাছ থেকে একটু দূরেই মাটি থেকে যেন গজিয়ে উঠেছে জিনিসটা। আসলে গেড়ে দেয়া হয়েছে। একটা কাঠের ক্রুশ। আড়াআড়ি বাঁধা দুটো কাঠের বাঁধনের কাছের একটা কোণ আটকে গিয়েছিল ওর ঘাড়ে, মাথা তোলার সময়।

নাম খোদাই করা রয়েছে ক্রুশটাতে। ইগনাসিও।

পেয়ে গেল তাহলে! গুহার বাইরেই কবর দেয়া হয়েছে কংকালটাকে। তার মানে কাছেই কোথাও রয়েছে পঞ্চে ভিলার গুহা। যেটাতে লুকানো রয়েছে পেসোগুলো।

ইসাবেল কি দেখে ফেলেছে? ওই গুহাতে গিয়েই ক্যাম্প করেছে সে?

নাকি ওপরে উঠে বসে আছে কোনখানে? ওই ফাটলের ভেতর?

ওপরে থেকে থাকলে এতক্ষণে বারোদুটোকে দেখে ফেলার কথা। দেখে থাকলে জানার চেষ্টা করবে কেন এসেছে ওগুলো।

মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ে রইল কিশোর। অপেক্ষা করছে।

মিনিটখানেকের বেশি থাকতে হলো না। মেকসিকান মহিলার পরিচিত মৃত্তিটা চোখে পড়ল। পশমের তৈরি ঢিলাটালা স্কার্ট, লাল শাল, কালো বেনি। গুহা থেকে বেরিয়ে তাকিয়ে রয়েছে নিচে বারো দুটোর দিকে।

হাতে রাইফেল। বোল্ট টানার শব্দ কানে এল কিশোরের।

যাও। নিজেকে বলল কিশোর। সময় হয়েছে ইসাবেল সম্পর্কে সমন্ত কথা জানার।

মাথা নামিয়েই রাখল সে। ভাবছে, যদি তার অনুমান ভুল হয়ে যায়? যদি তার সন্দেহের জবাব রাইফেলের বুলেট দিয়ে দেয় ইসাবেল?

ঝুঁকি না নিলে জানা যাবে না।

চিৎকার করে বলল সে, 'আমা, আমি! আমি টনি, আমা!'

## চোদ

কিশোরের জীবনের দীর্ঘতম দশটি সেকেও নড়ল না ইসাবেল।

তারপর রাইফেল হাত থেকে ফেলে দৌড়ে নামতে লাগল কিশোরের দিকে।

'টনি!' চেঁচিয়ে বলছে মহিলা, 'টনি! কোথায় তুই, বাবা! ঠিক আছিস? ভাল আছিস?'

স্প্যানিশ ছাড়া অন্য ভাষা না জানার ভান করছে না এখন। পরিষ্কার ইংরেজিতে বলছে।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। হ্যাঁ, টনি ভালই আছে। চালাকিটা করার জন্যে আমি দুঃখিত। তবে এছাড়া আপনার সাহায্য পাওয়ার আর কোন উপায় ছিল না। আমাদের সবারই সাহায্য দরকার। টনিরও।'

কয়েক গজ দূরে ধমকে দাঁড়িয়েছে ইসাবেল। আরও দশটি সেকেও কিশোরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হাসল অবশ্যে।

'এসো,' ডাকল সে। 'বলো আমাকে, কি হয়েছে।'

ফিরে তাকাল কিশোর। শান্ত ভঙ্গিতে পাতা ছিঁড়ছে বারোদুটো। খাওয়া নিয়ে  
ব্যস্ত। আর কোনদিকে নজর নেই। মহিলাকে অনুসরণ করে ফাটলটার দিকে  
এগোল সে।

‘ডেজ কোথায়?’ রাইফেলটা তুলে নিয়ে জিজেস করল মহিলা। পাহাড়ের নিচে  
যতদূর সোখ যায় তাকিয়ে দেখল লোকটা আছে কিনা।

‘ওকে নিয়ে ভাবনা নেই,’ গুহায় কি ঘটেছে জানাল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল ইসাবেল। সেফটি ক্যাচ অন করে দিল। টনি আর ওর বাবার  
চিত্তায় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আমার। কাল এই গুহাটা দেখেছি আমি। ভেতরে  
দু’জনের জিনিসপত্র পড়ে আছে। কিন্তু ঘোড়ার পায়ের ছাপ সব পুরানো। তাই  
বুঝতে পারিনি কোথায় গেছে ওরা।’

কিশোর জানাল, টনির বাবা গেছে ডিনামাইট কিনতে, যাতে গুহার মুখে পড়ে  
থাকা পাথরের স্তুপ উড়িয়ে দিতে পারে। পঞ্চে ডিলার গুহায় চুকতে চায দু’জনে।  
কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন টনির বাবা।

‘ডেজের রাইফেল পেলেন কি করে?’ জানতে চাইল কিশোর।

‘রাতে আমি ঘুমিয়ে থাকার সময় বারোটা ছুটে গেল। আজ সকালে খুঁজতে  
বেরোলাম। গুটাকে তো পাইনি, পেলাম এই রাইফেলটা, একটা ক্যাকটাসের  
গোড়ায়। এতে ডেজের নাম খোদাই করা রয়েছে। ডেজকে দেখলাম না কোথাও।  
মনে হল, এটা একটা ফাঁদ হতে পারে। হয়ত আরেকটা রাইফেল নিয়ে কোথাও  
ঘাপটি মেরে আছে সে। কিংবা বুটের মধ্যে যে ছুরিটা লুকিয়ে রাখে, সেটা হাতে  
নিয়ে। তাড়াতাড়ি চলে এলাম তখন এখানে। কারণ এদিক থেকে তাকে বেরোতে  
দেখেছিলাম।’

হাসল কিশোর। ইসাবেল যখন রাইফেল তুলে নেয়, তখন ডেজের কি অবস্থা  
সেটা ভেবে। ওই লোকটা লুকিয়ে ছিল না, ছিল হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মেঝেতে  
পড়ে। আর কয়েক মিনিট আগে গেলেই সব দেখতে পেত ইসাবেল। রবিন  
যেখানে রাইফেল ছুঁড়ে ফেলেছিল, সেখান থেকে টনির গুহাটা দেখা যায় না।  
সেজন্যেই ওটাও দেখতে পায়নি ওর মা।

আবার হাসি ফুটেছে ইসাবেলের মুখে। ‘কি করে বুঝলে আমিই টনির মা?  
স্প্যানিশ ছাড়া আর কিছু বলিনি আমি। আর এই পোশাকে একটুও আমেরিকান  
মনে হয় না আমাকে।’

শালটা হাতে নিয়ে এক বেনি ধরে টান দিল সে। খুলে চলে এল কালো  
পরচুলা। পকেটে ভরে রেখে আঙুল চালাল সোনালি চুলে।

‘ইনে হচ্ছিল। স্রফ সন্দেহ।’ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর। ‘দুটো  
ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া দরকার। সেদিন রাতে আগুনের ধারে বসে যখন কথা  
বলছিলেন, বার বার হাতের ঘড়িটাকে নিচ থেকে ওপরে ঠেলে তুলছিলেন।  
চামড়ায় হালকা রঙের একটা দাগ দেখেছিলাম...’

নিজের হাত দেখাল কিশোর। এই অভিযানে এসে দীর্ঘ সময় রোদে কাটিয়ে  
চামড়ার রঙ অন্যরকম হয়ে গেছে। হাত ঘড়ি খুলে নিল সে। সর্বক্ষণ ঘড়ি বাঁধা  
থাকায় কজির কাছে একটা রিঙ তৈরি হয়েছে। ওখানটাতে রোদ লাগতে পারেনি,

ফলে চামড়ার আসল রঙ রয়ে গেছে। যেখানে যেখানে রোদ পড়েছে ওখানকার চামড়ার রঙ গাঢ়।

‘মেক্সিকানদের চামড়ার রঙ সাধারণত বাদামী হয়,’ বলল সে। ‘সারাক্ষণ হাতে ঘড়ি বাঁধা থাকলে ওখানকার চামড়ার রঙ বড় জোর বাদামী হবে, সাদা হতে পারে না কিছুতেই। কিন্তু অ্যাংলোদের চামড়া হয়ে যায় ফ্যাকাসে সাদা।’

মাথা ঝাঁকাল ইসাবেল। ‘খুব চালাক ছেলে তুমি। আমার টনির মত।’

‘আমার বদ্বু রবিনের চোখে পড়েছে আরেকটা জিনিস। আপনার কন্টাক্ট লেস। অভিনয় করার সময় অনেক সময় ওসব পরে নেয় অভিনেতারা, ছবিতে তাদের চোখের রঙ বদলে দেয়ার জন্যে। সেটা যখন বলল আমাকে রবিন, সন্দেহটা আপনার ওপর বাড়ল আমার। সূত্রও বলতে পারেন এগুলোকে। মনে হতে লাগল, বাদামীটা আপনার শরীরের স্বাভাবিক রঙ নয়, আর চোখের রঙও মেক্সিকানদের মত গাঢ় বাদামী নয়।’

‘না, তা নয়।’ মাথা নিচু করে লেস দুটো বের করে আনল ইসাবেল। বেরিয়ে পড়ল চোখের আসল রঙ। একেবারে টনির মত, মীল। লেসগুলো একটা প্ল্যাটিকের কেসে ভরে রেখে দিল ফ্লার্টের পকেটে।

‘তাহাড়া,’ কিশোর বলল, ‘আপনাকে ইংরেজি বলতেও শুনেছি আমি। তবে, স্প্যানিশ যখন কথা বলছিলেন, তখন সত্যিই আপনার গলা চিনতে পারিনি। আপনিই আমাকে র্যাক্ষে ফোন করে বলেছিলেন লেকের ওপাড়ের গাঁয়ে যেতে।’

কিশোরের হাত ধরল ইসাবেল। ‘আমি সত্যি দৃঢ়ৰ্থিত। পিরেটো আমাকে ওই বুদ্ধি বলেছিল। আমি কঢ়নাই করতে ‘গারিনি, দাঁড়টা এতটা পচা। আমি তোমাকে খুন করতে চাইনি। কেবল ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিলাম...’

‘যাতে শারিকে নিয়ে এখানে আসতে না পারি?’

মাথা ঝাঁকাল ইসাবেল। ‘আমি আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম। ডজ এসে টনি আর ওর বাবাকে খুঁজে পেলে খুন করতে পারে, এই ভয়ে। পেসোগুলো পাওয়ার জন্যে সব করতে পারে সে।’ থামল মহিলা। ‘এতই ভয় পেয়েছিলাম আমি, আরও বোকায়ি করেছি। বাসে তোমাদেরকে ঠেকাতে চেয়েছি, যাতে র্যাক্ষে চুকতে না পার। তারপর সেদিন রাতে শারিকে চুরির চেষ্টা করেছি। আমার বোৰা উচিত ছিল, ও আমাকে কাছেই যেঁতে দেবে না।’

একটা পাথরের আড়াল থেকে ওয়াকিটকি বের করল ইসাবেল। ফিতে আছে ওটার। কাঁধের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাইফেলটা হাতে তুলে নিল আবার। ‘চলো। টনির গুহায়। ওকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে গেছি আমি।’

‘পিরেটোর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?’ জিজেস করল কিশোর।

‘ও, তাহলে এটা ও জানো! সবই জানো দেখা যায়।’

দুটো বারোকে নিয়ে চলেছে কিশোর। হাসল। ‘অনেক কিছুই অজানা আছে এখনও। এই ধরন, আপনার আসল নাম। ইসাবেল আপনার নাম নয়, তাই না?’

‘না, নেলি। তবে তুম ইসাবেল বলেই ডাকতে পারো।’

আসলে, আমি এমন এক দেশের মানুষ, যেখানে বয়কদের নাম ধরে ডাকার নিয়ম নেই। সেটা অভদ্রতা। আমেরিকায় থাকলে কি হবে, রক্তের টান আর

সামাজিকতা তো ভুলতে পারি না। আপনাকে আমি আন্তি বলেই ডাকব।  
নেলিআন্তি।'

হাসল ইসাবেল। 'আচ্ছা, ডেকো।'

কিশোর আগের কথার খেই ধরল, 'আমি জানি পিরেটোর একটা ওয়াকিটকি  
আছে। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আমিই মেরামত করে দিয়েছি। আর সেদিন রাতে যখন  
আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এলেন আপনি তখন রবিন আপনারটা দেখে  
ফেলেছিল।'

উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ইসাবেল। 'আজ সকালে পিরেটোর সঙ্গে  
যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছি। জবাব নেই। শেষবার যখন কথা বলেছি,  
বেশি দূরে ছিল না সে। বড় জোর একদিনের পথ। এতক্ষণে চলে আসার  
কথা...কিছু হয়েই গেল কিনা...' দ্বিধা করল মহিলা। 'ডজ ওকে দেখে ফেলেছে  
কিনা কে জানে! তাহলে মেরে ফেলবে!'

ডজ জানে পিরেটো ওর পিছু নিয়েছে?'

'না জানলেও আন্দাজ করতে বাধা কোথায়? হতে পারে, এ কারণেই ঘোড়ার  
পা খারাপের ছুতো দিয়ে রয়ে গিয়েছিল পেছনে। তারপর ঘুরে চলে গিয়েছিল,  
পিরেটোর জন্যে ঘাপটি মেরে ছিল কোথাও। আমাকেও দেখে থাকতে পারে।  
একটা বারো আর একজন মেকসিকান মহিলাকে কেয়ারই করবে না সে। কিন্তু  
পিরেটোকে করবে। ঠেকানোর জন্যে খুন করবে।' আবার দ্বিধা করল ইসাবেল।  
'হয়তো করে ফেলেছেও!'

'আপনি অথবা ডয় পাঞ্জেন,' মহিলাকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর।  
'পিরেটোকে আমি চিনেছি। ডজ চালাক, সন্দেহ নেই। পিরেটো তার চেয়েও  
অনেক চালাক। ও অন্য জিনিস।'

'হ্যাঁ,' নিজেকে সাম্ভুনা দেয়ার ভঙ্গিতেই যেন বলল ইসাবেল। 'ঠিকই বলেছে।'

দ্রুত পা চালিয়েছে ওরা। যেতে যেতে কিশোর জানাল, কি করে ডজ তাকে  
ব্যবহার করেছে পঞ্চে ভিলার গুহা খুঁজে দেয়ার কাজে।

টনির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে ইসাবেল, বলল। টেপে রেকর্ড করা 'কথার  
চিঠি' নিয়মিত পাঠায় টনির নামে পর্বতের ওপাশের গাঁয়ে। টনিও তার জবাব  
পাঠায় লস অ্যাঞ্জেলেসে। সুতরাং শারির অঙ্ক হওয়া থেকে শুরু করে পশ্চ ডাক্তারের  
কাছে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব খবরই জানে মহিলা। টনি এ-ও জানিয়েছে, সাবধান  
করে দিয়েছে, ডজ হয়তো শারির সাহায্যে তাকে আর তার বাবাকে খুঁজে বের  
করার চেষ্টা করতে পারে পেসোগুলোর জন্যে।

তারপর পিরেটোর কাছ থেকে একটা চিঠি পায় ইসাবেল। তাতে জানিয়েছে,  
লস অ্যাঞ্জেলেসে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে ডজ। সেখানে কোথায় উঠবে সে,  
তা-ও জানিয়েছে পিরেটো। ক্রসওয়ার্ড পাজল প্রতিযোগিতার কথা ও জানিয়েছে।  
খামের ভেতরে ভরে পাজলের একটা কপি পাঠিয়েছে। লারেটোতে প্রিন্ট করেছে,  
ওটা। পাজলে কি লিখেছে, জানা নেই পিরেটোর। তবে সন্দেহ ঠিকই করেছে, ডজ  
কোন একটা শয়তানীর মতলবে আছে।

'আমি ও প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি,' ইসাবেল বলল। 'তবে ড্যাগউডস

ওয়াইফ কি, বুবেছিলাম। শারির কথা বলতে চেঁয়েছে ডজ। হোটেলটার ওপর নজর রাখতে লাগলাম, যেখানে ডজের ওঠার কথা। কুয়েক দিন পরেই সেখানে গেল ডজ।

তারপর থেকে র্যাঞ্চারের ওপর কড়া নজর রাখতে লাগল মহিলা। একদিন তার পিছু নিয়ে গিয়ে হাজির হলো পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে। গেটের কাছ থেকেই দেখল, অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিশোরের সঙ্গে কথা বলছে লোকটা। গাড়ি একটা ঘোপের আড়ালে রেখে-হেঁটে ফিরে এল ইসাবেল। জঞ্জালের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে চলে গেল কিশোর আর ডজ কি কথা বলছে শোনার জন্যে।

‘তোমাদেরকে কথা বলতে শনলাম,’ ইসাবেল বলল। ‘চমকে গেলাম তোমার গলা শনে। একেবারে টনির গলা।’

দুয়ে দুয়ে চার ঘোগ করতে আরঙ্গ করল তখন মহিলা। অনেক কথাই আন্দাজ করে ফেলল। মেকসিকান রমণীর ছবিবেশে তিন গোয়েন্দাকে অনুসরণ করে চলে গেল লারেটোতে।

‘তোমাদেরকে জীপে তুলে নিতে দেখলাম ডজকে। তখন আমি চলে গেলাম লেকের ওপাশের গাঁয়ে। একটা ঘর ভাড়া নিলাম। ঘোগাঘোগ করলাম পিরেটোর সঙ্গে। বনের ভেতর তোমাদের ওপর চোখ রাখলাম। শারি যখন তোমার কথা শনে তোমার উক্ত হয়ে গেল, কি ঘটতে চলেছে বাকিটা অনুমান করতে আর অসুবিধে হল না আমার।’

মীরবে পথ চলল কিছুক্ষণ দুঁজনে।

‘কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?’ কিশোর জিজ্ঞেস করল।  
‘করো।’

পিরেটোর সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কিভাবে? আপনার আর ডজের মাঝে এমন কি ঘটেছে যে...’

‘একজন আরেকজনকে এতটা ঘৃণা করি, এই তো?’  
‘ইঁ।’

‘তাহলে অনেক আগের কথা বলতে হয়। আমি ছোট থাকতেই আমার মা মারা যায়। একটা মেকসিকান কোম্পা-নিতে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করত আমার বাবা। মা মারা যাওয়ার পর আমাকে মেকসিকোতে নিয়ে গেল। বাবা থাকত খনির কাজে ব্যস্ত, ওই সময়টাতে আমাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসত পিরেটো। ওই র্যাঞ্চের মালিক ছিল তখন সে। ভালই অবস্থা ছিল তার। গরু পালত, ঘোড়া পালত। একদিন এল ডজ...’

‘র্যাঞ্চটা নিয়ে নিল পিরেটোর কাছ থেকে।’ ডজের অফিসে দেখা দলিলগুলোর কথা মনে পড়ল কিশোরের।

‘ইঁ। অনেক র্যাঞ্চারের মতই ব্যাংক থেকে, টাকা ধার নিয়ে কাজ চালাত পিরেটো। ঝণ-পত্রগুলো কিনে নিল ডজ। শেষ চেষ্টা করতে চাইল পিরেটো। গরু-ঘোড়া বিক্রি করে ধার শোধ করতে চাইল। সে সুযোগ দেয়া হলো না তাকে। র্যাঞ্চ দখল করে নেয়া হলো। আমি গেলাম তখন আদালতে, পিরেটোকে সাহায্য করতে। লাভ হলো না। ওখানেও ঘৃষ্ণুর লোক আছে। তাদেরকে টাকা দিয়ে

ওয়ার্নং বেল

বশ করল ডজ। শেষ 'পর্যন্ত র্যাপ্ট' হারাতেই হলো পিরেটোকে।'

নিচের উপত্যকার দিকে তাকাল কিশোর। সেখান থেকে দষ্টি ছড়িয়ে দিল ওপারের পর্বতের দিকে। সে আশা করল, ইসাবেলের অনুমান ভুল, খানিক পরেই এসে হাজির হবে পিরেটো।

কিন্তু তার কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না। আসছে না।

গরম লাগল। যেন আগনের আঁচ। হঠাৎ করেই ঘটল ঘটনাটা। বাতাসে কোন রকম জানান দেয়নি। বদলে যেতে শুরু করেছে পরিবেশ।

গরম বাঢ়ছে। অঙ্ককার হয়ে আসছে।

ওপরে তাকাল কিশোর। ছড়িয়ে পড়েছে ধূসর রঙের মেঘ কেঁপে উঠল পায়ের নিচের মাটি। পর্বতের চূড়াটা দেখতে পাচ্ছে। তীব্র গতিতে সেখান থেকে ওপরে উঠে গেল একবলক ধোয়া। এর আগে দুবার দেখেছে ধোয়া, তার চেয়ে অনেক ঘন এখনকার ধোয়া, এবং কালো।

বুবো ফেলল ব্যাপারটা। ইস, গাধা হয়ে ছিল নাকি এ ক'দিন! নিজেকেই লাখি মারতে ইচ্ছে করল তার। আরও আগেই বোধা উচিত ছিল। মুসা তো প্রশ্নই তুলেছিল, মেঘটা অন্য রকম কেন? তারমানে, ওগুলো ধোয়া নয়, মেঘও নয়, বাস্প।

'আগ্নেয়গিরি!' কথা সরছে না যেন কিশোরের গলা দিয়ে।

ওর হাত আঁকড়ে ধরল ইসাবেল। টেনে দাঁড় করাল। কপালের ওপর হাত নিয়ে এসে সে-ও তাকিয়ে রইল চূড়ার দিকে।

'হ্যা,' ফিসফিসিয়ে বলল, 'আগ্নেয়গিরি! সিয়েরা মাদ্রেতেও আছে, জানতাম না। হাওয়াইতে দেখেছি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত। জানি কি ঘটে। এটা ফাটতে যাচ্ছে!'

## পনেরো

উৎকষ্টিত হয়ে কিশোরের অপেক্ষা করছে টনি, রবিন আর মুসা। উভেজনাটা এতই ভারি লাগছে, ওদের মনে হচ্ছে গৌইতি দিয়েও ছিন্দ করা যাবে না। বকবক করছিল টনি আর রবিন সময় কাটানোর জন্যে, এখন সেটাও বন্ধ। ভাবছে, কতক্ষণ আর ডজকে ওভাবে রাখতে পারবে? বাঁধন খোলার জন্যে মোড়া-মুড়ি করছে আর চেচাচ্ছে লোকটা।

ঘড়ি দেখল মুসা। 'দুই ঘণ্টা হয়ে গেল! আর কত?' সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় চলে এল, দেখার জন্যে, কিশোর আসছে কিনা।

চিৎকার থামিয়ে চুপ হয়ে গেল ডজ। যেন বুবো গেছে, এসব করে কোন লাভ হবে না। যে ভাবে বাঁধা হয়েছে, তাতে শোয়ার চেয়ে বসে থাকাটা সহজ এবং আরামের মনে হলো বুঝি তার কাছে।

'টনি,' অনুনয় করল ডজ, 'আমাকে এক গেলাস পানি দেবে? গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঢোক গিলতে পারছি না।'

পরম্পরের দিকে তাকাল রবিন আর টনি।

মাথা ঘাঁকাল রবিন।

‘দিছি,’ টনি বলল। উঠে গিয়ে মাটির জগটা নিয়ে এল ডজের কাছে।

রবিন যেখানে বসেছে সেখান থেকে ভালমত দেখতে পেল না এরপর যা ঘটল। ডজের মুখের কাছে টনিকে জগটা তুলতে দেখল সে। পরমুহূর্তেই মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল জগ। টনির গলার পাশে ছুরি চেপে ধরেছে ডজ।

বাধন খুলে ফেলেছে ডজ। দড়ির কটা টুকরো ঝুলছে কাজি আর গোড়ালি থেকে।

‘গাধার দল! হা হা করে বুঝি হাসল ডজ। আমাকে ধরার পর সার্চ করা উচিত ছিল। করোনি। বুটের ভেতর ছুরিটা রয়ে গেছে দেখনি।’

আরেকটু বাড়াল ছুরির চাপ। নড়লেই গলার প্রধান রক্তবাহী শিরা জুঁগলার ভেইন কেটে দেয়ার হৃষ্মক দিল।

‘রবিন,’ কর্কশ গলায় ডাকল ডজ। ‘টনির রাইফেলটা নিয়ে এসো। জলাদি করো।’

থামোকা হৃষ্মকি দিছে না লোকটা। কথা না শনলে ঠিকই কেটে দেবে টনির শিরা। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে রাইফেলটা। তুলে নিয়ে ডজের দিকে এগোল রবিন।

‘রাখ ওখানেই,’ ডজ বলল। ‘আর এগোনোর দরকার নেই।’

ডজের কঠস্বরে এমন কিছু রয়েছে, বরফের মত জমে গেল যেন রবিনের রক্ত। টনিকে খুন করার একটা ছুতো খুঁজছে কেবল র্যাথ্তার। রাইফেলটা হাত থেকে ছেড়ে দিল রবিন।

টনির গলায় ছুরি চেপে রেখেই হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা তুলে নিল ডজ। লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল এক পা। ছুরিটা কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল। সেফটি ক্যাচ অফ করে দিয়ে বোল্ড টানল রাইফেলের। কঠিন গলায় আদেশ দিল, ‘যাও, সরো এবার। দেয়ালের দিকে মুখ করে হাত তুলে দাঢ়াও।’

‘কিশোরকে দেখলাম না। তবে অন্তুত কিছু একটা...’

বলতে বলতে গুহায় চুকল মুসা। মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে দেখল, দেয়ালের দিকে মুখ করে হাত তুলে দাঢ়িয়েছে রবিন।

‘হচ্ছেটা কি...’ এবারেও কথা শেষ করতে পারল না মুসা। চোখ পড়ল ডজের ওপর। ওর হাতে রাইফেল। তাক করে রেখেছে মেঝেতে বসা টনির দিকে। মুসার দিকে ঘূরল মলটা। ‘বাহ, এসে গেছ। যাও, তুমিও যাও দেয়ালের কাছে।’ টনিকে ধর্মক দিল, ‘এই, তুমি বসে রাইলে কেন?’

রবিন জানাল মুসাকে, ‘ওর বুটের ভেতর ছুরি ছিল। সেটা দিয়ে...’

‘চুপ!’ ধর্মক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল ডজ। মুসা আর টনিকে আবার যেতে বলল দেয়ালের কাছে।

এতই রাগ লাগছে মুসার, একটা মুহূর্তের জন্যে ভাবল, রাইফেলের পরোয়া না করে ছুটে যাবে কিনা। আবছ অঙ্ককারে ছুট্ট একটা নিশানাকে মিস করতেও পারে ডজ। পরম্পরাগেই বাতিল করে দিল ভাবনাটা। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঢ়াল দেয়ালের কাছে। তার পাশে এসে দাঢ়াল টনি।

‘এবার কি করব?’ ফিসফিস করে বলল মুসা।

‘কিশোর না আসাতক এভাবেই থাক,’ ফিসফিস করেই জবাব দিল রবিন।

ওনে ফেলল ডজ। ‘হ্যাঁ, থাক ওভাবেই। একদম নড়বে না।’ খিকখিক করে হাসল সে। ‘নড়েচড়ে দেখতে পারো অবশ্য। তিনজনের খুলিতে তিনটে গুলি ঢোকাতে পারলে খশিই হব এখন আমি। বামেলা শেষ।’

রাইফেলের পুরুষকে কিছু করার নেই। চূপ হয়ে গেল ওরা।

‘এখন যা বলি, শোনো,’ ডজ বলল আবার। ‘যদি বাঁচতে চাও। টনি, জোমাকে প্রশ্ন করব। ঠিকঠিক জবাব দেবে। নইলে গুলি খাবে তোমার বক্সুরা।’

চূপ করে আছে টনি।

‘তোমার বাবা কোথায়?’

ঘিধা করছে টনি।

‘এদিকে ফের।’ আদেশ হলো কর্কশ কঠে।

ঘূরল টনি। দেখল, ডজের আঙুল চেপে বসছে ট্রিগারে।

‘পর্বতের ওপাশের গাঁয়ে গেছে,’ জবাব দিল টনি।

‘কখন ফিরবে?’

মিথ্যেটা বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ থেকে, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল টনি। ডজ যদি বুঝে ফেলে মিছে কথা বলছে সে, রবিন আর মুসার বিপদ হয়ে যাবে।

‘আরও দু’দিন লাগবে।’

‘পথে ভিলার গুহাটা পেয়েছ?’

‘পেয়েছি।’

‘ওটাই যে সেই গুহা কি করে বুঝলে?’

ভিলার সৈন্যদের একজনের কঙ্কাল পেয়েছি ওখানে।’

‘হ্যাঁ। এক কাজ করো। দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল তোমার বক্সুদের। আমাকে যেমন বাঁধা হয়েছিল, তেমন করে।’

গুহার একধার থেকে গিয়ে দড়ি বের করে আনল টনি।

‘মুসা,’ আদেশ দিল ডজ, ‘হাঁটু গেড়ে বসো। হাত আন পিঠের ওপর।’

নড়ল না মুসা। গটমট করে তার কাছে এসে দাঁড়াল ডজ। রাইফেলের নল ঠেকাল ঘাড়ে। ঠাণ্ডা ইস্পাতের স্পর্শে শিউরে উঠল মুসা। ঢোক গিলল।

‘জলন্দি করো।’

বিড়বিড় করে নিজেকেই একটা গাল দিল মুসা, অসতর্ক হয়েছিল বলে। হাঁটু গেড়ে বসে পিঠের ওপর হাত নিয়ে এল।

চিল করে বাঁধল প্রথমে টনি। কিন্তু ফাঁকিটা ধরে ফেলল ডজ। শক্ত করে বাঁধার জন্যে ধমক লাগাল ওকে।

রবিনকেও বাঁধা হলো।

ডজ বলল, ‘এবার কিছু প্রশ্নের জবাব জানা দরকার আমার।’

‘বাঁধাই তো আছি,’ রাবিন বলল। ‘আর জবাব দিয়ে কি হবে?’

হেসে উঠল টনি আর মুসা।

‘চূপ!’ চেঁচিয়ে উঠল ডজ। রাইফেলের নল দিয়ে খোঁচা মারল রবিনের বুকে।

ରାଗେ ଜୁଲେ ଉଠିଲ ରବିନେର ଚୋଥ । କିଛି ବଲଲ ନା । ଦାତେ ଦାତ ଚେପେ ସହ୍ୟ କରଲ ।

‘କିଶୋର ଗେଛେ କୋଥାୟ?’ ଜାନତେ ଚାଇଲ ଡଜ ।

‘ଆମରା ଓ ତୋ ମେ କଥାଇ ଜାନତେ ଚାଇଛି,’ ମୁସା ବଲଲ । ‘ବୋଧହୟ ପିଜାଟିଜା କିନତେ ଗେଛେ ।’

‘ବାଜେ କଥା ରାଖ !’

ଡଜେର ଚେହାରା ଦେଖିତେ ପାଛେ ଟନି । ଜବାବ ନା ପେଲେ ଅନର୍ଥ ଘଟାବେ ଓହି ଲୋକ, ବୁଝିତେ ଅସୁବିଧେ ହଞ୍ଚେ ନା ତାର । ମେ ତଥନ ବଲଲ, ‘ଇସାବେଲେର ଖୋଜେ ।’

‘ଇସାବେଲ କେ ?’

‘ଆମରା ଜାନି ନା । ଶୁଦ୍ଧ ଜାନି, ମହିଳା ମେକସିକାନ ।’ ତିନ ଗୋଯେନ୍ଦାର କାହେ ଯା ଶୁନେଛେ, ମେଭାବେ ଚେହାରାର ବର୍ଣନ ଦିଲ । ‘କଯେକ ଦିନ ଧରେ ନାକି ଓଦେରକେ ଅନୁସରଣ କରେ ଏମେହେ । ଆଜ ସକାଳେ ତାର ବାରୋଟାକେ ଦେଖେଛି ଶୁହାର ବାଇରେ । କାଜେଇ ଶାରିର ସାହାଯ୍ୟ ଓଟାକେ ନିଯେ ଗେଛେ କିଶୋର ଇସାବେଲକେ ଖୁଜେ ବେର କରାର ଜଣ୍ୟେ ।’

‘ବନ୍ଦୁକ-ଟନ୍ଦୁକ ଆହେ ମହିଳାର କାହେ ?’

ଦ୍ରୁତ ଭାବାହେ ଟନି । ଆହେ, ସେଟା ବଲା କି ଠିକ ହବେ? ଓରା ତୋ ନିଶ୍ଚିତ ନୟ । ବଲଲ, ‘ଆମରା ଜାନି ନା ।’

‘ବେଶ । ସତର୍କ ଥାକତେ ହବେ ଆରକି ଆମାକେ । କାଳୋ ଚୁଲେର ବେନି ।’ ରାଇଫେଲଟା ରବିନେର ଦିକ ଥିକେ ଟନିର ଦିକେ ଫେରାଲ ଡଜ । ‘ଆମାକେ ଭିଲାର ଶୁହାୟ ନିଯେ ଚଳ । କୋନ ଚାଲାକିର ଚେଷ୍ଟା କରବେ ନା । ଆମି ତୋମାର ପେଚନେଇ ଥାକବ ।’

ଓହା ଥିକେ ବୈରିଯେ ଗେଲ ଦୁଃଖନେ । ସୁଡ୍ଧେ ଓଦେର ଜୁଡ଼ୋର ଶକ୍ତ ଶୋନା ଗେଲ ।

ପଦଶକ୍ତ ମିଲିଯେ ଯା ଓ୍ଯାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଧନ ଖୋଲାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲାଲ ଦୁଇ ଗୋଯେନ୍ଦା ।

‘ହାତ ଖୁଲତେ ପାରବେ ?’ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ ମୁସା ।

‘ହିଡ଼ିନିର ଯତ ଜାଦୁ ଜାନଲେ ପାରତାମ । ତୁମି ?’

‘ଏକଇ ଅବଶ୍ଵା । କିଶୋରଟା ଯେ କୋଥାୟ ଗେଲ !’

‘ଚଲେ ଆସବେ ଠିକମତଇ, ଦେଖୋ । ଓକେ ବୋକା ବାନାନୋ କଠିନ । ସବ ସମୟରେ ଏକଟା ନା ଏକଟା ବୁନ୍ଦି ବେର କରେ ଫେଲେ । ଡଜକେ ଦେଖେ ଫେଲଲେଇ ଆନ୍ଦାଜ କରେ ଫେଲବେ କି ଘଟେଛେ । ତାହାଡା ତାର ସଙ୍ଗେ ରଯେଛେ ଶାରି । ଆଗେ ଥିକେଇ ହଂଶିଯାର କରେ ଦିତେ ପାରବେ କିଶୋରକେ ।’

‘ତା ବଟେ । ...ଆଛା, ଏକଟା ଗନ୍ଧ ପାଛ ?’

ନାକ କୁଚକେ ଷ୍ଟାମ ଟାନଲ ରବିନ । ‘ମନେ ହ୍ୟ ପଚା ଡିମେର ।’

‘ବାଇରେ ଅନ୍ତରୁ କିଛି ଘଟେଛେ,’ ମୁସା ବଲଲ । ‘ଆମି ଯେ ତଥନ ବାଇରେ ଗିଯେଛିଲାମ, ଦେଖି, କାଳୋ ହ୍ୟ ଗେଛେ ସବ କିଛି । ଯେନ ରାତ ନାମହେ ପର୍ବତେ । ଧୋଯା ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିଛେ ସମସ୍ତ ଆକାଶେ । ...ହ୍ୟା, ଠିକଇ ବଲେଇ, ପଚା ଡିମେର ମତଇ ଗନ୍ଧ ।’

‘ଆଗେ ଓ କଯେକବାର ଧୋଯା ଦେଖେଛି, ମନେ ଆହେ ?’ ଆଚମକା ଚିତ୍କାର କରେ ବଲଲ ରବିନ, ‘ପଚା ଡିମ ନୟ, ଗନ୍ଧକ ! ଆଗ୍ରେଯଗିରିତେ ଥାକେ ! ଖୋଦା, ଏକଟା ଜ୍ୟାନ୍ତ ଆଗ୍ରେଯଗିରିର ଓପରେ ବସେ ଆହି ଆମରା !’

କୋଟର ଥିକେ ବୈରିଯେ ଆସବେ ଯେନ ମୁସାର ଚୋଥ । ‘ଖାଇଛେ ! ଏହି ଶୁହାୟ ଥାକଲେ ଆମଦେର ତୋ କିଛି ହବେ ନା ! କିନ୍ତୁ କିଶୋରର ? ମେ ତୋ ରଯେ ଗେଲ ବାଇରେ !’

## ଶୋଲୋ

'ଶୟେ ପଡ଼ନ!' ବଲେ ଉଠିଲ କିଶୋର । 'ଜଳଦି! ଶୟେ ପଡ଼ନ!'

ଆଗ୍ରେସିଗିରିର ମୁଖ ଥିକେ ଭଲକେ ଭଲକେ ଉଠିଛେ କାଳୋ ଧୋଯା । ସେଦିକେ ତାକିଯେ ରଯେଛେ ଇସାବେଲ । କାଳୋ କୁଯାଶାର ମତ ଚେକେ ଫେଲେଛେ ପର୍ବତେର ଚଢ଼ା । ମହିଳାର ହାତ ଧରେ ଟେନେ ତାକେ ଏକଟା ବଡ଼ ପାଥରେର ଆଡ଼ାଲେ ନିଯେ ଗେଲ ମେ ।

'କି ହେଁଥେ?'

'ଆପ୍ତେ ବଲୁନ!' ଫିସଫିସିଯେ ବଲଲ କିଶୋର । 'ଡଜ!'

କିଛୁ ଛାଇ ଧରେ ପଡ଼ିଲ ଆକାଶ ଥିକେ । ଜୋରାଲ ବାତାସ ବହିଛେ । ଧୋଯା ସରିଯେ ନିଚ୍ଛେ । ବାତାସେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଗନ୍ଧ । ସାବଧାନେ ମାଥା ବେର କରେ ଉଁକି ଦିଲ କିଶୋର । ଆଧ ମାଇଲ ମତ ଦୂରେ ରଯେଛେ ର୍ୟାଞ୍ଚାର । ଏଦିକେଇ ଆସଛେ । ମେ ଏକ ନଯ ।

ଓର ଆଗେ ଆଗେ ହାଁଟିଛେ ଟନି । ଘାଡ଼େର ପେଛନେ ଦୁଇ ହାତ ତୋଳା । ପିଟେର ଦିକେ ରାଇଫେଲ ତାକ କରେ ରେଖେଛେ ଡଜ ।

'ଟନି!' ଇସାବେଲାଙ୍କ ଦେଖେଛେ ଛେଲେକେ ।

ହାତ ଚେପେ ଧରେ ତାକେ ଆଟକେ ରାଖାତେ ହଲୋ କିଶୋରକେ । ନଇଲେ ଛୁଟେ ବେରିଯେ ଯାଛିଲ ମହିଳା ।

'ଓଭାବେ ହବେ ନା,' ନିଚୁ ସ୍ଵରେ ବଲଲ କିଶୋର । 'ଟନିକେ ବାଁଚାତେ ପାରବେନ ନା । ଗୁଲି ଥାବେନ ଡଜର ।'

ଯେ-କୋନ ମୁହଁର୍ତ୍ତେ, ଭାବହେ ମେ, ବାରୋ ଦୁଟୋକେ ଦେଖେ ଫେଲତେ ପାରେ ଡଜ । ଟନିର ଓପର କଡ଼ା ନଜର ନା ଥାକଲେ ଏତକ୍ଷଣେ ଦେଖେ ଫେଲତ ।

ରାଇଫେଲ ତୁଳିଲ ଇସାବେଲ । 'ଓର ହାତେ ଗୁଲି କରାର ଚେଷ୍ଟା କରି ।' ବାଁଟ ଟେକାଲ କାଁଧେ । ନଲ ରାଖିଲ ପାଥରେର ଓପର ।

ସାବଧାନେ ନିଶାନା ଠିକ କରଲ ମେ । ଟିଗାରେ ଚେପେ ବସତେ ଶର୍କ କରଲ ଆଙ୍ଗଲ । ଟିପେ ଦିଲ ପୁରୋପୁରି ।

ଗୁଲିର ଶଦେର ଅପେକ୍ଷା କରଛେ କିଶୋର । କିଛୁଇ ଘଟିଲ ନା । ବେରୋଲ ନା ଗୁଲି ।

ଆବାର ଟିଗାର ଟିପିଲ ଇସାବେଲ । ହଲୋ ନା କିଛୁ ଏବାରେଓ । ଆବାର ଟିପିଲ । ଆବାର ।

'ମେଫଟି କ୍ୟାଚ!' କିଶୋର ବଲଲ । 'ଅନ କରା ଆହେ ।'

ଦ୍ରୁତ ହାତେ କ୍ୟାଚ ଅଫ କରେ ଦିଲ ଇସାବେଲ । ଆବାର ନିଶାନା କରଲ । କିନ୍ତୁ ଦେଇ ହେଁ ଗେଛେ । ବାରୋ ଦୁଟୋକେ ଦେଖେ ଫେଲେଛେ ଡଜ । ଲାଫିଯେ ଏସେ ଟନିର କାଁଧ ଚେପେ ଧରଲ । ଓର ଶରୀର ଦିଯେ ଆଡ଼ାଲ କରଲ ନିଜେକେ ।

ରାଇଫେଲ ନାମାଲ ଇସାବେଲ । ମୃଦୁ କଷ୍ଟେ ଶ୍ପ୍ୟାନିଶ ଭାଷାଯ କି ବଲଲ, ବୋକା ଗେଲ ନା । ଗାଲଇ ଦିଲ ବୋଧହ୍ୟ ।

ବେଲ୍ଟ ଥିକେ ଛୁରି ଖୁଲେ ନିଲ ଡଜ । ଟନିର ପିଟେ ଟେକାଲ । ଓକେ ହାଁଟିତେ ବଲେ ନିଜେଓ ପା ବାଡ଼ାଲ ପେଛନେ ।

ଇସାବେଲର କାଁଧର ଓ୍ୟାକିଟକିଟା ନିଜେଇ ଖୁଲେ ନିଲ କିଶୋର । ସୁଇଚ ଅନ କରଲ ମେସେଜ ପାଠାନ୍ତେର ଜନ୍ୟେ । ଟେଟେର କାହେ ଧରେ ବଲଲ, 'ପିରେଟୋ! ପିରେଟୋ! ଶନତେ

পাছেন?’ স্প্যানিশ ভাষায় বলল সে। ‘পিরেটো! কাম ইন! ওভার!’

বিসিভ করার জন্যে সুইচ টি প্ল। নীরবতা।

পরের একটা মিনিট চেষ্ট চালিয়ে গেল কিশোর। একশ গজ দূরে আছে আর ডজ এগিয়ে আসছে। টনির পিঠে ছুরি টেকানো।

ওয়াকিটকি নামিয়ে রেখে ইসাবেলের বাহতে হাত রাখল কিশোর। আপনার উইগ পরে নিন।

আড়াতড়ি পকেট থেকে পরচুলা বের করে পরে নিল ইসাবেল।

দশ গজ দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল ডজ।

ইসাবেল, বেরিয়ে আসুন, ডাক দিল সে।

নতুল না ইসাবেল।

‘ভয় পাবেন না,’ স্প্যানিশ ভাষায় বলছে ডজ। আমি জানি ওই পাথরের আড়ালেই আছেন আপনি। ছেলেরা আপনার কথা সব বলেছে আমাকে। আমাদেরকে অনুসরণ করে আপনি এসেছেন এখানে। আমার রাইফেলটা ও পেয়েছেন। যা হবার হয়েছে। আসুন। দেখি, একটা রফায় আসতে পারি কিনা আমরা।’

উঠে দাঁড়াল ইসাবেল। দুইতে চেপে ধরেছে রাইফেল।

কিশোর বসেই রাইল। ভাবছে, মুসা আর রবিনকে কোন ভাবে কাবু করে ফেলেছে র্যাঞ্চার। বোধহয় ওই ছুরি দিয়েই বাঁধন কেটে ফেলেছিল। যেটা টেকিয়ে রেখেছে টনির পিঠে। তবে যতক্ষণ ডজ না জানছে সে এখানে রয়েছে, ততক্ষণ চমকে দেয়ার একটা আশা রয়েছে। হয়ত সুযোগ বুঝে কাবু করে ফেলতে পারবে লোকটাকে।

রাইফেলের ট্রিগারে ইসাবেলের আঙুল।

আপনাকে আমি চিনি। ইসাবেল বলল, সিনর মরিস। পথে ভিল্যুর পেসোর খোজে এসেছেন।

ঠিকই ধরেছেন, স্বীকার করল ডজ। আপনি ও এসেছেন সেজন্যোই।

মাথা বাঁকাল ইসাবেল। আমি জানি কোথায় লুকানো আছে ওগুলো। আপনি জানেন না।

‘জেনে যাব।’ টনিকে টেলা দিল ডজ চলার জন্যে, নিজেও এগোল। ‘এই ছেলেটা আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে ও আর ওর বাবা মিলে জায়গাটা বের করে ফেলেছে।’

‘ভুল বলেছে আগে জানত, এখন আর জানে না। কাল আমি গুহাটা পেয়ে গিয়ে পেসোগুলো সরিয়ে ফেলেছি। ছুরিটা সরান। তারপর, আসুন কথা বলি, দেখি কি করা যায়।’

‘বেশ।’ ছুরিটা বেল্টে গুঁজল, আবার ডজ। ‘দু’জনেই আমরা সমান সমান অবস্থায় আছি। দু’জনের কাছেই রাইফেল। তবে পেসোগুলো এই এলাকা থেকে সরাতে হলে আপনাকে আমার সাহায্য নিতেই হবে।’ পর্বতের চূড়ার দিকে তাকাল সে, ‘ওটোও আর সময় পেল না আঙুন ছিটানোর।’

এখনও এগোছে ডজ, ধীরে ধীরে, টনিকে বর্ম বানিয়ে।

‘থামুন!’ কড়া গলায় বলল ইসাবেল। কিন্তু বিপদটা আঁচ করতে দেরি করে ফেলেছে।

ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডজ। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ‘তুমি! ইংরেজিতে বলছে সে এখন, ‘মেকসিকান উইগ দিয়ে বোকা প্রায় বানিয়ে ফেলেছিলে! কিন্তু ওই নীল চোখ লুকাবে কোথায়, নেলি?’

কন্টার্ট লেস লাগাতে ভুলে গিয়েছিল ইসাবেল।

তারপর পলকে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা।

রাইফেল তুলতে শুরু করল ইসাবেল। লাফিয়ে একপাশে সরে গেল ডজ। নিশানা করল ইসাবেলের দিকে।

গুলির শব্দ শুনল কিশোর।

ডজের হাত থেকে যেন উড়ে চলে গেল রাইফেলটা। পাঁচ গজ দূরে পাথরের ওপর গিয়ে পড়ল।

লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে একটানে লোকটার কোমরে গেঁজা ছুরি কেড়ে নিল কিশোর।

খটাখট খটাখট শোনা গেল খুরের শব্দ। ঘোড়া ছুটিয়ে এল পিরেটো। হাতে একটা ৪.৫ ক্যালিবারের কোল্ট পিস্টল। সেটা তাক করল ডজের দিকে। ছাঁশিয়ার করল, ‘পরের বার আর বাঁটে সই করব না, মাথায় করব।’ ইসাবেলের দিকে তাকাল। মহিলাও তার রাইফেল তাক করে রেখেছে ডজের দিকে। এইবার সেফটি ক্যাচ অফ করা আছে।

‘গুলি করো না,’ ইসাবেলকে বলল পিরেটো। ‘ছেড়ে দাও। গুলি করে মারলে লাশ কবর দেয়ার সময়ও পাব না। আর কবর না দিতে পারলে, খোলা জায়গায় শকুনের খাবার বানিয়ে রেখে গেলে অভিশাপ লাগবে আমাদের ওপর।’

ডজের দিকে তাকাল সে। চিংকার করে বলল, ‘যাও, ভাগ! গিয়ে খুঁজে বের করো তোমার পেসো।’

কালো হয়ে গেছে ডজের মুখ, রাগে। চোখে তীব্র ঘৃণা।

‘যাও! যাচ্ছ না কেন?’ স্প্যানিশ ভাষায় আবার ধমকে উঠল পিরেটো। ‘পথে ভিলার গুহায় যাও। টিনিকে সঙ্গে নেয়ার আর দরকার নেই। ওটাতে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট চিঙ্গ দেখতে পাবে। পায়ের ছাপের ছড়াছড়ি এখন ওপথে।’

এক সেকেন্ড পিরেটোর দিকে তাকিয়ে রইল ডজ। ওর চোখে খুনীর দৃষ্টি দেখতে পেল কিশোর। কিন্তু কিছু করার নেই। পুরোপুরি অসহায় এখন। গুলি করে ওর রাইফেলের বাঁট ভেঙে দিয়েছে পিরেটো। ছুরি কেড়ে নিয়েছে কিশোর। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ভিলার গুহাটা যেদিকে রয়েছে সেদিকে।

পরম্পরকে জড়িয়ে ধরল মা-ছেলে। ঘোড়া থেকে নামল পিরেটো। হতচাড়া এই ওয়াকিটকি! কাল রাতে হাত থেকে পড়ে গিয়ে আবার নষ্ট হয়ে গেছে। শব্দই বেরোচ্ছে না।’

চূড়ার দিকে তাকাল কিশোর। আরেক ভলক কালো ধোঁয়া বেরোল।

‘রবিন আর মুসাকে বের করে আনা দরকার,’ বলল সে। ‘গুহায় আটকা

থাকলে ঘরবে।'

মুখের ভেতর দুই আঙ্গুল পূরে জোরে শিস দিল পিরেটো। ঢালের ওপাশ থেকে ছুটতে ছুটতে এল আরেকটা ঘোড়া। চিনতে পারল কিশোর ডজ ওটাতে করেই এসেছিল।

'ওটাকে বাঁধা দেখলাম,' পিরেটো জানাল। 'খুলে নিয়ে এসেছি। চলো, জলদি চলো, পালাই এখান থেকে।'

কিশোর চড়ল শারির পিঠে। ইসাবেল তার নিজের বারোতে, আর টনি চড়ল ডজের ঘোড়ায়। আগে আগে রওনা হলো কিশোর, টনির গুহার দিকে।

গুহা থেকে শ'খানেক গজ দূরে থাকতে কি যেন এসে বিধল কিশোরের গালে। তারপর হাতে। কপালে হাত রেখে ওপরে তাকাল সে।

পাথর-বৃষ্টি হচ্ছে!

খুদে পাথর ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। একটা পড়ল কাঁধে। ফেলার চেষ্টা করল ওটাকে সে। ছ্যাকা লাগল হাতে। কিছুতেই শার্ট থেকে খুলতে না পেরে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। পাথর নয়। ছোট একটা কাচের পুঁতি, আঙুনের মত গরম।

পাহাড়ের চূড়ায় ঘটেছো কি? দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। তবে সাংঘাতিক বিপদ যে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শারিকে আরও জোরে চলার তাগাদা দিল কিশোর। পেছনে উনতে পাছে ঘোড়াগুলোও চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। মিনিট খানেক পরেই দেয়ালের মত ঢালটার কাছে চলে এল ওরা। থামল।

জিনের নিচে ভাঁজ করে রাখা কম্বলটা বের করল পিরেটো। ছুরি দিয়ে কেটে ফালা ফালা করতে লাগল।

ততক্ষণে রওনা হয়ে গেছে কিশোর। তাকে ডেকে বলল পিরেটো, 'তাড়াতাড়ি আসবে।'

সুড়ঙ্গে চুকল কিশোর। গুহায় এসে দেখল, পিঠে পিঠ লাগিয়ে বাঁকা হয়ে আছে মুসা আর রবিন। মুসা সবে রবিনের বাঁধনের একটা গিঁট খুলেছে।

ডজের ছুরি দিয়ে দ্রুত ওদের বাঁধন কেটে মুক্ত করল কিশোর।

'আমি তো ভেবেছি পিজা কিনতে দেরি করছ।' হাত-পা ছড়িয়ে, ঝাড়া দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিতে লাগল মুসা। 'তারপর? কোথায় দোকানটা?'

রবিনও মুসার মতই হাত-পা ঝাড়ছে। তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের মাথার দিকে। 'ব্যাপার কি? মাথায় পুঁতি পরার শখ হলো কেন হঠাৎ?'

চুলে আঙ্গুল চালিয়ে ওগুলো ফেলার চেষ্টা করল কিশোর। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে পুঁতির মত জিনিসগুলো, কিন্তু আটকে গেছে এমন করে, আঙ্গুল দিয়ে চিরুনি চালিয়ে কিছুতেই সরাতে পারল না। 'আকাশ থেকে পড়ল। গরম কাচের টুকরো। এসো, বেরোও, জলদি।'

সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে মাথা নিচু করে প্রায় দৌড়ে বেরোল ওরা। কাচ-বৃষ্টি বৰ্ক হয়েছে আপাতত। কম্বলের লম্বা কয়েকটা টুকরো ওদেরকে দিয়ে বলল পিরেটো, 'নাও, মাথায় জড়াও। হাতেও পেঁচিয়ে নাও। খোলা রাখবে না।' ওর নিজের

মাথায় আর হাতে ইতিমধ্যেই জড়ানো হয়ে গেছে

লাল শালটা দিয়ে মাথা আর কাঁধ চেকেছে ইসাবেল।

‘চলো, এবার যাই,’ তাগাদা দিল পিরেটো।

কাউকে বলতে হলো না। মুসা চড়ে বসল টনির পেছনে। রবিন পিরেটোর।

এই বার আগে আগে চলল মেকসিকান। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে জোরে চলা বিপজ্জনক, কিন্তু পরোয়া করল না সে, বার বার তাগাদ দিতে লাগল ঘোড়াকে। নেমে চলল নিচের উপত্যকার দিকে। যে নালাটা পাহাড়ের ঢালে গভীর খাঁজ সৃষ্টি করে নেমেছে, সেটাতে নেমে আরও তাড়াতাড়ি চলার নির্দেশ দিল পিরেটো। পেছনে ভারি একটা গুড়গুড় শোনা গেল, মেঘ ডাকার মত। বাতাসে গন্ধকের গন্ধ বেড়ে গেছে, খাস নেয়াই কঠিন।

মালায় নামার খানিক পরেই ঘটল ঘটনাটা। আধ মাইল দূরেও নেই আর গুহাটা, এই সময় পেছনে ফেটে পড়ল যেন আগ্নেয়গিরি। মুসার মনে হলো, বিকট শব্দে বিক্ষেপিত হয়ে গেছে গোটা পর্বত।

চূড়া থেকে খাড়া উঠে গেল গরম গলিত লাভা, ফোয়ারার মত করে পড়তে লাগল। আরও লাভা ছিটকে উঠল ওপরে। পড়ল, উঠল। প্রতিবারেই আরও বেশি ওপরে উঠে যাচ্ছে। ওপরে উঠে এমন করে ছড়াচ্ছে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে বাজি পোড়ানো হচ্ছে। অসংখ্য বোমা ফাটার মত শব্দ হচ্ছে জ্বালামুখের ভেতরে। কানে তালা লাগানোর জোগাড়। শব্দ যে লাভা বেরোচ্ছে তা নয়, সাথে করে পর্বতের গভীর থেকে নিয়ে আসছে পাথর। ঢাল বেয়ে গড়াচ্ছে সেগুলো। গনগনে কয়লার মত গরম। নামতে শুরু করেছে লাভার স্ন্যাত।

ক্রমেই জোর বাড়ছে লাভার। শত শত ফুট ওপরে উঠে যাচ্ছে এখন। ব্যাঙের ছাতার মত ছড়িয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ঝরে পড়ছে পাথরের ওপর। ঢাল বেয়ে নামছে। চলার পথে চেকে দিয়ে আসছে পাথর, গাছপালা সব কিছু। বাস্প উঠছে। এদিক-ওদিক থেকে এসে মিলিত হচ্ছে লাভার একাধিক স্ন্যাত। যতই নামছে চওড়া হচ্ছে আরও। গলিত লাভার নদী হয়ে নামছে নিচের দিকে।

গরম ছাই, পাথরের কুচি আর কাচের টুকরোর বৃষ্টি পড়তে লাগল যেন অভিযাত্রীদের ওপর। চমকে চমকে উঠছে ভীত জানোয়ারগুলো। গরম পাথর আর কাচের ছাঁকা লাগছে ওগুলোর খোলা চামড়ায়। আর সইতে না পেরে পিরেটোর ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ পেছনের দুই পায়ে ভর করে। পরক্ষণেই মাটিতে নেমে লাথি মেরে যেন তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল অবাধ্যত বিপদকে। পিরেটোও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না ঘোড়াটাকে। ওর কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেছে রবিন।

‘শারিকে নিয়ে এসো!’ চেঁচিয়ে উঠল পিরেটো।

বারোটাকে নিয়ে দ্রুত এগোল কিশোর।

‘ঘোড়াগুলোর মাঝে তুকিয়ে দাও ওকে!’ পিরেটো বলল। ‘শাস্ত করুক।’

লম্বা দম নিল কিশোর। তারপর প্রায় চোখমুখ বুজে বারোটাকে নিয়ে এগোল আতঙ্কিত দুটো ঘোড়ার মাঝের সরু ফাঁকে ঢেকানোর জন্যে।

ওদের মাঝে একটা শান্ত জানোয়ারকে দেখে ধীরে ঘোড়াগুলোও শান্ত হয়ে এল। দুলকি চালে চলছে শারি। ঘোড়াগুলোও একই রকম করে চলতে লাগল।

পাথর-বৃষ্টি পাতলা ছয়ে এল জোরাল বাতাসে। নাকে এসে ঝাপটা মারল বাতাস। গন্ধকের গন্ধে দম আটকে যাওয়ার অবস্থা হলো কিশোরের! তাড়াতাড়ি কহলের টুকরো দিয়ে নাকমুখ চাপা দিল। আশঙ্কা হতে লাগল তার, এখন থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে তো?

পেছনে ফিরে তাকাল রবিন। এগিয়ে আসছে আগুন-গরম, লাল রঙের গলিত লাভা। পাথর গলিয়ে ফেলছে। আগে আগে ছুটছে প্রাণ ভয়ে ভীত ছোট ছোট জানোয়ারের দল, চিৎকার করে উড়ছে পাখিরা। জুলে উঠছে ঝোপঝাড়। শিল-নেড়া দিয়ে কাচ গুঁড়ো করার মত একটা শব্দ উঠছে কড়কড় কড়কড় করে। লাভার নদী বয়ে আসার সময়ই হচ্ছে শব্দটা।

গেছি, ভাবল সে। এভাবেই তাহলে মরণ লেখা ছিল কপালে! মুসাকে বলল, যাক, আর দশজনের মত সাধারণ মৃত্যু হচ্ছে না আমাদের।

“ঠিক,” জবাব দিল মুসা। ‘আগ্নেয়গিরির লাভায় চাপা পড়ে মরার ভাগ্য ক’জনের হয়?’

পর্বতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দু’জনে। ছুটে আসা লাভার উত্তাপ এসে লাগছে চোখে, জুলা করছে। কিন্তু তার পরেও চোখ বন্ধ করল না, জোর করে পাতা মেলে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

কাচ ভাঙ্গার শব্দ বাড়ছে। সেই সাথে মারাঞ্চক ওই আগুনের নদীর ওপর কালো এক ধরনের আন্তর পড়ছে। জমে যাচ্ছে লাভা। ঢাল বেয়ে গড়ানো কমছে। আশা ঝিলিক দিয়ে গেল রবিনের মনে। গড়িয়ে গড়িয়ে যেন অনেক কষ্টে এগোল আরও কয়েক গজ, আগের সে জোর নেই, তারপর থেমে গেল একেবারেই।

হাই আর গরম পৃতি-বৃষ্টিও বন্ধ হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে সেসব পেছনে ফেলে এল ভীত ঘোড়া আর বারোগুলো।

অবশ্যে বিপদসীমা ছাড়িয়ে আসতে পারল ওরা।

আরও আধ মাইল পর পৌছল উপত্যকায়। পিরেটো ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল পরের পর্বতটার দিকে। কিছুদূর গিয়ে থামল।

বিষাক্ত ধোঁয়া আর গ্যাসের মধ্যে খাস নিয়েছে, এতক্ষণে তার জের শুরু হলো। কাশতে আরঙ্গ করল সবাই। নাক উঁচু করে বড় বড় দম নিয়ে টেনে নিতে লাগল তাজা বাতাস। ফিরে তাকাল আগ্নেয়গিরির দিকে।

পিরেটো দেখতে পেল তাকে প্রথমে। হাত তুলে দেখাল অন্যদেরকে। বহু দূরে একটা মূর্তি লাফিয়ে চলেছে পাথর থেকে পাথরে। পড়ে যাচ্ছে, হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠছে আবার, সরে আসার চেষ্টা করছে ভিলার গুহার কাছ থেকে।

পর্বতের ওদিকটায় লাভার স্ন্যাত সবে চূড়ার একটা নিচে নেমেছে, তরল রয়েছে এখনও, নেমে আসতে শুরু করল দ্রুত। সামনে এখন জীবন্ত যা কিছু পড়বে, ধ্রংস করে দেবে ওই মৃত্যু নদী!

পর্বতের ভেতরে শব্দ অন্তর্ভুক্ত সব কাও করে। আগ্নেয়গিরির গর্জনকে ছাপিয়েও কি ভাবে জানি শোনা গেল ডজের আতঙ্কিত চিংকার। একবারই, তারপর হারিয়ে গেল গলিত লাভার নিচে। ঢেকে দিয়ে ছুটে নামতে থাকল মারাঞ্চক ওই তরল পদার্থ।

চোখ বন্ধ করে ফেলল চার কিশোর। কিশোর ভাবছে, বাজে লোক ছিল ডজ মরিস, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার খাবার খেয়েছে ওরা, তার বাড়িতে থেকেছে, এক সঙ্গে অভিযানে বেরিয়েছে। ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সাধারণ ভাবে মরলে এতটা খারাপ লাগত না। কিন্তু এরকম ভয়াবহ মত্ত্ব! মনই খারাপ হয়ে গেল।

নিজের বুকে ত্রুশ আঁকল পিরেটো। বিড়বিড় করে প্রার্থনা কারল স্প্যানিশ ভাষায়।

‘তোমাকে বলেছিলাম না,’ কিশোরকে বলল সে। ‘বিপদ আছে পাহাড়ে। দেখলে তো।’

পাহাড়ের পাদদেশের পথ ধরে এগোল আবার ওরা। পিরেটোর পাশে পাশে চলছে ইসাবেল। ‘পিরেটো, কিছু মনে কোরো না। জানি, তোমার লোভ নেই, কিন্তু পেসোগুলো পেলে অনেক সুবিধে হত। র্যাঞ্চটা আবার কিনে নিতে পারতে।’

‘কে জানে?’ পিরেটো বলল আনন্দে, ‘আপনাআপনিই হয়তো আমার র্যাঞ্চ আমার কাছে ফিরে আসতে পারে আবার।’

হাসল সে। লোভের ছিটেফোঁটাও নেই সে হাসিতে।

‘ভিলার গুহাটার কথা প্রথম শুনি মায়ের কাছে,’ জানাল মেকসিকান। ‘মা আমাকে বলেছিল, অভিশঙ্গ ওই পেসো কেউ কোনদিন পাবে না। ভিলার বহু লোক মারা গেছে এর জন্যে। এখনও মরা সৈন্যদের প্রেতাঞ্চা পাহারা দিচ্ছে গুগুলোকে।’ একটা মুহূর্ত থামল সে। তারপর বলল, ‘পাহারা দিয়ে যাবে আজীবন।’

## সতেরো

বিপদ সীমার বাইরে থেকে, আগ্নেয়গিরিকে বহুদ্বাৰ দিয়ে ঘুৱে চলতে লাগল দলটা। পর্বতের ওপাশের গাঁয়ে যাবে, যেখানে আগ্নেয়গিরির উৎপাত পৌছতে পারে না। তাছাড়া ঘনঘন অগৃহ্যপাত হয় বলে কাছাকাছি থাকেনি লোকে, এমন জায়গায় রয়েছে যেখানে লাভা পৌছতে পারে না কোনমতই। এমনকি গরম ছাইও না।

কথাবার্তা তেমন বলছে না ওরা। কিশোরের মন এখন শান্ত। রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে।

পিরেটোর কাছে ভিলার গুণধনের কথা প্রথম শুনেছে ইসাবেল। ১৯১৬ সালে ওর দাদা ছিল পঞ্জে ভিলার সেনাবাহিনীতে। ইসাবেল পিরেটোকে কথা দিয়েছিল, তার স্বামী আর ছেলে যদি পেসোগুলো খুঁজে পায় তাহলে অর্ধেক দিয়ে দেবে ওকে।

ডজ জানত না গুণধনের কথা। তার কাছ থেকে এটা গোপন রাখা হয়। পিরেটো ঘুণাঞ্চরেও কখনও তার সামনে উচ্চারণ করেনি। এই সময় টনি এসে একদিন হাজির হলো অঙ্ক বারোটাকে নিয়ে। পিরেটোর সঙ্গে পেসোগুলোর কথা

আলোচনা করার সময় শুনে ফেলে ডজ। জেনে যায় টনি আর তার বাবা গুহাটা। আবিষ্কার করে ফেলেছে।

টনিকে রাজি করাতে না পেরে শেষে শারিকে দিয়ে গুহাটা খুঁজে বের করার ফন্দি আঁটে ডজ।

র্যাঞ্চারের বীভৎস মৃত্যুর ধাক্কাটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি কিশোর। ডজের লোভই তাকে ওরকম মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে এটা দেখার পরেও যদি পেসো আনতে না যেত তাহলে আর এভাবে মরতে হত না।

একটা গর্তের ধারে থামল ওরা, জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়ানোর জন্যে। তারপর আবার এগোনোর পালা। কয়েক মাইল এগিয়ে একটা বিচ্ছিন্ন শব্দ কানে এল কিশোরের। দূর থেকে আসা অসংখ্য বারোর মিলিত ডাক। সাড়া দিল শারি। বাড়িয়ে দিল চলার গতি।

একটা বন থেকে বেরোতেই জোরাল শোনা গেল আওয়াজ।

বিশাল উপত্যকায় ছড়িয়ে রয়েছে মাইলের পর মাইল তৃণভূমি। শত শত বুনো বারো চরে বেড়াচ্ছে সেখানে। লাফালাফি করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, চেচাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে গেছে শারি। খাড়া হয়ে গেছে লম্বা কান, ডগা কাঁপছে মৃদু মদু। ইঠাঁ জোরে তীক্ষ্ণ এক ডাক ছাড়ল সে। ওর পিঠ থেকে নেমে পড়ল কিশোর। জিন আর লাগাম খুলে নিল। তারপর আদুর করে চাপড় দিল গলায়।

বড় বড় কোমল চোখ মেলে তার দিকে তাকাল শারি। নাক ঘমল গায়ে, যেন বাড়িতে পৌছে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। তারপর এগিয়ে গেল টনির কাছে। ঘোড়ার পিঠে থাকায় ওর বুক নাগাল পেল না বারোটা, পায়েই নাক ঘমল। নিচু হয়ে শারির মাথা চাপড়ে দিল টনি।

আর দেরি করল না শারি। মহা আনন্দে ছুটল ব্রজাতির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে।

ইসাবেলের বারোর পেছনে চড়ে বসল কিশোর।

আবার রওনা হলো দলটা। তাড়াতাড়ি করলে অঙ্ককারের আগেই পৌছে যেতে পারবে গায়ে। ওখান থেকে চিহ্নাহয়ায় বাবাকে ফোন করবে টনি। জানাবে সে আর তার মা নিরাপদেই পিরেটোর সঙ্গে গায়ে চলে এসেছে।

পরদিন সকালে বাস ধরে আমেরিকায় রওনা হবে তিন গোয়েন্দা।

‘লস অ্যাঞ্জেলেসে দেখা করব আমি তোমার সাথে,’ একসময় রবিনকে বলল টনি। ‘রক কনসাট আমার খুব ভাল লাগে। তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখব করেকটা।’

‘চলে এসো, যে-কোন সময়, খুশি হয়েই দেখাব।’

পাশাপাশি চলছে মুসা আর কিশোর। পিরেটো আর ইসাবেলের সঙ্গে। মুসা বলল, ‘একটা কথা আমার মাথায় চুকছে না, ডজ কি করে জানল লস অ্যাঞ্জেলেসেই পাওয়া যাবে টনির মত কষ্টব্যের লোক? যেন একেবারে জেনেওনেই গেছে, ওখানে রয়েছে কিশোর পাশা। আমেরিকার অন্য কোন জায়গায় গেল না কেন?’

‘জেনেভনেই তো গেছে,’ জবাব দিল পিরেটো।

‘জেনেভনে গেছে?’

‘তাই তো।’ হাসল মেকসিকান। ‘তোমরা যে কতখানি বিখ্যাত, তা তোমরা নিজেরাও জানো না। অনেকেই চেনে তোমাদেরকে। বিশেষ করে তোমাদের ওই টিভি অনুষ্ঠান “পাগল সংঘ” দেখার পর।’

‘অনুষ্ঠানটা ডজও দেখেছিল নাকি?’ রবিনের প্রশ্ন।

‘দেখেছিল। আমিও দেখেছি। তুনি যখন র্যাঙ্কে গেল, ওর গলা শুনে তো আমি চমকেই উঠেছিলাম। আরি, টেলিভিশনের মোটুরাম এল কোথেকে!’ বলেই চোখ পড়ল কিশোরের ওপর। মুখ কালো করে ফেলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। সেটা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি বলল পিরেটো, ‘সরি, কিশোর, তোমাকে রাগানোর জন্যে বলিনি।’ টেলিভিশনের সৌজন্যে সে-ও জানে, ওই ডাকনাম একদম পছন্দ নয় কিশোরের।

হাসল মুসা। ‘তাহলে এই ব্যাপার। মোটুরামই ডজকে টেনে নিয়ে গেছে রকি বীচে। আসলে আমাদের জন্যে ফাঁদ পাততেই গিয়েছিল লোকটা।’

‘এবং সেই ফাঁদে দিব্যি পা দিয়ে বসেছে রহস্য পাগল কিশোর পাশা,’ মুচকি হাসল টনি।

নীরবে পথ চলতে লাগল আবার দলটা।

কিশোর ভাবছে, বীন আর চাল সেন্দ্র কথা। যতদিন বেঁচে থাকবে, আর একটা বীন কিংবা চাল দেখতে চায় না সে। যদিও জানে, চাল ছাড়া থাকতে পারবে না। লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকলেও সে ভাতেরই পাগল। সে এবং তার চাচা রাশেদ পাশা। ভাত ছাড়া চলে না। আমেরিকাতে থেকেও পুরোদস্তুর বাঙালী।

চলতে চলতে হঠাৎ মুসার চোখ পড়ল রবিনের টি-শাটের ওপর। লেখা রয়েছে: সারভাইভার!

তাই তো! এর চেয়ে সত্যি কথা আর হতে পারে না ওদের জন্যে। সারভাইভার! অনেক কষ্টেই তো বেঁচে ফিরল।

পেছনে ফিরে তাকাল মুসা। তাকিয়ে রইল পর্বতমালার দিকে। এত বিপদ থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে, তবু আবার যদি তাকে ওখানে যেতে বলা হয়, নির্বিধায় রাজি হয়ে যাবে, এর এমনই এক আকর্ষণ। এই আকর্ষণই যুগ যুগ ধরে টেনেছে মানুষকে। সাড়া না দিয়ে পারেনি মানুষ। সমস্ত বিপদ, বাধা, তয় উপেক্ষা করে ছুটে গেছে ওর কাছে। মুসাও তো মানুষ, প্রচও এই আকর্ষণ এড়ানোর ক্ষমতা তার কোথায়?

-X-

# অবাক কাণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪

ঘটনাটা কি...?' গাড়ির ইঞ্জিনের ওপর থেকে মুখ তুলে তাকিয়েই বলে উঠল কিশোর পাশা। সোজা হতে গিয়ে মাথা টুকে গেল পুরানো সাদা রঙের শেভি ইমপালার হৃড়ে।

মাল নিয়ে ফিরে এসেছেন রাশেদ পাশা। উচ্চট সব জিনিস কেনায় জুড়ি নেই তাঁর, কিন্তু এবার যেন সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছেন।

ইয়াডের বড় ট্রাকটার ড্রাইভিং হাইল ধরে বসে আছেন তিনি। মাথায় পুরানো একটা রোমশ টুপি, পেছনে ঝুলে রয়েছে র্যাকনের লেজ। টুপি বটে একখানা! ট্রাকের পেছনে ইয়ার্ডের দুই কর্মচারী, ব্যাভারিয়ান ভাই বোরিস আর রোভার বিচ্ছিন্ন সব জিনিসের মধ্যে বসে আছে।

বিস্তৃত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে। মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি রাশেদ পাশার! সেদিকে তাকিয়ে সরে আসতে গিয়ে কনুই লেগে উচ্চে পড়ল ইঞ্জিনের ওপর রাখা একটা মবিলের ক্যান। ক্যাংককেসের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে ঢুকে যেতে শুরু করল ঘন তেল।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা আমান। গাড়ির চেসিসের নিচ থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল। 'না বলতেই ঢেলে দিলে কেন?'

দেখার মত চেহারা হয়েছে তার। চেসিসের নিচে কাজ করতে গিয়ে এমনিতেই কালিতে মাথামাথি হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর পড়েছে মবিল। কোঁকড়া চুল বেয়ে গড়াচ্ছে। ইঞ্জিনের মবিল পাস্টাতে নিচে ঢুকেছিল সে। কিশোরকে বানিয়েছিল সহকারী। কিন্তু বলার আগেই তেল ঢেলে দিয়েছে কিশোর।

রেগে গিয়ে মুসা বলল, 'কি হয়েছে?'

ক্যানটা আবার সোজা করে ফেলেছে কিশোর। কিন্তু দেরিতে। সমস্ত তেল পড়ে গেছে ততক্ষণে। বলল, 'সরি! চমকে গিয়েছিলাম!'

'কেন? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগেছে?' বলেই চোখ পড়ল মেরিচাটীর ওপর। অফিসের বারান্দা থেকে নেমে গটমট করে এগিয়ে আসছেন ট্রাকের দিকে। রাশেদ পাশার দিকে তাকিয়ে মুসা ও চমকে গেল কিশোরের মতই। 'খাইছে! এ কি কাণ্ড!'

'রাশেদ পাশা!' ফেটে পড়লেন যেন মেরিচাটী। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! এসব কি এনেছ!' মালগুলোর দিকে হাত নাড়লেন তিনি। 'এই জঞ্জাল দিয়ে কি হবে!'

'জঞ্জাল নয় এন্টলো,' শাস্তকষ্টে বললেন রাশেদ পাশা। 'ইয়ার্ডের মাল, বিক্রির জন্যে। যারা চিনবে, তারা কিনবে।'

'তোমার মাথার ওই টুপিটাও? আঘাত দেবেছ মুখটা?'

পেছন থেকে লেজটা সামনে নিয়ে এলেন রাশেদ পাশা। তবু বেনিতে যেমনই হাত বোলায় মেয়েরা, তেমনি করে বোলাতে বোলাতে বললেন, ‘এক্কেবারে আসল মাল। খাঁটি জিনিস। র্যাকুনের চামড়ায় তৈরি ডেভি ক্রকেট ক্যাপ।’

দ্রুত ট্রাকের পেছন দিকে চলে এলেন মেরিচাটী। ‘যারা চিনবে, তারা কিনবে! হতঙ্গাড়া সব জিনিস! ট্রাক্টার মধ্যে কি?’

নিজেই উঠে গিয়ে টান দিয়ে ডালা তুলে ফেললেন। ‘এতগুলো কমিকের বই! এর জম্যে টাকা নষ্ট করলে!’

কয়েক লাফে ট্রাকের পেছনে পৌছে গেল কিশোর। কৌতুহলে ফাটছে। উঠে পড়ল ট্রাকে। ট্রাকের ভেতর গাদা গাদা কমিকের বই।

‘মারছে!’ মুসাও এসে দাঁড়িয়েছে ট্রাকের কাছে। ‘লোকটা সাংঘাতিক কমিক ভালবাসত তো! যার কাছ থেকে এনেছে।’

‘অনেক পুরানো,’ কিশোর বলল। ‘নিচয় অনেকদিন ফেলে রেখেছিল।’ মুসার দিকে ঝুকল। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘কত টাকা আছে তোমার কাছে?’

‘বেশি না,’ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল মুসা।

‘অ্যাই, কি হয়েছে?’ রবিন জিজ্ঞেস করল। সবেমাত্র ইয়ার্ডে ঢুকেছে সে। গায়ে সাদা পোলো শার্ট। পরনে থাকি প্যান্ট। সুন্দর লাগছে ওকে।

দেখে ঝুশি হলো কিশোর, ‘এই যে, ঠিক সময়ে এসে পড়েছে। দেখো তো পকেটে কত টাকা আছে?’

পকেটে হাত ঢোকাল রবিন। ‘বেশি নেই। টানাটানি। কেন?’

হাসল কিশোর। ‘কিছু কমিক কিনব?’

বইগুলো ঘাঁটছেন মেরিচাটী। আরও কিছু আছে কিনা দেখছেন ট্রাকের ভেতরে। ‘কি কারণে যে এগুলো আনল! এখন কার কাছে বিক্রি করি? কাটোমার কোথায়?’

‘এখানে।’ রবিনের হাত থেকে টাকাগুলো ছোঁ মেরে নিয়ে নিল কিশোর। নিজের পকেটে যা আছে বের করল। তিনজনেরটা একসাথে করে দ্রুত গুনে ফেলল। ‘নাও,’ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘একুশ ডলার সন্তুর সেন্ট। তোমার সমস্ত যত্নণা কিনে নিলাম আমরা। কি বলো, চাটী?’

‘নিয়ে যা! জানে বাঁচালাম!’ টাকাটা নিতে গিয়েও দ্বিধা করলেন মেরিচাটী। ‘কি করবি ওসব পচা কমিক দিয়ে?’

‘কমিক নিয়ে কি করে মানুষ? পড়ব?’

চোখে সন্দেহ দেখা দিল মেরিচাটীর। ‘তোর মতলবটা কি বলো তো? কমিক নিয়ে দুবে থেকে কাজে ফাঁকি দেয়ার ফলি না তো?’

হেসে ফেললেন রাশেদ পাশা। ‘টাকা দিছে নিয়ে নাও। এতক্ষণ তো কোথায় বেচবে কোথায় বেচবে করছিলে। কাটোমার পেছে দ্বিধা কিসের?’

তবু দ্বিধা করছেন মেরিচাটী। কোন উদ্দেশ্য না থাকলে কিশোর টাকা দিয়ে কিনত না। এমনিতেও অবশ্য বিক্রির জিনিস প্রয়োজন হবে। ‘কিমে নেয় সে, আর দশজন কাটোমারের মতই। আবার নিজে যখন কাজ করে দেয়, তখনও তার পারিপ্রামিক নিয়ে নেয়। কঠোর ভাবে মেনে চলে ব্যবসার নিয়ম কানুন। যদিও

পুরো ব্যবসাটা একদিন তারই হবে, তবু 'নিজের মনে করে' কিছু নিয়ে নেয় না। 'তার এই নিয়মনিষ্ঠায় দুই খুশি মেরিচাটী। বলেন, সাংগৃতিক উন্নতি করবে একদিন তার ছেলে। কিশোরকে ছেলেই ভাবেন নিঃসন্তান মারিয়া পাশা।

'আরে নাও না,' টাকাটা চাটীর হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলল কিশোর। 'একলা তো কিনিনি। তিনজনে মিলেই কিনেছি।'

'সেজন্যেই তো ভয়! কি ফন্দি করেছিস্ত কে জানে!'

আর কথা বাড়াল না কিশোর। মুসাকে কিয়ে মাল নামাতে শুরু করল। নিচে দাঢ়িয়ে সাহায্য করল রবিন। 'গুলোর জন্যে টাকা নিয়েছ?'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে আজকে ওর,' মুসা বলল। 'প্রথমে আমার মুখে তেল ঢালল। তারপর টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে গিয়ে কতগুলো পুরানো কমিক...'

'মিলিব?' মুসার মাথা শুকে নাক কুঁচকাল রবিন। 'আমি তো ভেবেছিলাম, মাথায় তেল দেয়া আরুষ করেছ বুঝি।'

'এসব কথা বাদ দাও তো!' ঔরধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর। রবিনের দিকে তাকাল। 'বললে তো টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে কতগুলো পুরানো কমিক কিনেছি। আসলে টাকা খাটালাম, মন্ত লাভের জন্যে।'

'টাকা খাটালে?' দুরু কুঁচকে গেল রবিনের।

'যা দিয়েছ তার বহুগুণ ফেরত পাবে।' ট্রাঙ্কটায় টোকা দিল কিশোর।

'এই আবর্জনা থেকে?' মুসার কষ্টে অবিশ্বাস।

'অত অবহেলা কোরো না। এর মধ্যে গুণধন লুকানো আছে। জানো, পুরানো কমিকের দাম মাঝে মাঝে কত বেড়ে যায়? কিছু তো হাজার হাজার ডলারে বিক্রি হয়।'

'হাজার হাজার...?' ট্রাঙ্কটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।

'নিশ্চয়ই। তবে কয়েকশো ডলার তো পাবই।' দুই হাতের তালু এক করে জোরে জোরে ডলল কিশোর। 'বেশি ও হতে পারে। তাতে আমার একটা গাড়ি কেনা হয়ে যাবে হয়তো। তবে যাই লাভ হবে, তিনজনে ভাগাভাগি করে নেব আমরা।'

পরের শুক্রবারে মুসার ইমপালায় ঢেড়ে শহরতলীতে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। তিনজনেরই অবসর। মুসার বাড়িতে কাজ নেই, রবিনের ছুটি, আর মেরিচাটীও কিশোরকে নতুন কাজ গচ্ছাতে ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ সেদিন কোন কাজই নেই ইয়ার্ডে।

প্রচুর ধোঁয়া বেরোছে এগজেন্ট পাইপ থেকে। রিয়ারভিউ মিররে সেই ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল মুসা। 'তুমি একটা সর্বনাশ করেছ, কিশোর। সেই যে মিল ফেললে তার জের এখনও চলছে। ইঞ্জিনের গা থেকে পুড়ে শেষ হয়নি।...আমার চুলে তো এখনও গন্ধ আছে!'

'তেল তো অনেক ভাল,' রবিন ফোড়ন কাটল। 'পুরানো' কমিক পড়তে পড়তে যে অন্ধ হয়ে যাইনি এটাই বেশি। বাপরে বাপ! লাইব্রেরিতে পুরানো বই মোছার চেয়ে বিরক্তিকর এটা।'

‘তোমার মত বইয়ের পোকা ও একথা বলছ?’ সামনের রাস্তার ওপর মুসার নজর। ‘তবে যা-ই বলো, কিছু কিছু পড়তে কিন্তু ভালই লেগেছে। ছেটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে, যখন ওসব পড়তাম। যেমন ধরো, ক্রিমসন ফ্যান্টমের কথাই।’ মাথা নেড়ে জোরে একটা নিঃশ্঵াস ফ্রেলল সে। ‘ও তো সাংঘাতিক জিনিস। এখনও ভালুগে।’

‘তোমার লাগে,’ পেছনের সীটে বসেছে রবিন। মেঝেতে পায়ের কাছে পড়ে থাকা মলাটের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত মুখভঙ্গি করল। ‘আমার লাগে না। বাক্সটায় একটা লাঠি মেরে বলল, ‘এগুলো আমার পড়তে হয়েছে, ভাল না মন্দ বোঝার জন্যে, ভাবলেই মেজাজ খিচড়ে যায়। কমিকের মধ্যে কিছু আছে নাকি!’

‘সাবধান!’ ঘাড় ঘুরিবে ‘রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, ‘এগুলো ব্যবসার মাল। নষ্ট করলে টাকা নষ্ট হবে। মাখনগুলো খুঁজে বের করতে হবে আগে আমাদের, সব চেয়ে দামিগুলো। ছিড়েচিড়ে নিয়ে গেলে হয়তো কিনতেই রাজি হবে না ইন্টারকমিকনের ওরা।’

‘ওরাই যদি বাঁচায়। নইলে এসব আবর্জনা কিনবে কে গাঁটের পয়সা খরচ করে? ভাগিয়স কাগজে কমিকস কনভেশনের খবরটা পড়েছিলে।’

কিশোর হাসল। ‘রবিন, এতটা কিপটে হয়ে গেলে কি করে তুমি? দাঁড়াও, আগে পেয়েনি টাকাটা। গোনার কাজে লাগিয়ে দেব। গুনতে গুনতে শেষে টাকার ওপরই ঘে়ন্না ধরে যাবে…’

‘এসে গৈছি,’ ঘোষণা করল মুসা। ‘দ্য সেনচুরি হ্যাও প্লাজা।’

কাচ আর ইস্পাতে তৈরি পরিষ্কার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ানো চকচকে টাওয়ারটার দিকে তাকাল রবিন। ‘এরকম একটা জায়গায় কমিক বিক্রি হয়!

আগস্ট মাসের পচা গরম পড়ছে। ঘামছে কিশোর। বলল, ‘এই মুসা, গাড়ি এখানেই রাখ কোথাও। গিয়ে দেখা যাক কি ধরনের সঙ্ঘেলন হচ্ছে।’

ড্রাইভওয়ে দিয়ে হোটেলের আধারগাউড় পার্কিং গ্যারেজে গাড়ি নিয়ে এল মুসা। আজব এক কংক্রীটে তৈরি জঙ্গলের মত লাগছে জায়গাটাকে। মোটা মোটা থাম ধরে রেখেছে ছাত এবং তার ওপরের বাড়িটাকে। উজ্জ্বল রঙ করে জায়গাটাকে মোটামুটি একটা সুন্দর রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছে কর্তৃপক্ষ, কিন্তু কতটা সফল হয়েছে বলা মুশকিল। মুসার অস্তত ভাল লাগছে না। গাড়ির এগজটের ধোঁয়া, অল্প আলো, আর অসংখ্য থামের ছায়া কেমন যেন ভূতুড়ে করে তুলেছে পরিবেশ।

খালি একটা জায়গায় গাড়ি চুকিয়ে দিয়ে মুসা বলল, ‘নাও, থামলাম। বেরোও সবাই।’

‘বেরোও বললেই কি আর হয়,’ রবিন বলল। ‘যা একখান বোঝা নিয়ে এলাম। লেখাগুলো যেমন বিছিরি, ওজনটাও তেমনি বাজে। ‘দেখি, নাও তো।’

‘আবার এটাতেও আমাকে টানছ কেন?’ প্রতিবাদ জানাল মুসা। ‘তোমাদেরকে ড্রাইভ করে যে এখানে নিয়ে এলাম, সেটা কিছু না?’

‘সেটা আমিও করতে পারতাম।’

‘পারলে তো তোমার ফোক্স ওয়াগেনে করেই আসতাম। ওই গোবরে পোকার

ভেতরে জায়গা হলো না বলেই তো...আসলে ওই বাস্তুর জন্যেই হলো না।'

বিরক্ত চোখে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'তোমাদের যখন এতই কষ্ট লাগছে, ঠিক আছে, আমিই নিতে পারব।' বাস্তু ধরে টান দিল সে। 'আগের মত উটকি ভাব নাকি আমাকে?'

'না, তা ভাবব কেন?' মুসা বলল। 'জুড়ো ক্লাসের ব্যায়াম অনেক মেরামত করে দিয়েছে তোমাকে। শরীর আরও ভাল হয়ে যেত, যদি কারাতে শিখতে।'

'এমনিতেই যথেষ্ট হয়েছে।' ভারি বোৰা নিয়ে এলিভেটরের কাছে পৌছতে পৌছতেই হাঁপিয়ে উঠল কিশোর।

কল বাটন টিপতেই খুলে গেল এলিভেটরের দরজা।

চুকল তিনজনে। পায়ের শব্দ কানে এল। দৌড়ে আসছে কেউ এলিভেটর ধরার জন্যে। ঝট করে একটা হাত চুকে গেল দরজার ফাঁকে, পুরোপুরি বঙ্গ হয়ে যাওয়ার আগেই। আবার ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। একজন লোক। শরীরের মাংস খসে খসে পড়ছে তার।

## দুই

ভয়ঙ্কর মানুষটাকে দেখে আরেকটু হলেই হাত থেকে কমিকের বাস্তু খসে পড়ে যাচ্ছিল কিশোরের।

লাফিয়ে এলিভেটরে উঠে লোকটা বলল, 'সবি, চমকে দিলাম।' গোয়েন্দাদেরকে একধারে সরে যেতে দেখে হাসল। কাঁধের গিটলি হয়ে যাওয়া। একটুকরো মাংস দুই আঙুলে টিপে ধরল সে। 'ল্যাটেক্স সেজেছি আমি। কমিকের মাংস খসা ভূত। প্রতিযোগিগতার সাজ। কেমন লাগছে?'

'একেবারে বা-বা-বা,' তোতলাতে লাগল কিশোর, 'বাস্তব!'

লবিতে পৌছল এলিভেটর। যেমন তাড়াহুড়ো করে উঠেছিল, তেমনি করেই নেমে গেল 'মাংস খসা ভূত'। জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেল। লবির আরও অনেকেই মানা রকম সাজে সেজেছে। সবই কমিক বইয়ের চরিত্র। এলিভেটর থেকে নেমে যাবেলের মেঝেতে বিছানো কার্পেটের ওপর দিয়ে ক্রোমের ফ্রেম করা অ্যানাউসমেন্ট বোর্ডের দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। 'ইন্টারকমিকন,' পড়ল কিশোর, 'মেইন কনফারেন্স হল।' তাকাল দুই সহকারীর দিকে। 'অনেক বড় মনে হচ্ছে।'

সম্মেলন যেখানে হবে সেদিকে এগোল ওরা। সাধারণ একটা কাঠের টেবিলের সামনে একদল মানুষকে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। টেবিলের পেছনে বসে একটা মেয়ে। সোনালি রঙ করা ছুল। মাঝখানে কালো রঙের একটা শিং গজিয়েছে, চুলগুলোকেই বাঁধা হয়েছে ওরকম করে। গায়ে কালো রঙের টি-শার্ট, তাতে সাদা অক্ষরে লেখা: ইন্টারকমিকন স্টাফ। তিন গোয়েন্দা কাছে যেতেই বলল, 'দশ ডলার করে প্রতিটি।'

ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে, কালো কালির বড় একটা ইঞ্চ প্যাড থেকে

স্ট্যাম্পে কালি নিয়ে ছাপ দিয়ে দিল গোয়েন্দাদের ডান হাতের উল্টো পিঠে।

কিশোর লক্ষ করল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় রবিনের হাতটা ধরে রাখিল  
মেয়েটা। এবং এই প্রথম হাসল।

মুসাও ব্যাপরটা লক্ষ্য করেছে। কিশোরের দিকে মাথা কাত করে বলল,  
‘রবিনটা যে কি জাদু করে বুঝি না! মেয়েগুলো ওকে দেখলেই আরেক রকম হয়ে  
যায়...’

‘যা খুশি করুকগে।’ হাতের ছাপটার দিকে তাকাল কিশোর। লেখা হয়েছে:  
ইন্টারকমিকন- ডে ১। বিড়বিড় করল সে, টিকেটের চেয়ে খরচ কম,  
ফাঁকিবাজিরও তয় নেই। ইচ্ছে করলেই আমরা নিয়ে গিয়ে কোন বস্তুকে দিয়ে  
দিতে পারব না এটা, টিকেট হলে যেমন পারা যায়। মোট কথা যাকে দেয়া হয়েছে  
শুধু তার জন্যেই এটা প্রযোজ্য।’

রবিনের পেছন পেছন কলফারেস হলের দরজায় এসে দাঁড়াল দু’জনে। দরজা  
জড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী এক লোক। ষাঁড় যেন। এর গায়েও কালো টি-  
শার্ট। হাত বাড়াল টিকেট চাওয়ার ভঙ্গিতে।

যার যার ডান হাত বাড়িয়ে দিল তিন গোয়েন্দা।

ছাপগুলো পরীক্ষা করল লোকটা। তারপর হাসল। বেরিয়ে পড়ল একটা ভাঙা  
দাঁত। সরে গেল একপাশে। পা বাড়াল তিন গোয়েন্দা। চুকল এসে যেন এক  
সাংঘাতিক পাগলখানার মধ্যে।

লবির শান্ত পরিবেশের তুলনায় এই জায়গাটাকে মনে হলো আরব্য রাজনীর  
কোন সরগরম মেলা, কিংবা বাজার। বিশাল হলঘরে পাতা হয়েছে কাঠের শত  
শত ফোল্ডিং টেবিল। কিছু টেবিল ব্যবহার হচ্ছে কাউন্টার হিসেবে, রাশি রাশি  
কমিকের বই স্তুপ হয়ে আছে ওগুলোতে। কিছু টেবিলে গায়ে গায়ে লাগিয়ে স্টল  
তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি স্টলের পেছনে লাগানো হয়েছে তাক আর ডিসপ্লে  
বোর্ড, ওগুলোতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে রঙচঙে কমিকের বই। বইগুলোকে যত্ন  
করে অয়েল পেপারে মোড়া হয়েছে। সংগ্রাহকের জিনিস। যার পছন্দ হবে অনেক  
দাম দিয়ে কিনবে।

অনেক মানুষ। যেখানে ফাঁক পেয়েছে গাদাগাদি করে রয়েছে। হাঁটার উপায়  
নেই। অনেক কষ্টে ঠেলেঠুলে এগোতে হয়। বুড়ো-বাচ্চা, সব বয়েসের মানুষই  
হৃষড়ি খেয়ে পড়েছে কমিকের ওপর, দামদর করছে। পছন্দ হলে কিনছে, না হলে  
সরে যাচ্ছে আরেক কাউন্টারে। বিচিত্র সব পোশাক পরে রয়েছে অনেকে, ক্রেতা-  
বিক্রেতা উভয় দলেই আছে এই সাজের বাহার। হটগোলে কান ঝালাপালা।

পাথর হয়ে যেন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে তিন বস্তু। লম্বা, পাতলা লাল  
চুলওয়ালা, ইন্টারকমিকনের টি-শার্ট পরা একজন মানুষ সরে এলেন ভিড়ের  
ভেতর থেকে। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

‘প্রথম এলে বুঝি,’ বললেন তিনি। ‘তোমাদের অবাক হওয়া দেখেই বুঝেছি।’  
নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, ‘ইন্টারকমিকনে স্বাগতম। আমি লই মরগান। এই  
কনভেনশনের চীফ।’ হাসলেন। ‘পাগলাগারদ মনে হচ্ছে তো?’ কিশোরের হাতের  
বাল্পটার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তো, কি নিয়ে এলে?’

ওদের কথা শোনার পর হাসিটা বাড়ল তাঁর। ‘অনেক পাইকার পাবে এখানে।’ হাত ছড়িয়ে স্টেলগুলো দেখালেন তিনি। সব চেয়ে বড় ফ্রপটা হলো সুমাতো কমিকস। তাদের টাকা আছে, ভাল দাম দিতে পারবে। ওই যে, ওদিকটায় ওদের স্টেল।’ লম্বা একটা আঙুল তুলে ঘরের একধারে দেখালেন।

নির্দেশ মত ঘরের ওই পাশটায় চলে এল তিনি গোয়েন্দা। ছোট একটা স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে থামল কিশোর, কমিকের সাথে সাথে টি-শার্টও বিক্রি হয় ওখানে। তিনজনের জন্যেই একটা করে শার্ট কিনল সে। ওগুলোতে ছাপ মারা রয়েছে: কমিক লাভারস দুইট উইথ পিকচারস।

সুমাতো কমিক লেখা স্টেলটা চোখে পড়ল ওদের। অনেক বড়। ডান পাশের অর্ধেক জুড়ে দেয়াল ঘেঁষে বিরাট এক দোকান সাজানো হয়েছে। খরিদ্দারও প্রচুর।

টেবিলের কাছে যাওয়ার আগে দ্বিধা করল তিনি গোয়েন্দা। সব কিছু দেখে নিয়ে তারপর যেতে চায়।

পাঁচজন অল্পবয়েসী লোক দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপাশে। খরিদ্দার সামলাচ্ছে। একজনের এক কানে দুল। সে কথা বলছে একটা ছোট ছেলের সঙ্গে। একটা ‘থান্ডারবীম’ কমিকের তিন নম্বর সিরিজটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘দিয়ে দিলাম চার ডলারেই।’ বইটার মলাটে নায়কের ছবি আঁকা। নিজের চোখ থেকে লেজার রশ্মি বের করে ট্যাঙ্ক ফুটো করে ফেলছে। ‘তোমার ভাগ্য ভাল, খোকা। পেয়ে গেলে। এখানে আর কোন দোকানে এই কমিক পাবে না।’

তাড়াতাড়ি টাকা বের করে দিল ছেলেটা, যেন দেরি করলেই হাতছাড়া হয়ে যাবে ওই অমূল্য সম্পদ।

নিচু গলায় দুই বশুকে বলল রবিন, ‘আসার সময় এইমাত্র দেখে এলাম আরেকটা স্টেল, এক ডলারের কমিকের স্তুপে ফেলে রেখেছে ওই একই জিনিস।’

মুসা বলল, ‘পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে আমি নতুন কিনে পড়েছি।’

সুমাতো স্টেলের আরও কাছাকাছি এসে তিনি গোয়েন্দা দেখল এক জায়গায় একটা টেলিভিশনে ভিসিআর লাগিয়ে রেখেছে একজন সেলসম্যান। শজারুর কাঁটার মত খাড়া খাড়া চুল, গায়ে কালো টি-শার্ট। ‘অ্যাসট্রোঅ্যাইসেস’ কমিকের কিছু দৃশ্য দেখাচ্ছে। ইদানীং টিভিতে বেশ গরম করে রেখেছে ওই নতুন সাইল ফিকশনটা। বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। লোকটা বলছে, ‘এই পাটটা টিভিতে আসতে আরও দু’এক হণ্টা লাগবে। চালাকি করে আগেই জোগাড় করে ফেলেছি আমরা। শহরের কেউ দেখার আগেই পেয়ে যাচ্ছেন। জলদি নিয়ে নিন, শেষ হওয়ার আগেই।’

বলে খরিদ্দারদের দিকে কি-করে-ফেলেছিনু-রে এমন একটা ভঙ্গিতে তাকাল সে।

বছর বিশেক বয়েসের এক তরঙ্গ টাকা বাড়িয়ে দিল।

ফিসফিস করে মুসা বলল, ‘অথবা টাকা খরচ করছে। কয়েকদিন অপেক্ষা করলে বিনে পয়সায়ই দেখতে পারত। চাইলে ভিসিআরে রেকর্ডও করে নিতে পারত।’

‘টাকা দিচ্ছে একটা জালিয়াতি করে আনা টেপের জন্যে,’ রবিন বলল।

নিশ্চয় ঘূষ দিয়ে নিয়ে এসেছে। নয়ত সিঞ্জিকেট যখন টিভি কোম্পানিতে পাঠাচ্ছিল  
ছবিটা, তখন স্যাটেলাইট বীম দিয়ে ধরে রেকর্ড করে ফেলেছে। মহা শয়তান  
ব্যাটারা!

‘কত রকমের পাগল যে আছে দুনিয়ায়,’ কিশোর বলল, ‘টাকাও আছে  
খরচও করছে। ওরা কিনছে বলেই ঠকানরও সুযোগ পাচ্ছে। দেখি, আমরা কি  
করতে পারি?’

এগিয়ে গেল কিশোর।

একজন সেলসম্যান মুখ তুলে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বলো, কি করতে  
পারি?’

দিখা করছে তিন গোয়েন্দা।

‘ও, তোমরা কিনবে না? বেশ, না কিনলে সরে দাঁড়াও। যারা কিনবে তাদের  
জায়গা দাও।’

‘না,’ কিশোর বলল, ‘আমরা কিনব না।’

উঠলের কাছ থেকে সরে এসে রবিনের দিকে তাকাল সে। বলল, ‘এরা  
ডাকাত। বেচতে পারব না এদের কাছে। ওটা কোথায় দেখেছিলে? চার  
ডলারেরটা যেখানে এক ডলারে বিক্রি করে?’

‘ওদিকে,’ রবিন বলল, ‘ইমারজেন্সি একজিটের কাছে। কি যেন একটা নাম।  
পাগল না উন্নাদ, কি যেন।’

উঠলের নামের সঙ্গে ম্যাড কথাটা জুড়ে দেয়া হয়েছে অবশ্য, তবে মালিক  
সত্ত্ব পাগল কি-না কে জানে! যদিও তাঁকে দেখলে পাগল বলেই সন্দেহ হবে।  
এলোমেলো কোঁকড়া কালো চুল, পুরু গোঁফ। দোকানের নাম ‘ম্যাড ডিক্সন’স  
ওয়ার্ল্ড। তরুণ সহকারীকে ডেকে বললেন, ‘জনি, চট করে ওপরে গিয়ে আরও  
কয়েক বার্স ক্রমিক নিয়ে এসো।’ তারপর ঘুরতেই চোখ পড়ল লম্বা, বিষণ্ণ  
চেহারার একজন মানুষের দিকে। চাঁদিতে টাক। তিনপাশে পাতলা চুল, ধূসর হয়ে  
এসেছে।

ধূমকে উঠলেন ম্যাড, ‘আবার এসেছেন?’

অদ্রলোক বললেন, ‘ফ্যান ফানের কপিটার জন্যে সাড়ে তিনশো দিতে রাজি  
আছি।’

মাথা নাড়লেন ডিক্সন। ‘পাঁচ।’

আরও বিষণ্ণ হয়ে গেলেন অদ্রলোক। দর কষাকষি শুরু করলেন, ‘ঠিক আছে,  
সাড়ে চার।’

‘ছয়।’

কিন্তু লেখা তো রয়েছে মাত্র সাড়ে চারশো! মরিয়া হয়ে উঠলেন যেন  
ক্রেতা।

‘এখন আর ছয়ের কমে বেচব না।’ জনাব পাগলও কম যান না। বুনো দৃষ্টি  
ফুটেছে চোখে।

হাত মুঠো করে ফেললেন ক্রেতা। ‘বেশ ছয়ই দেব।’

হাসি ফুটল পাগলের চোখে। ‘বলতে বেশি দেরি করে ফেলেছেন। এখন

সাত।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল লোকটার। 'সাত! বেচতে চান না নাকি কারও কাছে?'  
'কারও কাছে বেচতে চাই না কথাটা ঠিক নয়। আপনার কাছে চাই না।'

ঝটকা দিয়ে ঘূরে দাঁড়ালেন ক্রেতা। গটমট করে চলে গেলেন। সেদিকে  
তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মিষ্টার ডিকসনের দিকে ফিরে বলল, 'কাস্টোমারদের  
সঙ্গে এরকম আচরণই করেন নাকি?'

'সবার সঙ্গে করি না। যারা বেশি বিরক্ত করে, ঘাড়ে এসে চাপতে চায়,  
তাদের সঙ্গে করি। বড় একটা কমিক পাবলিশিং কোম্পানিতে চাকরি করে। ভীষণ  
বিরক্ত করে এসে।' কিশোরের বাঞ্ছটার দিকে তাকালেন ডিকসন। 'তোমরা কি  
জন্যে এসেছ? কিনবে, না বেচবে?'

'বেচব।' বাঞ্ছটা টেবিলে রেখে ডালা খুল্ল কিশোর।

ভেতরের জিনিসগুলো দেখলেন ডিকসন। 'ভাল জিনিস কিছু আছে।' চোখ  
চকচক করছে তাঁর। 'সিলভার এজ-এর বই দুটো তো বেশ ভাল কণ্ঠিশনে আছে।  
তাছাড়া কিছু নাস্তির ওয়ানস... ঠিক আছে, যা আছে, আছে।' পুরো বাঞ্ছটাই বেচে  
দাও। চারশো ডলার দেব।'

দাম শুনে কান গরম হয়ে যাচ্ছে টের পেল কিশোর। বুবল, মুখেও রক্ত  
জমছে। শুরুতেই এত! তার পরেও বলল, 'মাত্র চার? অর্ধেকও তো বলেননি। দাম  
জানা আছে আমার...'

বাধা দিয়ে ম্যাডম্যান বললেন, 'ওভারস্ট্রাইট গাইডে দেখিয়েছ তো? ওরা  
বলবেই। আরও অনেক দাম হাঁকবে, কিন্তু কিনবে না। শয়তানি আরকি। কি  
লিখে রেখেছে দেখোনি? কেউ যাতে এসে কিছু বলতে না পারে। লিখেছে,  
আমাদের কাছে যা আছে, ওগুলো আরও অনেকের কাছেই থাকতে পারে। দামেরও  
তফাও হতে পারে। কাজেই কেনার আগে চিন্তা করে নেবেন। আমরা লাভ করার  
জন্যেই বসেছি, লাভ করব।'

'সেটা তো সততার পরিচয় দিয়েছে,' কিশোর বলল। 'লাভ করবে বলেছে  
তাকাতিও করছে না, ঠকাচ্ছেও না...' এর বেশি আর বলতে পারল না সে। টেনে  
সরিয়ে নিয়ে গেল তাকে রবিন আর মুসা। নিচু গলায় বলল, 'কি যা-তা বকছ  
অনেক বেশি দিতে চাইছে, দিয়ে দাও। খরচ করেছি একুশ ডলার, পাছ্ছ চারশো  
আর কত!'

'বেশিই পাব,' কিশোর বলল। 'এক কথায়ই যখন চারশো দিতে রাজি  
হয়েছে, জিনিসের দাম আরও অনেক বেশি। দরাদরি করতে অসুবিধে কী?'

ম্যাডম্যানের দিকে ঘূরতে গেল কিশোর। কিন্তু ঘোরা আর হলো না। দৃষ্টি  
আটকে গেল নীল সোনালি রঙের ওপর।

ওদেরই বয়েসী একটা মেয়ে। বেশ লম্বা। সুন্দর সোনালি চুল প্রায় কোমরের  
কাছে নেমে এসেছে। নীল সিঙ্কের আলখেন্তা গায়ে। ভেতরে পরেছে হলুদ রঙের  
একটা বাদিং স্যুট, রঙটা এতই উজ্জ্বল, সোনালি। লাগছে। হাত আর পা পুরোপুরি  
বেরিয়ে আছে। পায়ে হলুদ বুট। হাঁটাও খুব সুন্দর। চোখ ফেরানো যায় না।

কিশোরও ফেরাতে পারছে না।

সেটা দেখে হাসলেন ম্যাড। 'চোখে লেগে যায়, না?' কষ্টিউম কনটেক্টে  
স্টেলারা স্টারগার্লের মত পোশাক পরেছে। কেন প্রতিযোগিতায় জিতে যায় এরা,  
বুঝি....'

'হ্যাঁ, দামের ব্যাপারটা,' কমিক বিক্রির কথায় ফিরে এল কিশোর। বলেই  
আবার চোখ ফেরাল মেয়েটার দিকে।

'দেখি তো আবার,' বলে বাল্কে আবার হাত ঢোকালেন ডিকসন। দশটা  
কমিক টেনে বের করে বললেন, 'এগুলো আমি সহজেই বেচতে পারব। আসলে  
দামও এগুলোরই। ঠিক আছে, একটারই দামদর হোক। তিনশো দিতে রাজি  
আছি।'

শুনছে না কিশোর।

'তোমাকে দামের কথা বলছে, কিশোর,' কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল  
রবিন।

জোর করে যেন মেয়েটার ওপর থেকে চোখ সরাল গোয়েন্দাপ্রধান। মেয়েদের  
দিকে এভাবে সাধারণত তাকায় না সে। নিচয় কোন কারণ আছে, বুঝতে পারছে,  
তার দুই সহকারী।

'মোটামুটি ভালই দাম বলেছেন,' বলেই আবার মেয়েটার দিকে ঘূরতে শুরু  
করল কিশোরের মুখ।

এক পলকের জন্যে যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল হলুদ রঙ। পরক্ষণেই লাল  
কষ্টিউম পরা একটা মৃত্তির আড়ালে চলে গেল মেয়েটা। মঠবাসী ভিক্ষুর  
আলখেল্লার মতই লাগছে পোশাকটা, রঙ বাদে। মৃত্তিটা আরও কাছে এলে কিশোর  
দেখল, মুখোশ পরেছে লোকটা। সাদা-কালো মড়ার মুখ। না না, কক্ষালের মুখ।

আনমনেই মাথা নেড়ে আবার ম্যাডম্যানের দিকে ফিরল কিশোর। অন্যমনক্ষ  
অবস্থাটা চলে গেছে। বলল, 'তিনশো ডলার বললেন, না? আমাদের সব চেয়ে  
দামি মাল এগুলোই। যে কেউই কিনতে চাইবে, কেবল এগুলোর জন্যেই...'

আলখেল্লা পরা 'মড়াটা' তার প্রায় গা ঘেষে চলে গেল। বাদুড়ের ডানার মত  
দুলে উঠল লাল আলখেল্লার প্রাণ্ত। বিরক্ত হয়ে ঘুরে তাকাল কিশোর।

নাটকীয় ভঙ্গিতে মৃত্তিটাকে হাতে তুলতে দেখল সে। ছড়িয়ে দিয়েছে লম্বা  
লম্বা আঙুল। টান টান হয়ে গেছে হাতের ফ্যাকাসে চামড়া। চারটে ছোট ছোট বল  
পড়ল মেরেতে।

ধোঁয়ায় দেকে গেল ম্যাড ডিকসনের স্টলটা।

## তিনি

হঠাৎ এই ধোঁয়া দেখে ভয়ে চিন্কার করে উঠল কিছু কমিক ক্রেতা। কিন্তু এই  
চিন্কার কিছুই না; আসল হটগোল শুরু হল ধোঁয়া সরে যাওয়ার পরে।

'হায় হায়রে!' গলা ফাটিয়ে চিন্কার করতে লাগলেন ম্যাড ডিকসন, 'আমার  
সর্বনাশ করে দিয়েছে! ডাকাতি!' মাথা ঝাঁকাচ্ছেন বার বার, তাতে এলোমেলো চুল  
আরও ছড়িয়ে যাচ্ছে। বড় বড় গৌফ কেমন যেন ফাঁক ফাঁক হয়ে বিকট করে

তুলেছে মুখটাকে। 'গেল কোথায় ব্যাটা! লাল আলখেন্দ্রা! ক্রিমসন ফ্যান্টম  
কষ্টউয়! খুন করব আমি ওকে।'

উধাও হয়েছে লাল পোশাক পরা লোকটা।

কিশোর বললে, 'ধোয়া দিয়ে তেকে ফেলেছিল, যাতে কেউ না দেখে ওকে।  
টেবিল টপকে গিয়ে দায়ি কমিকগুলো নিয়ে চলে গেছে।'

পেছনের কাঠের ডিসপ্লে বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। সাজানো  
কমিক বইয়ের মাঝে বড় একটা ফোকর হয়ে আছে। ডিক্সনও তাকিয়ে রয়েছেন  
সেদিকে। 'ফ্যান ফান নাস্বার ওয়ানের কপিটা নিয়ে গেছে...'

সেই কমিকটাই, যেটার জন্যে চাপাচাপি করছিল টেকো লোকটা, নিতে  
পারেনি, ভাবছে কিশোর।

'...আরও নিয়েছে,' বলছেন ম্যাড। 'একগাদা! বিশ থেকে তিরিশ ডলার দাম  
ওগুলোর।' হঠাৎ বদলে গেল বিক্রেতার কষ্টস্বর। কেন, দেখতে পেল কিশোর।  
একটা বই দেখা গেল, তাতে দামের ট্যাগ লাগানো রয়েছে: ৪,৫০০ ডলার।

'ধোয়াটা তেমন স্বার্ট আইডিয়া নয়,' কিশোর বলল। 'এগুলো পুরানো  
পদ্ধতি। এতে অসুবিধে হলো, চোর নিজেও কিছু দেখতে পায় না। অনেক সময়  
যেটা নিতে আসে সেটাই ফেলে যেতে হয়। ফেলে গেছে দেখতে পায়নি বলেই।'

'যা নিয়েছে তা-ই যথেষ্ট,' ম্যাড বললেন। 'আমারগুলো যা পেয়েছে তা তো  
নিয়েছেই, তোমার যেগুলো আমার হাতে ছিল, সেগুলোও নিয়েছে।'

পরম্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। ক্রিমসন ফ্যান্টম বা লাল  
ভূত ওদের কমিকগুলোও নিয়ে গেছে, সব চেয়ে দামিগুলো, যেগুলোর প্রাথমিক  
দামই উচ্চ গিয়েছিল তিনশো ডলার।

'তার মানে সমাধান করার জন্যে একটা কেস পেয়ে গেলাম,' বিড়বিড় করল  
মুসা।

'কেস? সমাধান?' ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালেন ম্যাড।

'হ্যা,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। পকেট থেকে কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিয়ে  
বলল, 'এটা দেখলেই এসব কথার মানে বুঝবেন।'

'তিন গোয়েন্দা!...দাঁড়াও, দাঁড়াও!' টেবিলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের  
করলেন একটা ছোট বাক্স। তার ডেতের থেকে বের করলেন একটা ময়লা প্রায়  
দোমড়ানো কার্ড। কোণগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।

'আরি! এ কি কাও!' রবিন বলল, 'আমাদের কার্ড!'

'নিষ্ঠয়,' ডিক্সন বললেন। 'অনেক পুরানো। তোমাদের এখনকারটার সঙ্গে  
মেলে না। এটা বোধহয় প্রথম দিককার ছাপা কার্ডগুলোর একটা। পঁচাত্তর ডলারে  
বিক্রি করতে পারব।'

চোখ মিটামিট করল কিশোর। 'তার মানে আপনি এটা বিক্রি করবেন?'

শ্বাগ করলেন ডিক্সন। 'কেন করব না? কিছু কিছু লোক আছে, যা পায় তা-  
ই সংগ্রহে রাখে।' দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডিক্সন। 'তাহলে  
তোমরাই সেই লোক, যারা যে-কোন রহস্যের সমাধান করে। বলে ঘোষণা দাও।  
বেশ, তোমাদেরকেই আমার এখন সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন। কেন, বলছি

অবাক কাও

আমার কমিকগুলো খুঁজে বের করে দাও। সেই সাথে তোমাদেরগুলোও করো। ওভারন্ট্রাইট যা বলেছে, তখন আমি সেই দাম দিয়েই তোমাদের কমিকগুলো কিনব, যাও, কথা দিলাম।'

আবার একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। অবশ্যে কিশোর বলল ডিকসনের দিকে তাকিয়ে, 'বেশ, আমরা রাজি।' যে বইগুলো আছে এখনও সেগুলোসহ বাক্সটা তুলে এক হাতে নিয়ে আরেকটা হাত বাড়িয়ে দিল কমিক বিক্রেতার দিকে।

'আমার নাম আসলে জেমস ডিকসন,' হাসলেন বিক্রেতা। গোফের জন্যে হাসিটা অনেকখানিই ঢাকা পড়ে গেল। 'ওরকম একটা হাস্যকর নাম নিয়েছি স্বেচ্ছ প্রচারের জন্যে।'

'সেটা বুঝতে পেরেছি আমরা।' কিশোরও হাসল। 'আমি কিশোর পাশা। ও মসা আমান। আর ও রবিন মিলফোর্ড। তাহলে কাজ শুরু করা যাক। প্রথম প্রশ্ন, মিষ্টার ডিকসন, বিশেষ কাউকে কি সন্দেহ হয় আপনার?'

'কাউকে? এখন তো মনে হচ্ছে সবাইকেই সন্দেহ করি।' স্টলের আশপাশে ডিড় জমানো জনতাকে দেখালেন তিনি হাত তুলে। তারপর দেখালেন পুরো হলঘর। তুমি জানো না, কারা এসেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সব চেয়ে বড় পাগলগুলোই এখানে ডিড় জমায়।' হাসলেন তিনি আবার। 'তোমাকে অবশ্য পাগল বলছি না, কারণ তুমি কিনতে আসোনি।'

'তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন, এরা সবাই পাগল?'

হাত ওল্টালেন ডিকসন। 'একটা কথা বলতে পারি, সংগ্রহের নেশায় যখন পেয়ে বসে মানুষকে, হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায় অনেকের। বিগড়ে গিয়ে অন্য মানুষ হয়ে যায়। কি সংগ্রহ করল, কিভাবে করল, সেটা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা থাকে না। আমার বিশ্বাস, অসুস্থই হয়ে পড়ে তখন ওরা।'

'চুরি করে বলতে চাইছেন,' কিশোর বলল। 'চোরটা কি বইগুলো বেচবে? কি মনে হয় আপনার?'

'অত সহজ হবে না। বিশেষ করে ফ্যান ফানের মত জিনিস।' ভুক্তি করলেন ডিকসন। 'যেখানেই বেচতে যাবে, প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। দোকানদার জানতে চাইবেই, কোথেকে জোগাড় করা হয়েছে ওগুলো।'

'চোরটা তা বলতে চাইবে না,' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকালেন ডিকসন। 'মুশাকিলটা হলো কি, সংগ্রাহকের ব্যাপারে তদন্ত করছ তোমরা। কি যে করবে লোকটা, বলা কঠিন। হয়তো সারাটা জীবনই মাটির তলার ঘরে লকিয়ে রাখবে কমিকগুলো। বেরই করবে না।'

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা। কৌতুহলী দর্শক এসে ডিড় জমিয়েছে স্টলের কাছে, তাদেরকে সরিয়ে দিল হোটেলের কর্মচারীরা। আবার নিয়মিত বেচাকেনা শুরু হলো ঘরে। বারো বছরের একটা ছেলে এগিয়ে এল। হাতে একটা সাদা-কালো ছবি। ছবিটা মন্দাটে সাঁটা। একজন বকুকে দেখিয়ে বেশ গবের সঙ্গে বলল, 'দেখ দেখ, কি পেয়েছি। পুরো পাতাটাতেই আইজাক হফারের আর্ট। ক্রিস্মাস ক্রিস্টামাস থেকে এঁকেছে। মাত্র সন্তর ডলার দিয়ে নিয়ে ফেললাম।'

লম্বা, পাতলা, ধূসর চুলওয়ালা একজন লোক এগিয়ে এল। চামড়ার রঙ বেশি ফজাকাসে। কোন সময়েই যেন বাইরে বেরোয় না, খালি ঘরে বসে থাকে। বলল, ‘এই খোকা, আমার কাছে বেচে দাও ওটা। পঁচাত্তর দেব।’

‘নন,’ জবাব দিল ছেলেটা।

একটানে ছেলেটার হাত থেকে ছবিটা নিয়ে নিল লোকটা। ওর হাতে গুঁজে দিল কতগুলো নোট। নাও, একশোই দিলাম। অনেক কিছু কিনতে পারবে।’

হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে ছেলেটা। ফড়াৎ ফড়াৎ করে টেনে ছবিটা ছিঁড়ে ফেলল লোকটা। বড় একটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে লাইটার বের করে আগুন ধরিয়ে দিল টুকরোগুলোতে।

‘কে আপনি?’ চিংকার করে উঠল ছেলেটা। ‘আমার জিনিস কেন ছিঁড়লেন?’

বেঁটে, মোটা, কালো চুল, কালো দাঢ়ি এক লোক এগিয়ে এল। ‘ঠিকই করেছে ছিঁড়ে। ওর নাম আইজাক হফার। ওটা তারই আঁকা ছিল।’

চোয়াল ঝুলে পড়ল ছেলেটার। ‘আপনিই আইজাক হফার! একটা অটোগ্রাফ দেবেন?’

ছেলেটার বাড়িয়ে ধরা নোটবুকে হেসে সই দিয়ে দিল পাতলা লোকটা।

‘ইস!’ দুঃখ করে বলল ছেলেটা, ‘যদি ওই ছবিটাতে আপনার-সই নিতে পারতাম।’

হফারের মুখ থেকে হাসি চলে গেল। ‘ক্রিস্মাস ফ্যান্টামে জীবনে সই দেব না আমি।’

মোটা লোকটা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। ‘কেন রাগল জানো? তুমি নিশ্চয় জানো না, ওই সিরিজ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে হফারকে। ঠিকিয়েছে। হিরোয়িক কমিকস তার সমস্ত শিল্পকর্ম বিক্রি করে দিয়েছে, অথচ একটা পয়সা দেয়নি ওকে। তাই যেখানে যা পাচ্ছে নষ্ট করে ফেলছে সে, যাতে আরও দামি না হয়ে ওঠে, আরও বেশি রোজগার করতে না পারে হিরোয়িক কমিক।’

‘হফার!’ ডাক দিলেন ডিকসন। ‘আপনাকেই আমার দরকার ছিল। একটা জিনিস দেখাতাম। সংগ্রহে রাখার মত।’ মুখ বাঁকালেন তিনি। ‘কিন্তু এখন আর পারব না। চুরি হয়ে গেছে।’

‘তাই!’ স্টলের কাছে এগিয়ে এল মোটা লোকটা। ‘চোর বলছে তার দোকানে ডাকাতি হয়েছে। চমৎকার।’

জুলত চোখে লোকটার দিকে তাকালেন ডিকসন। ‘দেখ এডগার, আমার ব্যাপারে নাকি গলাতে এসো না!'

‘তুমি চোর নও বলতে চাও? লোকে পছন্দ করে কিনতে আসে বলে তাদের গলা কাট তুমি। তোমাদের মত লোকেরাই এই কালেকটিং ব্যবসাটাকে মাটি করল! সুযোগ পেয়ে ছিলে ফেল মানুষকে।’

স্টলের টেবিল ঘুরে এডগারের দিকে এগোতে গেলেন ডিকসন। তাঁর হাত চেপে ধরল হফার। তার হাতের উল্টো পিঠে কনভেনশন স্ট্যাম্প মারা দেখতে পেল কিশোর। ‘ওখানেই থাকুন। এডগার ঠিকই বলেছে। ডাকাতিই চলছে এখানে।

কমিক থেকে সবাই লাভবান হয়, কেবল আটিটি বাদে।'

'এই যে, ডিক্সন!' তাড়াহড়ো করে এগিয়ে এলেন কনভেনশন চীফ মুই মরগান। 'এইমাত্র পেলাম খবরটা। কি যে কাণ! কারও কোন দায়-দায়িত্ব নেই। আমি এখান থেকে সরেও সরতে পারলাম না, ঘটে গেল...! দৃঃখজনক। কি নিয়েছে চোর?'

'বেশি কিছু না। সব চেয়ে দামি যেটা নিয়েছে সেটা ফ্যান ফালের একটা কপি। তাতে হফারের কিছু কাজ করা ছিল।' হফারের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলেন ডিক্সন। 'থাকলে এখন ওকে দেখাতে পারতাম।'

'কমিক বিক্রির ব্যাপারে নানা জনের নানা মত থাকতে পারে,' বললেন মরগান। 'তবে চুরিদারিটা মানা যায় না। এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।'

'তা তো হবেই। চোখ খোলা রাখব আমরা,' এডগার বলল। 'হফার, চলো, যাই। রক অ্যাস্টারয়েড বোধহয় শুরু হয়ে গেল। এখনও গেলে ধরা যায়।'

রওনা হয়ে গেল দু'জনে।

'কয়েকজন ডিটেকটিভকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি আমি,' ডিক্সন বললেন। তিনি গোয়েন্দার পরিয়ে দিলেন মরগানের সঙ্গে।

কার্ডে চোখ বোলালেন মরগান। 'গোয়েন্দা, না? বেশ বেশ। সাহায্যের দরকার হলে জানিও। আমার এখন কাজ আছে, যেতে হবে। আরেক সমস্যা। গোল্ড রুমে রক অ্যাস্টারয়েডের সিরিয়াল দেখানো হবে, সব কটা, ষাট ঘণ্টা ধরে চলবে। অথচ চালানর মানুষই এখনও আসেনি। প্রোজেকশনিস্ট। এডগারকে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।'

জোরে নিঃখ্বাস ফেললেন তিনি। 'প্রোজেকটর সেট করেই রেখেছি। চালানর একজন মানুষ পেলেই এখন হয়ে যেত। কষ্টিউম প্রতিযোগিতাও শুরু হওয়ার সময় হয়েছে।'

কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়েই তাড়াহড়া করে চলে গেলেন তিনি।

'রক অ্যাস্টারয়েড?' ঠিক বুঝতে পারছে না রবিন।

চলিশ দশকের শেষ দিকে একটা বেশ চালু সায়েন্স ফিকশন সিরিজ ছিল, বোধহয় সেটার কথাই বলছে,' কিশোর বলল। হাতের বাক্সটা আবার টেবিলে নামিয়ে রেখে প্রায় দৌড় দিল মুই মরগানের পেছনে। রবিন আর মুসাও পিছু নিল।

মরগানকে ধরল কিশোর, 'স্যাব, এক সেকেণ্ড। একটা সাহায্য করবেন দয়া করে? শুই লোক দুটো কে, বলতে পারেন, একটু আগে যারা মিষ্টার ডিক্সনের স্টল থেকে গেল?'

'পাত্রমা, শুই লোকটার নাম আইজাক হফার। হবি অংকিবে এ-১ লেখক। খেটো লেক্টর নাম এডগার ডুফার। হফারের হাতের লেখা ভাল ন, তাই তার কমিকের কথাওলো লিখে দিতে হয় ডুফারকে। চন্দ্রকার মিলেছে তুঁজন, হফার এবং ডুফার।' হাসলেন মরগান। 'ডুফারটা পাজি। নিজের সম্পর্কে অনেক উচ্চ ধারণা। সবাইকে বলে বেড়ায়, তার অনেক বড় কিছু হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কমিক প্রকাশকদের জন্যে সেটা হতে পারেনি। খালি গোলমাল করার তালে থাকে এই লোক।'

‘হুফারের সঙ্গে ভাবসাব তো বেশ ভালই দেখলাম,’ কিশোর বলল।

‘তা তো থাকবেই। বললাম না দুঁজনে কেসাথে কাজ করে। মাসখানেক আগে হুফার থাকত ওহায়ওতে। আমার বিশ্বাস, লস অ্যাঞ্জেলেসে এসেছে এখানে তার কমিক কেমন চলে দেখতে। ভাল চললে থেকে যাবে। কিন্তু আসার পর থেকে কোন কমিক আঁকতে দেখিনি।’

এক মুহূর্ত চুপ থেকে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপর বললেন, ‘আমি তাকে কল্পনশনে দাওয়াত করেছি। সম্মান দেখিয়ে একটা ঘরও দিয়েছি থাকার জন্যে। মনে হয় ভুলই করে ফেলেছি।’

ঘড়ি দেখলেন মরগান। ‘দেরি হয়ে যাচ্ছে। যেতে হবে।’

তাড়াহড়া করে তাঁকে চলে যেতে দেখল তিন গোয়েন্দা।

‘ভালই একটা কেস মিলল মনে হচ্ছে,’ মুসা বলল।

‘সন্দেহ করার মত একজনকে পেয়েও গেলাম,’ রবিন বলল।

‘কার কথা বলছ?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর, ‘ডুফার, না হুফার?’

‘আইজাক হুফার। চুরিটাই সন্দেহজনক। হয়তো সে-ই করিয়েছে, ওই কমিকগুলো তার পছন্দ নয় বলে। ছেলেটার হাত থেকে নিয়ে কিভাবে নষ্ট করে ফেলল দেখলে না। ফ্যান ফানের ছবিগুলোও নিচয় তার পছন্দ ছিল না।’

‘বিস্মৃত কমিকগুলো চুরি হওয়ার পর পরই এসে উদয় হয়েছিল সে,’ মনে করিয়ে দিল মুসা। ‘ধোঁয়াও সরে সারেনি তখনও।’

‘হ্যাঁ’ মাথা দোলাল কিশোর। ‘লোকটা কোথায় উঠেছে, জানি আমরা। তার ঘরে গিয়ে দেখলেই তো পারি কমিকগুলো আছে কি-না?’

ম্বাজি হয়ে গেল অন্য দুঁজন।

রিসিপশন ডেস্ক থেকে হুফারের কুম নম্বর নিল কিশোর। তিন মিনিট পরেই ৩১৮ নাম্বার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

একবার দেখেই মাথা নাড়ল কিশোর, ‘এই তালা খুলে ঢোকা সহজ হবে না। বিশেষ যন্ত্রপাতি দরকার।’

ভুক্ত কুঁচকে তালাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। পাশের ৩২০ নম্বর ঘরের খোলা দরজার ওপর চোখ পড়তেই উজ্জ্বল হলো চেহারা। ছেট একটা টেলাগাড়ি রাখা দরজার পাশে। তার মানে ঘর যে পরিষ্কার করে সে ওটা নিয়ে এসেছে।

দরজায় জোরে জোরে দু'বার থাবা দিল কিশোর। ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘ভেতরে কেউ আছেন?’ এপাশ ওপাশ একবার তাকিয়েই চুক্তে পড়ল শূন্য ঘরের ভেতরে। পেছনে চুক্তল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

‘এবার?’ জানতে চাইল মুসা, ‘ওয়ারে যাব কি করে? দেয়াল ফুটো করে?’

‘তার দরকার হবে না,’ বলতে বলতে স্লাইডিং-গ্লাস ডোরের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে। এখান থেকে হোটেলের ভেতর দিকের চতুর আর সুইমিং পুল চোখে পড়ে। বাঁয়ে তাকাল সে। ৩১৮ নম্বর ঘরের ব্যালকনির দরজা রয়েছে চার ফুট দূরে। ‘ছেট একটা লাফ দিলেই পৌছে যাওয়া যায়,’ আনন্দে বলল। ‘তবে সেই লাফটা দেয়ার মত লোক প্রয়োজন, খেলাধুলায় যে পারদর্শী। বিশেষ করে ফুটবল প্রেয়ার।’

‘না না,’ তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা। ‘আমি পারব না!'

তাকে রাজি করাতে কয়েক সেকেণ্টের বেশি লাগল না কিশোরের। ২২০ নম্বর  
ঘরের ব্যালকনির রেলিঙে চড়ে বসল মুসা। বিড়বিড় করে বলছে, ‘জালিয়ে মারল! কিছু  
বলতেও পারি না! গাধার মত রাজি হয়ে যাই! ’ কিশোরের দিকে তাকাল না।  
জানে, কি দেখতে পাবে। দেখবে, মুচকি হাসছে গোয়েন্দাপ্রধান। চোখে চোখ  
পড়লে হা হা করে হেসে ফেলবে। ওকে সেই সুযোগটা দিতে চাইল না।

কিন্তু রবিনকে ঠেকানো গেল না। হেসে বলল, ‘দেরি করছ কেন? লাফ দাও।  
মাত্র তো চার ফুট! ’

‘তা তো বটেই,’ গজগজ করল মুসা। ‘মাত্র চার ফুটই যদি কোনভাবে মিস  
করি, পড়ব গিয়ে তিরিশ ফুট নিছে। ’

শক্ত করে রেলিঙ চেপে ধরে আছে সে। বুড়ো আঙুলের ওপর ভর রেখে  
আচমকা হাত ছেড়ে দিল। চোখ সামনের ব্যালকনির দিকে। নিচে তাকাচ্ছে না।  
লাফ দিল অনেকটা ব্যাঙের মত করে।

অন্য ব্যালকনিটা যেন উড়ে চলে এল তার কাছে। ডান পা-টা রেলিঙে  
জায়গামতই বসল, কিন্তু পিছলে গেল বাঁ পা। দম বন্ধ করা ভয়াবহ একটা মুহূর্ত,  
উল্টে পড়ছে সে। দু’হাতে থাবা দিয়ে ধরে ফেলেছে রেলিং। চেপে ধরার ফলে  
সাদা হয়ে গেছে হাতের পেছনটা। ধীরে ধীরে টেনে তুলতে লাগল শরীরটাকে।

অনেক কষ্টে পতন রোধ করে আবার শক্ত হয়ে বসল রেলিঙে। লাফিয়ে নামল  
ব্যালকনিতে। ফিরে তাকাল বস্তুদের দিকে।

অর্ধের্ষ ভঙ্গিতে হাত তুলে কাচ লাগানো দরজাটা দেখাল কিশোর। ঢোকার  
ইঙ্গিত করল।

‘বাহ, চমৎকার,’ তিক্ত কষ্টে বলল মুসা, ‘আমার জন্যে খুব তো চিন্তা করো  
দেখছি! ’

দরজার কাছে গিয়ে কাচের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল সে। কাউকে দেখতে পেল  
না। দরজা খোলার জন্যে নব ধরে টানতেই নিঃশব্দে খুলে গেল পাণ্ডা।

ভেতরে চুকল মুসা। ভাল মত দেখে নিল হফার আছে কি-না ঘরে। নেই।  
অসংখ্য বোর্ডে আঁকা রয়েছে নানা রকম ড্রাইং, সম্মেলনে বিক্রির জন্যেই নিচ্য  
ঝঁকে রেখেছে হফার। কিছু পত্রপত্রিকাও চোখে পড়ল। বেশির ভাগই কমিক  
ম্যাগাজিন। ওগুলোতে ফ্যান ফ্লনের কপিটা দেখতে পেল না সে।

আলমারির দরজা খুলে দেখল ভেতরে আলবেঙ্গুটা আছে কি-না। তা-ও  
নেই। তারপর ড্রেসারে খুঁজতে এল মুসা। প্রথম ড্রয়ারটা সবে টান দিয়ে খুলেছে,  
এই সময় নড়াচড়া লক্ষ করল পেছনে।

ঝট করে সোজা হয়ে চুকির মত পাক খেয়ে ঘুরল সে। জমে গেল যেন বরফ  
হয়ে। বাথরুম থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা কুৎসিত মূর্তি। শরীরটা  
মানুষের মত, বিশাল চওড়া বুকের ছাতি, পরনে কালো জিনসের প্যান্ট। মুখটা  
ভয়ঙ্কর। সবুজ রঙের একটা গিরগিটির মুখকে যেন বিকৃত করে দেয়া-হয়েছে।  
কমিকের ক্রগ মিউট্যান্ট।

জীবটা ষে মানুষ, সেটা বুঝতে সময় বেশি লাগল না মুসার। তবে যতটুকু

লাগল, তাতেই দেরি হয়ে গেল। মানুষটা লাফ দিয়ে সরে এল তার কাছে, ধ্বং করে চোয়ালে ঘুসি মেরে বসল।

টলে উঠল মুসা। বটকা দিয়ে পেছনে সরে গেল মাথাটা, বাড়ি লাগল ব্যালকনিতে বেরোনৱ দরজার ফ্রমে।

প্রচণ্ড ব্যথায় যেন অঙ্ক হয়ে গেল মুসা। ওই অবস্থায়ই কারাতের কোপ বসানৱ চেষ্টা করল লোকটার ঘাড়ে। লাগতে পারল না। মারটা সহজেই ঠেকিয়ে ফেলল ফ্রগ মিউট্যান্ট, আবার ঘুসি মারল। পেছনে যেন উড়ে গেল মুসার শরীরটা, বেরিয়ে গেল দরজার বাইরে।

ব্যালকনির রেলিঙে ধাক্কা খেল সে, তারপৱ উল্টে পড়তে শুরু করল। পাগলের মত হাত বাড়িয়ে রেলিং ধরার চেষ্টা করল, কিছুই ঠেকল না হাতে। চারিদিকে সব ঝাঁকা, শুধুই শূন্যতা।

## চার

মাথা নিচু করে নিচের চতুরে পড়তে যাচ্ছে মুসা। মরিয়া হয়ে শূন্যেই শরীরটাকে বাঁকাল সে। বান মাছের মত শরীর মুচড়ে সরাসরি চতুরে পড়া থেকে বাঁচল কোনমতে। ডাইভিং বোর্ড থেকে বাঁপ দিতে দিতেই এই কায়দাটা রঞ্জ করেছে। সুইমিং পুলের দিকে সরে চলে এসেছে। নামছে তীব্র গতিতে। এই ডাইভ তাকে অলিম্পিকের স্বর্ণপদক এনে দেবে না, কিন্তু পদকের চেয়ে অনেক অনেক দামি জীবনটা তো বাঁচল।

ঝপাং করে পানিতে পড়ল মুসা। যতটা ডোবার ভুবে ভেসে উঠতে শুরু করল। ভুস করে মাথা তুলল পানির ওপৱে। জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। কাঁপছে এখনও। অল্লের জন্যে বেঁচেছে। পুলের কিনার থেকে ডজনখানেক হাত এগিয়ে এল তাকে টেনে তোলার জন্যে। কিন্তু যেখানে ছিল সেখানেই রাইল সে, শক্টা হজম করে নেয়ার জন্যে।

আরেক থাই নামল নাকি, ভাবছে মুসা। তার সামনের লোক-গুলোকে মনে হচ্ছে স্টার ও অরস ছবির এক্সটাদের মত। রোবট, সবুজ মানুষ, মূল মাথা ছাড়াও আর দুটো বাড়ি মাথাওয়ালা মানুষ, আর বিচিত্র সব জীব। ওরাও আসলে মানুষ, এই সাজে সেজেছে।

মুসার মনে পড়ল কষ্টিউম কনটেক্টের কথা। সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছে অনেকে। তাদের ঠিক মাঝখানেই পড়েছে সে। তীরে দাঁড়ানো অনেকের চোখেই বিরক্ষি দেখতে পেল। কারণ আছে। আচমকা পড়ে ওদেরকে ভিজিয়ে দিয়েছে সে।

তার পরেও কয়েকজন টেনেটুনে তুলল ওকে। ওদের মাঝে তার বক্স কিশোর আর রবিনও রয়েছে।

‘কি হয়েছে?’ জানতে চাইল রবিন।

ভিড় সরানোর চেষ্টা করছে কিশোর।

‘দেখলাম চুকলে,’ রবিন বলছে, ‘একটু পরেই দেখি দরজা দিয়ে উড়ে

বেরোলে। ব্যাপারটা কি?

‘উড়তে সাহায্য করা হয়েছিল আমাকে। এমন জোরে ঘুসি মারল...’  
‘তোমার মত মানুষও সামলাতে পারল না,’ কথাটা শেষ করে দিল রবিন।  
‘কে মারল? হফার? না লাল আলখেল্লা পরা লোকটা?’

মাথা নাড়ুল মুসা। ‘আমার মনে হয় না ভূত্টা হফার। ওর ঘরে কোন কষ্টিউম দেখলাম না। আমাকে যে মেরেছে তার গায়ে মোষের জোর। সারা গায়ে পেশী আর পেশী। মুখ দেখতে পারিনি। ফ্রগ মিউট্যান্টের মুখোশ পরা ছিল।’

‘হ্যাঁ’ আনন্দনে বিড়বিড় করল কিশোর। দু'জন ঝুটল এখন। একজন কমিক লিখে হিরো হয়ে গেছে, আরেকজন মুখোশ পরে ভিলেন সেজেছে, চূরি করে চুকেছে হফারের ঘরে।’ মুখ তুলল। ‘দু'জনের মাঝে সম্পর্ক নেই তো?’

‘ওই যে, এসে গেছে,’ নিচু গলায় বলল রবিন।

হোটেলের বেঁজার পরা একজন লোক এগিয়ে এলেন। পকেটের মনোগ্রাম দেখে বোো গেল, তিনি হোটেলের ম্যানেজার। চেহারাটা রুক্ষ, মোটেও আন্তরিক নয়। পেছনে দৌড়ে আসছেন আরেকজন, লুই মরগান।

‘কি হয়েছিল?’ কাছে এসে জিজেস করলেন ম্যানেজার।

‘আমি-ইয়ে...পড়ে...গিয়েছিলাম,’ আমতা আমতা করে জবাব দিল মুসা।  
প্লাটিকের একটা পুল চেয়ারে বসেছে।

‘পড়ে গিয়েছিলে? কি করে? কোথেকে?’ মুসার ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন ম্যানেজার।

‘আমি...’ মরিয়া হয়ে যেন চারপাশে তাকাল মুসা। তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল কিশোর।

‘আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়া দরকার,’ ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে  
কড়া গলায় বলল কিশোর। ‘ব্যালকনিতে ওগলো কি রেলিং লাগিয়েছেন? এত  
নিচু! পড়ল তো সেজন্যেই। ভাগিয়স ডাইভ দেয়ার অভ্যেস আছে ওর। নইলে  
তো...’ কেঁপে ওঠার অভিনয় করল গোয়েন্দপ্রধান। ‘দরজার দিকে তাকিয়ে  
পিছিয়ে এসেছিল আমার বন্ধু। হঠাৎ দিল হাঁচি। তাল সামলাতে না পেরে উল্টে  
পড়ে গেল। আপনাদের রেলিংগুলো আরেকটু উচু হলে এই অবস্থা হত না।  
শুকনোয় পড়ে যদি মরত, পারতেন আর ফিরিয়ে দিতে?’

কিশোরের এই ভাষণে থতমত খেয়ে গেছেন ম্যানেজার। সামলে নিয়ে শীতল  
দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজেস করলেন, ‘তুমি এই হোটেলের গেস্ট?’

এগিয়ে এলেন লুই মরগান। ‘হ্যা। রুম নম্বর তিনিশো ষোলো। আমার সঙ্গে  
উঠেছে।’

প্রতিবাদ করল না কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে মরগানের দিকে।

‘তাই! কনডেনশন চীফের দিকে ঘুরলেন ম্যানেজার। দিনটাই আজ খারাপ  
যাচ্ছে, কি বলেন মিষ্টার মরগান? প্রথমে হলো ডাকান্তি, তারপর এই কাও...আশা  
করি আর কোন গোলমাল দেখতে হবে না আজ।’ বশে রওনা হয়ে গেলেন

গটমট করে হেঁটে যাচ্ছেন ম্যানেজার। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিশোরকে  
জিজেস করলেন মরগান, ‘তদন্ত করতে গিয়েই নিশ্চয় এটা ঘটল?’

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল কিশোর। 'তদন্ত করতে গেলে অনেক সময় মাথার ঠিক থাকে না মুসার, উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে। বোধহয় পানিতে ঝাপ দেয়ার শব্দ হয়েছিল। যা-ই হোক, সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু ম্যানেজার যদি তিনশো ঘোলাতে আমাদের খোজ নিতে যান...?'

'তাহলে তোমাদের পেয়ে যাবেন। ঘরটা তোমাদেরকে দিতে চাই। পাশের ঘরটাই আমার, দু'শো আট নম্বর। আমি বুঝতে পারছি, এই কেসের তদন্ত করতে হলে হোটেলের একটা ঘর তোমাদের লাগবেই।' চাবি বের করে দিলেন মরগান। 'তোমার বস্তুর কাপড় বদলানোও দরকার। তবে, ভিজে কাপড় গায়ে লেপটে সগিম্যান সেজে থাকার ইচ্ছে যদি হয়ে থাকে আমার আপত্তি নেই।' জোরে একটা নিঃশ্঵াস ফেলে বললেন, 'বিচারক মণ্ডলীকে বলে দেব, এই কষ্টিউম যেন শো করার ব্যবস্থা করা হয়।'

এমন ভঙ্গিতে বললেন মরগান, সত্যি ভেবে বসল মুসা। তাড়াতাড়ি হাত তুলে নিষেধ করল, 'না না, ওকাজ করবেন না!'

হাসলেন মরগান। এগিয়ে গেলেন বিচারকের মধ্যের দিকে।  
তিন গোয়েন্দা চলল ৩১৬ নম্বর কামরায়।

ঘরে দুটো ডাবল বেড আছে, একটা ড্রেসার আছে, আর আছে একটা তালা দেয়া দরজা, যেটা খুললে ৩১৪ নম্বরে ঢেকা যায়।

তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল মুসা। এখানে রবিন আর কিশোরের আপাতত কিছু করার নেই। আবার নিচে রওনা দিল দু'জনে।

সম্মেলনে যাওয়ার টিকেট চেক করছে এখন অন্য একজন। গোলগাল মুখ, যেন একটা কুমড়ো। এলোমেলো চুল। লোকের টিকেট দেখে হাতের উল্টো পিঠে সীল মেরে দিচ্ছে। দরজা পাহারা দিতে বসেছে এখন সেই মেয়েটা, যার চুল দুই রঙে ডাই করা, যে তিন গোয়েন্দাৰ হাতে সীল মেরেছিল। কিশোরের দিকে একবার চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল সে। কিন্তু রবিনের দিকে তাকিয়েই রইল। হাসল। বলল, 'হাই, আমার নাম ডোরা।'

রবিন তার মধুরতম একটা হাসি উপহার দিল মেয়েটাকে। 'ডোরা! চমৎকার নাম! আমার খুব পছন্দ। আচ্ছা, ডোরা, ওই স্মোক বৰ্ষ ফাটার পর কালো আলঝেন্ট্রা পরা কোন মানুষকে কি এখান দিয়ে যেতে দেখেছ?'

রবিনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। মাথা নাড়ল।

এডগার ডুফারের বর্ণনা দিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল ডোরাকে, ওরকম কাউকে যেতে দেখেছে কি-না।

ভুকুটি করল মেয়েটা। 'ওরকম মোটকা কত লোক এখানে কমিক কিনতে আসে জানো? হাজার হাজার। ওদের ন'শো নবই জনই যায় এখান দিয়ে। সব দেখতে এক রকম। কতজনের কথা মনে রাখব?'

'এই লোকটা মোটামুটি পরিচিত,' রবিন বলল। 'কমিকের লেখা লেখে। দাড়ি আছে...'

ডুফারের কথা বলছ না তো? তোমার বস্তু তাহলে ওকথা বললেই পারত, নামটা বললেই বুঝতে পারতাম। হ্যাঁ, দেখেছি। এই তো মিনিট দুই আগে বেরিয়ে

ରେଟ୍‌ରେନ୍‌ଟେ ଦିକେ ଗେଲ ।

‘ରେଟ୍‌ରେନ୍‌ଟେ ଏସେ ଲୋକଟାକେ ପେଲ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରାରା ।

‘ଓଡ଼େରକେ ଲାକ୍ଷେର ଦାସ୍ୟାତ ଦିଲ ଡୁଫାର । ଚଳୋ, ବାଇରେ ଟେବିଲେ ଗିଯେ ବସି । ତାହଲେ ଥେତେ ଥେତେ ସମେଲନ ଦେଖତେ ପାରବ ।’

ସୋନାଲି ଚଳୁଯାଳା ମେଯେଟାକେ ଆରେକବାର ଦେଖାର ଆଶାଯ ରାଜି ହେଁ ଗେଲ କିଶୋର ।

ସୁଇମିଂ ପୁଲେର କିନାରେ ଏକଟା ଟେବିଲେ ଏସେ ବସଲ ଓରା । ଛାତାର ନିଚେ । ସମେଲନ ଚଲିଛେ । ଏକଜନ କରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀର ନାମ ଘୋଷଣା କରା ହଛେ, ଆର ସେଇ ଭିଡ଼ ଥେକେ ବେରିଯେ ଏସେ ହାଟ୍‌ଟଛେ ସୁଇମିଂ ପୁଲେର କିନାର ଦିଯେ, ଚାରପାଶେ ଏକ ଚକ୍ର, ଦର୍ଶକ ଆର ବିଚାରକ ମଙ୍ଗୀକେ ଦେଖାଛେ ତାର ପୋଶାକ ।

ଦୁଟୋ କରେ ଚାଇବାର୍ଗରେ ଅର୍ଡା ଦିଲ ଡୁଫାର ।

ଏକଟା କରେ ତୁଲେ ନିଲ କିଶୋର ଆର ରବିନ ।

କାମଡ ବସାଲ କିଶୋର । ଚିବିଯେ ଗିଲେ ନିଯେ ବଲଲ, ‘କମିକେର ବ୍ୟାପାରେ ଆମାଦେର କିଛୁ ତଥ୍ୟ ଦରକାର । ଆପଣି କି ବଲତେ ପାରବେନ?’

ଭୁରୁ କୁଞ୍ଚକେ ଗେଲ ଡୁଫାରେର । ଦାଡ଼ି ଓ ଯେନ ଉଠେ ଏଲ ସାମାନ୍ୟ ଓପରେ । ‘ବଲୋ, କି ଜାନତେ ଚାଓ?’

ଓରା କଥା ବଲିଛେ, ଏହି ସମୟ ପୁଲେର କିନାରେ ଏସେ ଦୌଡାଲ ଆରେକଜନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ । ଅନ୍ତ୍ରତ ଏକ ପୋଶାକ ପରେଛେ । ଯେନ ବିଶାଲ ଏକଟା ଟୋଷ୍ଟାରେର ଭେତରେ ଚୁକିଯେ ନିଯେଛେ ଶରୀରଟା । ହାତ, ପା ଆର ମୁଖ ବେରିଯେ ଆଛେ ଶୁଦ୍ଧ ।

କିଶୋରର ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବେ ଡୁଫାର ବଲଲ, ‘ଆମି କମିକ ସଂଘର କରି, ତାର କାରଣ, କରତେ ଆମାର ଭାଲ ଲାଗେ । ପାତା ଉଲ୍ଟାଇ ଓଣଲୋର । କୋନ ଛବି ଭାଲ ଲେଗେ ଗେଲେ, ମେଣଲୋର ମାଝେର ଫାଁକା ଜାଯଗାଯ ଲିଖି ନିଜେର ମତ କରେ । ଲିଖିତେ ଆମାର ଭାଲ ଲାଗେ । କମିକ ଅନେକେଇ ପଢନ୍ତ କରେ, ତବେ ଶୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିତେଇ । ଆଁକାଆଁକି କିଂବା ଲେଖାର ଝୋକ ନେଇ ତାଦେର ।’

‘ସବାର ନେଇ,’ ରବିନ ବଲଲ । ‘ଏକଥା ବଲା ଯାବେ ନା ।’

‘ତା ଠିକ । ଆମାର ଆଛେ । ହଫାରେରେ ଆଛେ । ଓ ଅବଶ୍ୟ ଲିଖିତେ ପାରେ ନା, ହାତେର ଲେଖା ଭାଲ ନୟ ତୋ । ତବେ ତାର ଛବିଙ୍ଗଲୋ ଦେଖାର ମତ, କି ବଲୋ?’

ମାଥା ଝାକାଳ କିଶୋର । ଚୋଥ ଅନ୍ୟଦିକେ । ତାକିଯେ ରଯେଛେ ସେଇ ମେଯେଟାର ଦିକେ । ସୋନାଲି ଚଳ ।

ବଲେ ଚଲେଛେ ଡୁଫାର, ‘ହଫାରେର କାଜଙ୍ଗଲୋ ଏକେକଟା କ୍ଲ୍ୟାସିକ । ଦଶ ବଚର ଆଗେ, ମାତ୍ର ଆଠାରେ ବଚର ବୟାପେ ଏହି ଦୂର୍ଦାତ ଏକ ହିରୋ ତୈରି କରେ ବସେଛିଲ ସେ । ଗଲ୍ଲ ତୈରି କରଲ, ଛବି ଆଁକଲ, ଛା ପତେ ଦିଲ ଏକ କମିକ ମ୍ୟାଗାଜିନେ । ସାଂଘାତିକ ସାଡ଼ା ଜାଗାଳ । ରାତାରାତି ଅଂସଥ୍ୟ ଭକ୍ତ ଜୁଟେ ଗେଲ ତାର । କମିକେର ନାୟକେର ନାମ ରେଖେଛିଲ ସେ, ଗ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟମ ।’

ହାସଲ ଡୁଫାର । ‘ଫ୍ୟାନ୍ଜାଇନ ମ୍ୟାଗାଜିନେ ଛାପାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଁଛିଲ ତାର କମିକ । ରଙ୍ଗେର ବ୍ୟାପାରେ ଏକଟା ବାଧା ଛିଲ । ଚାର ରଙ୍ଗ ଛାପାର ଉପାୟ ଛିଲ ନା, ସାଦା-କାଲୋତେ ଛାପା ହତ ମ୍ୟାଗାଜିନଟା । ତୃତୀୟ ଆର ଏକଟାମାତ୍ର ରଙ୍ଗ ଛାପା ଯେତ, ତାହଲ ଧୂସର । ଆର ତାଇ ବାଧ୍ୟ ହେଁ ନାୟକେର ନାମ ଦିତେ ହଲୋ ହଫାରକେ, ଗ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟମ ବା ଧୂସର

ভূত। ওই রঙেতেই ছাপল তার কমিক। যা-ই হোক, খুবই সাড়া জাগাল গ্রেফ্যান্টম। হিরোয়িক কমিকস নামে একটা কোম্পানি কাজের অফার দিল হফারকে; এবং তখন তার হিরোর নাম হয়ে গেল...'

'ক্রিমসন ফ্যান্টম!' প্রায় চিৎকার করে বলল রবিন। টকটকে লাল ওই হিরোর গল্প আমি পড়েছি!'

'হফারের এক সাংঘাতিক সৃষ্টি। শুধু যে কাহিনীই ভাল, তা-ই না, আকতেও পারে বটে লোকটা। আর সব কমিকের চেয়ে একেবারে আলাদা, গতানুগতিকার বেড়া ডিঙাল ক্রিমসন ফ্যান্টম। তারপরে রয়েছে একটা বিশেষ ব্যাপার...'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'ঠিকই বলেছেন। গোপন গোপন ভাব। একটা রহস্য। ক্রিমসন ফ্যান্টম যে আসলে কে, তা-ই জানে না লোকে। তার পরিচয় গোপন থাকে। ওভাবেই কাজ করে যায় সে। তিন-চার রূপ, একেক বার একেক রূপে উদয় হয়। কমিকের তিন-চারটে চরিত্রের যে কোন একটা হতে পারে সে, কোনটা আসল ফ্যান্টম, বোৰা মুশকিল। ওই ধাঁধার জবাব খুঁজতে খুঁজতে তো মাথাই খারাপ হয়ে যেত আমার।'

'এ যাবৎ হাতে গোনা যে কটা ভাল কমিক বেরিয়েছে, তার মধ্যে একটা ছিল ওই ক্রিমসন ফ্যান্টম,' ভোঁতা গলায় বলল হফার। 'অথচ ধ্রংস করে দেয়া হলো ওটাকে।'

'ধ্রংস?' এতক্ষণে সতর্ক হলো কিশোর, 'কিভাবে?'

নীল বোরাম নামে একজন লোকের সঙ্গে কাজ করত হফার। লোকটা ছিল তার কমিকের এডিটর। বোরামকে বিশ্বাস করেছিল সে। কপিরাইটের ব্যাপারে কি জানি একটা ঘাপলা বাধিয়ে ক্রিমসন ফ্যান্টমের কপিরাইট নিজের নামে করিয়ে নিল বোরাম।' টেবিলে চাপড় মারল দুফার। 'মহা শয়তান। নিয়ে নেয়ার পর সিরিজটাকে আরও জনপ্রিয় করার জন্যে নানা রকম কায়দা করতে লাগল সে। একটা বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করল। ক্রিমসন ফ্যান্টম আসলে কোন চরিত্রটা, বলতে পারলে পুরুষার দেয়া হবে।'

রাবিন বলল, 'ওই প্রতিযোগিতার কথা জানি আমি।'

'তা তো জানবেই। অনেক ছেলেই জানে ক্রিমসন ফ্যান্টম প্রতিযোগিতার কথা। তারপর আরও দুটো নতুন ক্রিমসন ফ্যান্টম বই বের করল বোরাম। একটার নাম দিল সিক্রেটস অভ দি ক্রিমসন ফ্যান্টম, আরেকটা দ্য ব্যাটেলিং ক্রিমসন ফ্যান্টম। নতুন লেখক আর আটিষ্ট নিয়োগ করল একাজে। ওরা খারাপ করেনি, তবে হফারের তুলনায় একেবারেই সাধারণ।'

রাগে ভূরু কোঁচকাল দুফার। 'আসলে চরিত্রটার যা যা বিশেষত্ব ছিল, সব নষ্ট করল বোরাম, খুন করল চারিত্রটাকে। ক্রিমসন ফ্যান্টম এখনও আছে, ভালই বিক্রি হয়, তবে এটা একেবারেই অন্য কমিক। আসলটার ধারেকাছেও লাগে না। অবশ্য বিক্রি হয় প্রচুর। হিরোয়িক কমিকসকে তুলেছে ওটাই, বোরামকেও বড়লোক বানিয়েছে।'

'এডগার দুফার কিছুই করতে পারল না?' প্রশ্ন করল কিশোর। এই সময় ওদের টেবিলের পাশ দিয়ে গেল কষ্টিউম পরা আরেকজন প্রতিযোগী। এই

লোকটার পোশাক বিচ্ছি। টমেটোর চারপাশে সাজিয়ে রাখা অনেকগুলা লেটসপাতা যেন বিশাল আকার নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'চেষ্টা অনেকই করেছে,' জানাল ডুফার। 'ঠেকানর চেষ্টা করেছে বোরামকে। পারেনি। আর পারবেই বা কি করে? চালাকি করে ততদিনে ক্রিমসন ফ্যান্টমের কপিরাইট নিজের নামে করে ফেলেছে বোরাম। ডুফার ভাবল, সে কাজ না করলেই কমিকটা বন্ধ হয়ে যাবে, আর কেউ আঁকতে পারবে না। তাই হিরোয়িক কমিকস থেকে বেরিয়ে চলে আসে সে। কিন্তু বোরাম ধূরঙ্গর লোক। অন্য লোক দিয়ে কমিক আঁকাতে শুরু করল। কিছুই করতে না পেরে নিজের সৃষ্টির ওপরই ভীষণ রেগে গেল ডুফার। যেখানেই পায় নষ্ট করে ফেলে। তোমাদের সামনেই তো নষ্ট করল। দেখলেই ওরকম করে পোড়ায়।'

'তার মানে,' কিশোর বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন কোম্পানিটা ক্রিমসন ফ্যান্টমের ভক্তদেরকে ঠকাচ্ছে?'

'ঠকাচ্ছে আসলে অনেকেই, এক বোরাম নয়,' হাত ওল্টাল ডুফার। ঘুরে তাকাল পাশের টেবিলে বসা কালো-চুল এক তরুণের দিকে। তাকে বলল, 'অ্যাই, পিটার, তোমার কাছে ওভারল্ট্রাইটের কপি আছে?'

বার্গার খাচ্ছিল লোকটা। হাতের খাবার পেটে নামিয়ে রেখে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বের করে আনল একটা দোমড়ানো মোটা বই। 'এই নাও,' বলে ছুড়ে দিল ডুফারের দিকে।

লুক্ষে নিল ডুফার। টেবিলে বিছিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল। 'এই যে, পাওয়া গেছে। সেরিবাস। সাদা-কালো কমিক, প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সাতাত্তর সালে। আসল একেকটা কপি বিক্রি হবে এখন পাঁচশো ডলারে। এই যে, দেখ, নকলও রয়েছে। জালিয়াতি। যারা চেনে তারা ঠিকই বুঝতে পারবে এটা নকল। নকলগুলো বিক্রি হয় বিশ-তিরিশ ডলার দামে।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে গিয়ে বইটা ফেরত দিয়ে এল ডুফার। ছেলেদেরকে বলল, 'কমিক ভক্তদের ব্যাপারটা বুঝি না। অনেক সময় যারা ঠকায় তাদেরও লাভবান করে দেয়। জাল বলেই কিনে নেয় অনেকে অনেক দাম দিয়ে, সংগ্রহে রাখার জন্যে।'

আবার ভুকুটি করল ডুফার। 'ঠিকিয়েও পয়সা কামায়। লোকে আসল ভেবে বেশি দাম দিয়ে কেনে। লাভটা যায় প্রকাশকের পকেটে। সেগুলো বিক্রি করারও মানুষ আছে। আসল বলে গছিয়ে দেয় ক্রেতাকে।'

মুখ তুলল কিশোর, 'যেমন? কার মত বিক্রেতা?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল ডুফার। 'লোকে তো প্রায়ই অভিযোগ করে জেমস ডিকসনের নামে। ওর কাছে কিছু কিনতে গেলে সাবধান। হাতে ঘড়ি থাকলে, হাত মেলানৰ পর ভালভাবে দেখে নেবে বদলে দিল কি-না।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল সে।

প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। বিজেতার নাম ঘোষণা করার আগে বাঁশি বাজল। ঘোষণা করলেন বিচারক। প্রথম হয়েছে রোমশ পোশাক পরা একজন। ও সেজেছিল প্রোজ দ্য প্ল্যানেট ইটার।

পাশের টেবিলে বিরক্তি প্রকাশ করল পিটার। 'এটা একটা কাজ হলো? আমি তো ভেবেছিলাম ওই সোনালি চুল মেয়েটাই জিতবে!'

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে কিশোরও একই কথা ভাবছে, তবে সেটা প্রকাশ করল না।

উঠে দাঁড়াল দুফার। 'এবার যেতে হয়। রকের জাহাজ ভাঙার তোড়জোড় করছে মাকর্ম্যান।' দ্রুত গিয়ে খাবারের বিল দেয়ার জন্যে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল সে।

হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। হেসে উঠল পিটার। 'বুঝলে না? রক অ্যাস্টারয়েড ছবির কথা বলল দুফার। সিনেমার খুব ভক্ত, সাইন্স ফিকশন। অনেক কিছুই মনে রাখে। ভাল ভাল ডায়লগ মুখস্থ করে রাখে, জায়গা মত ঝাড়ে। হাহ হা।'

উঠে দাঁড়াল রবিন। বিড়বিড় করে বলল, 'কি সব মানুষ! সবাই-ই পাগল নাকি এখানকার!'

বেরোনোর জন্যে রওনা হল দুই গোয়েন্দা। চোখের কোণ দিয়ে কিশোর দেখতে পেল সোনালি ঝিলিক।

ঘুরে তাকাল সে। রেটুরেন্টে ঢোকার মুখের কাছে একটা টেবিলে বসেছে সোনালি চুল মেয়েটা। সঙ্গে আরেকজন বয়ক মহিলা, বোধহয় মেয়েটার মা। তৃতীয় আরও একজন রয়েছেন, যাঁকে চিনতে পারল কিশোর। সেই টাকমাথা লোকটা, ম্যাড ডিকসনের কাছ থেকে যে ফ্যান ফানের কপিটা কিনতে চেয়েছিলেন।

দরজার দিকে এগোনোর সময় কথা কানে এল কিশোরের। টাকমাথা লোকটার সঙ্গে কথা বলার সময় মেয়ের কাঁধে আলত চাপড় দিল বয়ক মহিলা। বলল, 'ফটোকভারের জন্যে আমাদের মিরার মত মেয়ে আর পাবেন না, মিস্টার বোরাম। ও আপনার পারফেক্ট মডেল।'

ও, এ-ই তাহলে নীল বোরাম, ভাবল কিশোর, আইজাক হফারের প্রথম দিককার কাগজগুলোর ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন লোকটা?

হঠাৎ রাগী একটা জোরাল কষ্ট শুনে ঘুরে তাকাল সে। প্রবেশ পথের একটু দূরে চোখমুখ লাল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে হফার। চিৎকার করে বলল, 'হচ্ছে কি এখানে, মরগান! আমার ঘরে কে জানি চুকে সব তচ্ছচ করে দিয়েছে!'

## পাঁচ

'হফার,' মরগান বললেন, 'এসব নিয়ে কি এখানেই কথা বলতে হবে?' দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন, মুখ দেখেই অনুমান করা যায়। ইতিমধ্যেই লোক জমা আরঙ্গ হয়েছে। কৌতুহলী চোখে তাকাচ্ছে দু'জনের দিকে।

জনতার ভিড়ে সামিল হলো কিশোর আর রবিন।

চিৎকার করে বলছে তখন হফার, 'কে জানি চুকেছিল আমার ঘরে! আমার কাপড় কেটেছে, চিরে ফালাফালা করেছে সমস্ত ছবি!'

গুঞ্জন উঠল সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ।

‘ও কাজ কে করতে যাবে?’ মরগানের প্রশ্ন ।

‘সেটাই তো জানতে চাইছি আমিও । তোমার সিকিউরিটি কোথায়? এটা কি ধরনের সম্মেলন হলো?’

আটিস্টকে শাস্তি করার চেষ্টা করলেন মরগান, ‘তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি । যদি যেতে চাও...’

‘যেতে চাইব?’ গলা আরও চড়ল ছফারের । ‘আমি যেতে চাই না । আমি চাই ওই লোকটাকে । আপনি জানেন, কি করে আমার জিনিসগুলো নষ্ট করেছে সে! আমি এখানে টাকা রোজগারের জন্যে এসেছিলাম এবং সেটা করেই ছাড়ব আমি । তার জন্যে যা কিছু করতে হয় করব।’

দুপদাপ পা ফেলে চলে যাওয়ার সময় ঘুরল সে । ‘আমাকে প্রয়োজন হলে কনভেনশন প্ল্যাটের খোঁজ করবেন।’

ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জনতা । গুঞ্জন করছে । মরগানের পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন ।

মাথা নাড়ছেন তিনি । ‘দেখলেন কাণ্টা? কমিক বুকের আর্টিস্টেরও কত দাপট?’ শ্রাগ করলেন । ‘হফারের এখানে আসার উদ্দেশ্য ছবি বিক্রি করা । সেটা করতে না পারলে হোটেলের ভাড়া নিয়েই বিপদে পড়ে যাবে।’

মাথা বাঁকাল কিশোর । টাকার প্রয়োজন অনেক সময় মানুষকে চুরি করতে বাধ্য করে । ‘আরও কয়েকজনের ব্যাপারে আমার আগ্রহ আছে, প্রশ্ন করতে চাই । সোনালি পোশাক পরা মেয়েটা কে?’

হাসলেন মরগান । ‘ও, মিরিনা জরডানের কথা বলছ? মেয়েটা যথেষ্ট চালাক । সম্মেলনে এই প্রথম যোগ দিয়েছে । স্বীকার করতেই হবে, স্টেলারা স্টারগার্লের চমৎকার নকল ওই মেয়েটা । স্টার বানাতে চাইছে ওকে ওর মা।’

‘টেবিলে বসা ওই লোকটা কে?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর ।

‘ওর নাম নীল বোরাম । হিরোয়িক কমিকসের সিনিয়র এডিটর । স্টেলারা স্টারগার্ল ছাপে ওরাই । মিসেস জরডান মেয়ের চেয়ে আরও চালাক, করিতকর্মী । কোন কাজে কাকে ধরতে হবে খুব ভাল জানে । দুই মাসের মধ্যেই কোন কমিক বইয়ের মলাটে যদি মিরিনার হাসি হাসি মুখ জুলজুল করে, অবাক হব না।’ কিছুটা হতাশ ভঙ্গিতেই মাথা নাড়লেন মরগান । ‘সব মইলের লোকের সঙ্গে জানাশোনা আর খাতির মহিলার । আমার জন্যে যদি কাজ করত, ভাল হত।’

পকেটে হাত দিলেন মরগান । ‘ওদের সঙ্গে পরিচয় করতে চাইলে আজ রাতের পার্টিতে এসো, খাওয়া-দাওয়াও হবে । বাড়তি কয়েকটা টিকেট আছে । এই যে নাও, এটা তোমার...’ রবিনকে দিলেন তিনি । কিশোরকে একটা দিয়ে বললেন, ‘এটা তোমার, আর এই এটা তোমাদের আরেক বন্ধুর জন্যে।’ হাসলেন । ‘তোমাদের ভেজা বন্ধু।’

একটু থেমে যোগ করলেন, ‘পার্টিতে ভিড় হবে খুব । অনেক সময় ধরে চলবে, অনেক রাত পর্যন্ত । তবে অসুবিধে নেই । তোমাদের জন্যে ঘর রেখে দেব আমি, ঘুমাতে পারবে ।’

ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'এবার যেতে হয়। সাংবাদিকদের কাছে ফ্যান গেস্ট অঙ্গ  
অনারদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।'

প্রায় ছুটে চলে গেলেন মরগান।

'ফ্যান গেস্ট অভ অনারটা কি বলো তো?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'জানি না। বুঝতে পারছি না সাংবাদিক কেন দরকার  
মরগানের। নিজে নিজেই তো অনেক কিছু করে ফেলেছেন।'

'এখন আমাদের কাজটা কি?'

'চলো, ওপরে যাই। তারপর মুসাকে নিয়ে বাঢ়ি যাব। শুকনো কাপড় দরকার  
ওর। আর রাতে আমাদেরকেও অন্য পোশাক পরে আসতে হবে। ব্যাংকোয়েট  
পার্টিতে এই জিনিস আর টি-শার্টে চলবে না।'

এখনও শুকায়নি মুসার কাপড়, ভেজা রয়েছে। আর কোন উপায় নেই।  
ওগুলোই পরল সে। গাড়িতে এসে উঠল তিনজনে।

রকি বীচের দিকে চলতে চলতে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'বলো তো, কাকে  
বেশি সন্দেহ হয় তোমাদের?'

'অবশ্যই আইজাক হফার,' রবিন বলল।

'কেন?'

সামনের সীট থেকে কিশোরের দিকে ফিরে তাকাল রবিন। 'ওর নিজের ছবি  
নিজেই পোড়ানোর দৃশ্যটা মন থেকে তাড়াতে পারছি না আমি। মনে হল যেন  
জোর করে কিছু প্রমাণের চেষ্টা করছে। এবং আমরা জানি, ফ্যান ফান বইতে তার  
আঁকা ছবিগুলো ছুরি গেছে।'

'এটা একটা পয়েন্ট,' একমত হলো কিশোর।

'তারপর রয়েছে আরেকটা ব্যাপার, টাকাপয়সার টানাটানি আছে ওর। কারণ  
ওর ছবিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে দেখে সাংঘাতিক হতাশ হয়ে পড়েছে, আচরণেই  
বুঝিয়ে দিয়েছে সেটা। অথচ একশো ডলার দিয়ে ছবিটা কিনে নিয়ে পুড়িয়ে  
ফেলল! নষ্ট করল কেন অতগুলো টাকা? অন্তু নয় এসব আচরণ?'

'বেশ,' কিশোর বলল। 'ধৰা যাক, হফারই আমাদের চোর। কিন্তু তার ঘরের  
জিনিসপত্র তচনছের ব্যাপারটা কিসের সঙ্গে থাপ থাওয়ানো যায়?'

'বলতে পারছি না। অনেকগুলো ঘোরপ্যাচ রয়েছে পুরো ব্যাপারটাতে।  
একবার মনে হচ্ছে হফারই সব কিছুর হোতা, আবার মনে হচ্ছে তা হতে পারে না।  
তাহলে তার ঘরে লোক ঢুকে জিনিস নষ্ট করে কেন? তাছাড়া সে ঢুরি করে থাকলে  
তার ঘরে চোরাই মালগুলো নেই কেন? প্রমাণ যাতে না থাকে সেজন্যে অবশ্য  
সরিয়ে রাখতে পারে অন্য কোথাও। আরও একটা কথা ভাবছি, লাল আলখেন্দা  
পরা জীবন্ত ক্রিমসন ফ্যান্টম আর মুসাকে যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে, ফ্রগ  
মিউট্যান্ট, একই লোক নয় তো? আর সেই লোকটা কি আইজাক হফার?'

'তা হতে পারে না,' ড্রাইভিং সীট থেকে বলল মুসা। 'হফারের শরীরের গঠন  
আর ব্যাঙ্গটার গঠনে তফাত আছে। এক রকম নয়।'

'এই ক্রিমসন ফ্যান্টমের রহস্যটায় আরও লোক জড়িত রয়েছে,' কিশোর  
বলল। 'এই যেমন, ডিকসন আর বোরাম।' পেছনের সীটে হেলান দিল সে।

‘একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ, একজন আরেকজনের ব্যাপারে কেমন পরম্পর-বিরোধী কথাবার্তা বলছে? ডুফার ভাবে হফার একজন জিনিয়াস। ডিক্সন ভাবেন পাগল, আর মরগান দৃঢ় করেন তার জন্যে। ডিক্সন নিজেকে ব্যবসায়ী ভাবেন, অথচ হফার আর ডুফার বলে লোকটা একটা শয়তান।’

হেসে উঠল রবিন। ‘হফার ভাবে সে কমিকের সংক্ষারক, দামি কমিকগুলো বাঁচানৰ চেষ্টা করছে। কিন্তু ডিক্সন আর মরগান ভাবছেন, সে কেবল একটা কাজেই পটু, গোলমাল বাধানো।’ এক সেকেণ্ড ভাবল সে। ‘বোরামের ব্যাপারটা কি? আমার তো মনে হয় না কেউ ওকে পছন্দ করে। ডুফার তাকে ঘৃণা করে, কারণ তাকে ঠকিয়েছে এডিটর। হফারের বিষ্ণবাস, ক্রিমসন ফ্যান্টমের বোরোটা বাজিয়েছে বোরাম। ডিক্সনও দেখতে পারেন না। কমিক কেনার জন্যে এত চাপচাপি করেও তাঁকে রাজি করাতে পারেনি লোকটা।’

‘যে বইটা সে কেনার এত চেষ্টা করল, সেটাই চুরি হয়েছে, এতে কি কিছু প্রমাণিত হয়?’ মুসা প্রশ্ন।

‘হয়,’ জবাব দিল কিশোর। ‘তাকে সন্দেহ হয়। তোমার ওপর হামলা চালিয়েছে বলেও সন্দেহ করতে পারতাম, যদি শরীরের গঠন মিলে যেত। বোরামকে দেখলে মনে হয় একটা বগা, ভুঁড়িওয়ালা বগা। আর তোমার ওপর যে হামলা চালিয়েছিল, সে স্বাস্থ্যবান লোক, পেশীবহুল শরীর।’

গাড়ির ছাতের দিকে তাকিয়ে ভূরং কেঁচকাল কিশোর। তার সন্দেহের তালিকায় মিরিনা জরডানকেও যোগ করতে চাইছে। কিন্তু মেলাতে পারছে না। ডিক্সনের সঙ্গে যখন দরাদরি করছে কিশোর, তখন স্টলের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে কি অপরাধ করেছে মিরিনা?

অপরাধ জগতের এটা একটা পুরানো কৌশল। সুন্দরী একটা মেয়েকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে দিয়ে লোকের নজর সেদিকে আকৃষ্ট করা, এবং সেই সুযোগে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের মত করে অপরাধটা ঘটিয়ে ফেলা।

কিন্তু মিরিনাকে এই অপরাধের সঙ্গে জড়াতে ভাল লাগছে না কিশোরের। ও এতে জড়িত না থাকলেই সে খুশি হয়।

‘কেসটা বড়ই অস্তুত,’ অবশ্যেই বলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ‘ডিক্সন একটা কথা ঠিকই বলেছেন, সংগ্রহ-টংগ্রহ যারা করে, ওই মানুষগুলোর মাথায় আসলেই কিছুটা ছিট আছে। নইলে কমিক বুক জোগাড়ের মত একটা ছেলেমানুষীতে এত আগ্রহ কেন?’

‘ঠিক,’ শুকনে গলায় বলল রবিন। ‘চালাক হলে তো ইলেক্ট্রনিক জিনিসপত্র জোগাড়ের মত বড়মানুষীই করত। কম্পিউটার নিয়ে পাগল হত।’ হাসিটা চওড়া হল তার। ‘কিংবা পুরানো গাড়ি নিয়ে।’

মুসা কিছু বলল না। তবে কিশোর টিটকারিটা হজম করল না। খোঁচা দিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, কিছু কিছু মানুষের মেয়ে দেখলে পাগল হয়ে যাওয়ারও একটা বাতিক আছে।’

কেসের ব্যাপারে আলোচনার আপাতত এখানেই ইতি ঘটল।

রকি বীচে পৌছে ইয়ার্ডের কাছে কিশোরকে নামিয়ে দিল মুসা।

তেতরে চুকে অফিসের বারান্দায় চাচা-চাচীকে বসে থাকতে দেখল কিশোর। তাঁদেরকে জানাল, রাতে বাড়ি ফিরবে না। হোটেলে থাকবে। কাজ আছে। রাশেদ পাশা কিছুই বললেন না। মেরিচাচী জানতে চাইলেন, কাজটা কি। জানাল কিশোর, অবশ্যই অনেক কিছু গোপন করে, ঢেকে চুকে। তারপর চলে এল নিজের ঘরে। পোশাক পাস্টানোর জন্যে।

আধ ঘণ্টা পরেই ইয়ার্ডে এসে পৌছল অন্য দুই গোয়েন্দা। পোশাক পাল্টে এসেছে। বাইরে রাত কাটাতে হবে, তাই ব্যাগে করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। মুসার ইমপালাতে করেই চলল ওরা, কোট হাইওয়ে ধরে। মুসাকে সান্তা মনিকা হয়ে যেতে বলল কিশোর।

কেন, জানতে চাইল মুসা।

‘ম্যাড ডিকসনের স্টেলে লেখা রয়েছে, তাঁর দোকানটা সান্তা মনিকায়, দেখনি?’ কিশোর বলল, ‘কোন বুক দেখে ঠিকানা জেনে নিয়েছি। পথেই পড়বে, বেশি ঘূরতে হবে না আমাদের। দেখেই যাই কি ধরনের বই বিক্রি হয় ওখানে।’

ম্যাড ডিকসনের কমিক এমপোরিয়ামটা রয়েছে পিকো বুলভারে। বাণিজ্যিক এলাকার একধারে একটা সাধারণ দোকান। দু’পাশে আরও দুটো দোকান, দুটোরই কর্ম চেহারা, ব্যবসা ভাল না বোঝাই যায়। একটাতে বেতের তৈরি আসবাব বিক্রি হয়, আরেকটাতে নানা ধরনের ভ্যাকিউয়াম ক্লিনার।

ডিকসনের দোকানটায় রঙের ছড়াছড়ি। ডিসপ্লে উইনডোগুলোর কাচে সাঁটানো রয়েছে রঙ-বেরঙের ছবি, সবই কোন না কোন কমিকের বিচ্চি হিরোর। দরজার কাচে লাগানো রয়েছে স্টেলারা স্টারগার্লের বিশাল এক ছবি। দেখতে হবল মিরিনা জরডানের মত। কিংবা বলা যায় মিরিনাই দেখতে স্টেলারার মত।

‘বাহ,’ সবুজ একটা ভ্যানের পাশে গাড়ি রাখতে রাখতে বলল মুসা, ‘দেখো, কে এসেছেন!’

গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডিকসন। দরজার দিকে নজর। দুটো ছেলে কমিক বইয়ের দুটো ভারি বাল্ক নিয়ে বেরোচ্ছে। বোঝার ভাবে কুঁজো হয়ে গেছে।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে ডাকল কিশোর, ‘মিষ্টার ডিকসন?’

‘আরে, তোমরা,’ এলোমেলো চুলে আঙুল চালালেন ম্যাড। হাতে একগাদা কমিক।

‘স্টেলে বিক্রির জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন বুবি,’ কিশোর বলল আলাপ জমানো ভঙ্গিতে। ‘শূন্য জায়গা ভরবেন, চোরে যেগুলো খালি করে দিয়েছে?’

‘হ্যা,’ হাতের কমিকগুলোর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন ডিকসন। তারপর মুখ তুলে হাসলেন। ‘শুনলাম, বাড়াসে ওড়ার কাহিদা শিখে ফেলেছে? তিন তলা থেকে চতুরে না পড়ে গিয়ে পড়েছে সুইমিং পুলে?’ মাথা দৃশ্যে বললেন, ‘তোমরা গোয়েন্দাগিরির সঙ্গে সঙ্গে এসবও প্র্যাকটিস করো নাকি?’

ডিকসনের হাতের দিকে তাকাল কিশোর। সবচেয়ে ওপরের কমিকের দ্বিটা দেখল। ফ্যান ফান নাঘার ওয়ানের আরেকটা কপি। প্রাইস টিকারটায় মৃষ্টি আটকে গেল তার। দাম লেখা রয়েছে দুঁশো পঞ্চাশ। ডলার।

‘ঠিক এরকম একটা কমিকই চুরি হয়েছে দেখেছি,’ কিশোর বলল। ‘এটার দাম তো অনেক কম। নীল বোরামের কাছে অনেক বেশি চেয়েছিলেন?’

‘ওটা একটা বিশেষ বই ছিল...’ বলতে গিয়ে থেমে গেলেন ডিকসন। কিশোরের চোখের দিকে তাকালেন। ‘আমাকে এসব প্রশ্ন কেন? বরং ওই চোরটাকে ধরার চেষ্টা করা উচিত তোমাদের।’

‘তা-ই তো করছি। তদন্ত চালাচ্ছি আমরা। জানেন বোধহয়, তদন্ত করতে গেলে অনেক প্রশ্ন করতে হয়।’

‘ভুল লোককে করছ। আমার লোক তোমাদেরকে রেস্টুরেন্টে হফারের সঙ্গে দেখেছে। শোনো, ওই লোকটাকে পাস্তা দিও না। ওর কথাও শনো না। হফার আর দুফারের মত মানুষের সঙ্গে কারও মেশাই উচিত না। বাজে স্বত্বাব। ওদের মতই কমিক সংগ্রহ দিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম আমিও। কিন্তু আস্তে আস্তে পেশা হিসেবে নিয়ে নিলাম কাজটাকে, ব্যবসা শুরু করলাম। ভালই করছি এখন। ওদের মতী শয়তানি করে কাটাচ্ছি না।’

ভুকুটি করলেন ম্যাড। ‘এমন সব কাও করে ওরা, এমন সব ফালতু কারণে রাগ পুষে রাখে, যেগুলোর কোন মানেই হয় না। একবারও ভেবে দেখে না কমিক ডিলার আর কমিকের দোকানদাররাই ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে। যেমন হফার, তেমনি দুফার। আমাদের মত ব্যবসায়ীদের কষ্ট দিতে পারলেই যেন ওদের যত আনন্দ।’

আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। ম্যাডকে কষ্ট দেয়ার জন্যে কি চুরি করতেও পিছপা হবে না ওরা?

## ছয়

ডিকসনকে তাঁর দোকানের সামনে রেখে আবার রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। সেঞ্চুরি গ্র্যাণ্ড ধরে এগোল। ভ্রাইডিং হাইল ধরে বসেছে মুসা, সামনের দিকে তাকিয়ে ফৌস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ‘ভাবসাবে মনে হলো, আমাদেরকে তিন গোয়েন্দা না ভেবে তিন ভাঁড় ভেবেছেন ম্যাড। শ্রী স্টুজেস।’

‘এবং তাঁর সেই ভাবনাটারই অবসান ঘটাতে হবে আমাদের,’ গঞ্জির হয়ে বলল পেছনের সীটে বসা কিশোর। ‘আর তা করতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। জানতে হবে কমিক চুরির সময়টায় সন্দেহভাজনদের কে কোথায় কি করছিল।’

‘ডিকসন কোথায় ছিলেন, জানি,’ রবিন বলল। ‘আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।’

কিশোর ভাবছে, মিরিনা জরডান কোথায় ছিল, তা-ও জানি। ক্রিমসন ফ্যান্টম যখন এগিয়ে আসছিল, আমাদের কাছ থেকে তখন সরে যাচ্ছিল মেয়েটা। হয়তো ওকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল...ভাবনাটা ঠেলে সরিয়ে দিল সে। অন্যান্য সন্দেহভাজনদের কথা ভাবতে লাগল। ‘আমি জানতে চাই, নীল বোরাম কোথায় ছিল তখন। আর এডগার দুফার। বিশেষ করে, আইজাক হফারের কথা তো জানতেই চাই। প্রশ্নগুলোর জবাব পেলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।’

মাটির নিচের গ্যারেজে গাড়ি রেখে, এলিভেটরে করে উঠে এসে নিজেদের ঘরে চুকল তিন গোয়েন্দা। ব্যাগ নামিয়ে রাখল। তারপর রওনা হলো মেইন কনফারেন্স রুমের দিকে। কনভেনশন ভোরের বাইরে অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে ডিড়, কিন্তু ভেতরে যেন আরও বেড়েছে। ঠাসাঠাসি গান্দাগান্দি হয়ে আছে। রুক্ষ চেহারার সিকিউরিটি গার্ড, সামনের দুটো দাত ভাঙা যার, সে আবার ফিরে এসে বসেছে নিজের জায়গায়। তিন গোয়েন্দাকে আটকাল। ভাল করে ওদের হাতের সিল দেখে তারপর চুক্তে দিল।

সঙ্গীদের নিয়ে ডিড়ের ভেতর দিয়ে ঘরের একধারে চলে এল কিশোর। সারি সারি টেবিল পাতা হয়েছে। টেবিলের সামনে বসে ভজ্জদের বাড়িয়ে দেয়া খাতায় অটোগ্রাফ দিছে কমিক আর্টিস্ট। কেউ কেউ পেশিল দিয়ে কমিকের হিরোর ক্ষেত্র একে দিছে। কিছু টেবিলে কমিক বই, ম্যাগাজিন, আর ইলাস্ট্রেশন বোর্ডের সাথে সাথে উচু হয়ে আছে পোস্টারের স্তুপ। সেগুলোও বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে।

চুটিয়ে ব্যবসা করে চলেছে আর্টিস্টের। শত শত লোক সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে টেবিলের সামনে। ছেলে-বুড়ো-মাঝবয়েসী সব বয়েসের সব ধরনের লোক। মানিব্যাগ ভরে টাকা নিয়ে এসেছে। অকাতরে সেগুলো খরচ করছে কমিকের পেছনে। অনেক ভজ্জেরই চোখ চকচক করছে তাদের প্রিয় শিল্পীকে দেখতে পেয়ে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে যেন ধন্য হচ্ছে। কিছু কিছু তো আছে, ওদের কাও দেখে মাথার স্থিরতা সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে। খাতায় তো অটোগ্রাফ নিচ্ছেই, বই, পোস্টার যত পারছে কিনে সেগুলোতে নিচ্ছে, গায়ের শার্টে নিচ্ছে, কেউ কেউ কাগজের কাফি কাপ বাড়িয়ে দিছে আর্টিস্টের দিকে, সহী করে দেয়ার জন্যে।

অটোগ্রাফের অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নানা রকম প্রশ্ন, ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে আর্টিস্টদের। ধৈর্যের সাথে সহী করে দিছে ওরা, প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছে, ব্যবসার ব্যর্থে। এত মানুষের সম্মিলিত কষ্টস্বর কোলাহলে পরিণত হয়েছে।

‘আপনি না থাকলে স্লাইম ম্যান আর স্লাইম ম্যান থাকত না, জ্যাক,’ বলল এক ভক্ত। ‘ওকে কেউ আপনার মত করে আঁকতে পারত না।’

আরেকজন তরুণ ভক্ত আরেক আর্টিস্টের সামনে এসে চেঁচিয়ে উঠল, ‘রোবট অ্যাভেঞ্জারের বারোটা বাজিয়েছেন আপনি। একমাত্র টেবিনস জানত কি করে ওই রোবট আঁকতে হয়। আপনি তো ওটার মাথাকে ভলভো গাড়ির নাক বানিয়ে দিয়েছেন। কিছু হয়েছে ওটা? আপনাকে বের করে দেয় না কেন কোম্পানি?’ একটা বই বাড়িয়ে ধরে বলল সে, ‘দিন, এখানে একটা সহী করে দিন।’

ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর্টিস্ট। ‘আমার আঁকা ভাল না লাগলে অটোগ্রাফ নিতে এসেছ কেন? বইটাই বা কিনেছ কেন?’

‘কিনেছি বিক্রি করার জন্যে। আপনার সহী থাকলে ডবল দামে বেচতে পারব।’

বিহুল ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বইটাতে সহী করে দিল আর্টিস্ট।

এই কনভেনশন রুমটাকে কেন ম্যাডহাউস বলে বুঝতে পারছে কিশোর। ‘পাগলখানা!’ বিড়বিড় করল সে, ‘ঠিক নামই দিয়েছে!’ বস্তুদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘চলো, আইজাক হৃফারকে খুঁজে বের করি।’

সব চেয়ে লম্বা লাইন পড়েছে হফারের টেবিলের সামনে। অন্য আটটদের মত তার টেবিলে বই, ম্যাগাজিন কিংবা পোষার নেই বিক্রির জন্যে। ডক্টরের বাড়িয়ে দেয়া খাতায় দ্রুত একে দিছে কমিকের বিভিন্ন চরিত্র। কোন কোন ডক্টর সহানৃতির সুরে বলছে কি করে ধ্রুব করে দেয়া হয়েছে তার চিকির্ষকে, সাম্মান দিছে। অনুরোধ করছে আরও ভাল কোন চরিত্র তৈরি করার জন্যে, যেটা আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। শিল্পীর নিজের হাতে একে দেয়া হবি পেয়ে খুব খুশি ওরা।

কয়েকটা ছেলে এসে ধরল হফারকে ক্রিমসন ফ্যান্টম একে দিতে হবে, কিংবা ক্রিমসন ফ্যান্টমের বইতে সই করে দিতে হবে।

'দেরি করছেন কেন?' চিংকার করে উঠল এক কিশোর, 'দিন, একে দিন!'

হফারের নাকের কাছে ক্রিমসন ফ্যান্টমের একটা নতুন সংক্রণ দুলিয়ে বলল আরেকজন, 'এটাতে সই করুন।'

ছেলেটার কজি চেপে ধরল হফার। 'ক্রিমসন ফ্যান্টমে সই আমি করব না। করাতে হলে বোরামের কাছে নিয়ে যাও। আরও বিশটা চরিত্র তৈরি করেছি আমি। ওগুলোর কোনটা চাও তো বলো, একে দিই।'

'না, ক্রিমসনেই দিতে হবে,' গৌয়ারের মত বলল অবুব ছেলেটা। 'আঁকতে পেরেছেন, সই দিতে পারবেন না কেন?'

'ওটা এখন বোরামের সম্পত্তি। তার কাছে যেতে বললাম তো।'

'না, আপনাকেই দিতে হবে।'

'আমি পারব না,' মাথা নাড়ল হফার। 'আর ওভাবে আমার নাকের সামনে ওটা নাড়তে থাকলে মেজাজ ঠিক থাকবে না বলে দিলাম। কালি চেলে নষ্ট করে দেব বইটা।'

হাত ছেড়ে দিল হফার।

তার নাকের কাছে বইটা নাড়তেই থাকল ছেলেটা।

'ছিড়ে ফেলব কিন্তু!' হুমকি দিল হফার।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর বিরক্ত করতে সাহস করল না ছেলেটা। হাত সরিয়ে নিয়ে হারিয়ে গেল ভিড়ের ভেতরে।

'দাঁড়াও, আমি একবার কথা বলে আসি হফারের সঙ্গে,' ফিসফিসিয়ে দুই বন্ধুকে বলল রবিন। কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে ভিড় ঠেলে টেবিলের দিকে এগোতে শুরু করল সে। গুঁতো খেয়ে রেগে গিয়ে তার দিকে ঘূরে জলস্ত চোখে তাকাতে লাগল লোকে। পাতাই দিল না সে। এগোতেই থাকল। কিন্তু যে হারে ঠেলাঠেলি করছে লোকে, হফারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কিভাবে? কাজেই, সংসরি পথটাই বেছে নিল সে। নাম ধরে ডাক দিল, 'মিষ্টার হফার?'

মুখ তুসে তাকাল হফার। 'আবার কি?' রবিনের শন্য হাত 'খে' বলল, 'ও, আল্পস্ট-ফালতু জিলিস অস্তুত সই করতে আননি। তা কি চাই? কেচ? কার ছবি আঁকব? তোমাকে দেখে কিন্তু লাগছে তুমি কিলার ব্রেন-এর ডক্টর। ঠিক বলেছি না?' ততক্ষণে ওর কলম কাগজের ওপর ছোটাছুটি শুরু করেছে।

'আপনাকে আমি ম্যাড ডিকসনের স্টেলের সামনে দেখেছিলাম। দোকানটায়

বোমা ফাটার আগে। ছেলেটার হাত থেকে কমিক নিয়ে পোড়ানর দৃশ্যটা দারুণ লেগেছিল আমার কাছে।'

আচমকা ব্রেক কথার পর পিছলে গিয়ে যেন থেমে গেল হৃফারের কলম।

'কমিকগুলো ডাকাতি হওয়ার সময় আপনি ওখানে থাকলে খুব ভাল হত,' আবার বলল রবিন। 'লোকটাকে হয়তো ধরে ফেলতে পারতেন। কোথায় ছিলেন তখন? লোকটাকে দেখেননি?'

নীরবে রবিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে হৃফার। ডক্টরা বিরক্ত হতে আরম্ভ করেছে। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'এই, আগেই এসে বকবক শুরু করলে কেন? লাইনে দাঁড়াও। তোমার পালা আসুক, তারপর জিজ্ঞেস করো।'

'হৃফার,' আরেকজন বলল, 'আমাদের দিকে নজর দিন। ও.তো অনেক পরে এল। যেতে বলুন ওকে।'

'কোথায় ছিলাম?' কারও দিকে না তাকিয়ে অবশ্যে রবিনের কথার জবাব দিল হৃফার। 'এই চিড়িয়াখানার ভেতরেই।' তিক্ত কষ্টে কথাটা বলে আবার আঁকতে শুরু করল সে। মুখ না তুলেই বলল, 'যাও, ভাগ। আমি ব্যস্ত।'

ক্ষেটা তুলে ধরে বলল, 'কিলার ব্রেন কিনতে চান কেউ?'

তাকিয়ে রয়েছে রবিন। এত তাড়াতাড়ি এভাবে ওর দিক থেকে নজর সরিয়ে নেবে হৃফার, কল্পনাও করেনি। এরকম আচরণ করতে না পারলে যে ডক্টরের হাত থেকে রেহাই পেতে পারত না, এ কথাটা তুলেই গিয়েছিল সে। কানের কাছে অসংখ্য কষ্টের চিকিৎসা শুনতে পেল, ছবিটা কিনতে চায় ওরা, একজন একটা দাম বললে আরেকজন তার চেয়ে বেশি আরেকটা বলছে। নীলামে চড়ানো হয়েছে যেন ওই সদ্য আঁকা ছবি। কোনমতে দু'পাশের দু'জনকে সরিয়ে আরেকটু আগে বাঢ়ল রবিন। তার একটা কার্ড বাঢ়িয়ে দিয়ে বলল, 'আশা করি আবার দেখা হবে আমাদের।' এর বেশি আর বলতে পারল না। টেনে তাকে পেছনে নিয়ে গেল কয়েকটা হাত।

চুকতে যতটা কষ্ট হয়েছিল, বেরোতে তার চেয়ে কম হল না। সবাই হড়াহড়ি করছে টেবিলের কাছে যাওয়ার জন্যে।

ডিডের ঠিক বাইরেই অপেক্ষা করছে কিশোর আর মুসা।

রবিন বেরোতেই মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি বলল?'

'কমিক ডাকাতির সময় সে নাকি এই ঘরেই ছিল,' পেছনের জনতার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল রবিন। 'এখন যারা আছে, তখনও হয়তো তাদের অনেকেই ছিল। তার মানে অনেকেই তাকে দেখেছে। সাক্ষ্য দিতে পারবে তারা।' হাত দিয়ে ডলে পোলো শাটটা সমান করার চেষ্টা করতে লাগল সে। ডিডের চাপে কুঁচকে গেছে জায়গায় জায়গায়।

'হ্ট! সক্র হয়ে এল কিশোরের চোখের পাতা, 'তাহলে ডাকাতির পর পরই এত তাড়াতাড়ি টেলের কাছে পৌছে গেল কি করে?'

'সে আর দুফার একই সময়ে হাজির হয়েছে,' রবিন বলল। 'হয়তো একই সাথে ছিল দু'জনে!'

মাথা বীকাল কিশোর। 'ভাল বলেছ। দুফারকে পাওয়া যাবে কোথায়?'

পরিচিত একটা মুখ দেখা দিল ভিড়ের ভেতরে। পিটার, যে লোকটা ওভারল্টীপ কমিকের কপি ধার দিয়েছিল ডুফারকে। তিন গোয়েন্দাকে দেখে জানতে চাইল, কি করছে এখানে।

এমনি এসেছে, দেখতে জানাল কিশোর। তারপর জিজ্ঞেস করল, ডুফারকে দেখেছে কিনা। মাথা নেড়ে পিটার জানাল, ‘গত এক ঘণ্টা ওর সঙ্গে দেখা নেই।’ হাসল হঠাতে করেই। ‘গোল্ড রুমে গিয়ে দেখতে পারো।’ কি করে যেতে হবে পথ বলে দিয়ে বলল, ‘না গেলেও অবশ্য পারো। যে কোন সময়ে এসে পড়তে পারে ডুফার।’

কিশোর জিজ্ঞেস করল, ‘নীল বোরামকে দেখেছেন কোথাও?’

‘দেখেছি,’ হাত তুলে দেখাল পিটার। ‘ওই যে ওখানে। হিরোয়িক কোম্পানির লোক নিয়ে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিচ্ছে বোরাম। নতুন কোন হিরোয়িক ফ্লাসিকের ঘোষণা দিচ্ছে মনে হয়।’

সেদিকে তাকিয়ে ক্যামেরার আলো বিলিক দিতে দেখল কিশোর। আর সোনালি পোশাকের চমক। দ্রুত এগোল দুই সহকারীকে নিয়ে। জায়গাটার স্টল সব সরিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে বিশেষ কাজের জন্যে। হিরোয়িক কমিকের কয়েকজন আর্টিস্ট পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাইফ সাইজ কিছু কার্ডবোর্ডে আঁকা কমিকের বিভিন্ন চরিত্রের ছবির সামনে।

কিন্তু তাদের দিকে নজর নেই ক্যামেরার। আলো ফেলা হয়েছে স্টেলারা স্টারগালের ওপর, ক্যামেরার চোখও তারই ওপর আটকে আছে যেন। কারণটা বোঝা শক্ত নয়। ছবির পাশেই দাঁড়িয়ে আছে মিরিনা জরডান, এখনও সোনালি কসচিউম পরনে, সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হাসি হাসছে।

একটু দূরে তার মা কথা বলছে সাংবাদিকদের সঙ্গে। তার পেছনে নীল বোরাম।

সম্পাদকের কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। ‘মিস্টার বোরাম, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?’

‘কেন নয়?’ টাকে হাত বোলালেন বোরাম। ‘করো, প্রশ্ন করো।’

‘আমি আপনাকে ম্যাড ডিকসনের স্টলের সামনে দেখেছি, ডাকাতির একটু আগে,’ কিশোর বলল। ‘আপনার কি মনে হয়, যে কমিকগুলো চুরি হয়েছে ওগুলো মূল্যবান?’

ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বোরাম। ‘এটা কি ধরনের প্রশ্ন হলো?’

‘আমি আর আমার দুই বন্ধু এই কেসের তদন্ত করছি, ম্যাড ডিকসনের হত্তে।’ মুসা আর রবিনকে দেখাল কিশোর। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিল বোরামের হাতে। ‘আপনার মতামত জানা দরকার...’

যাধা দিয়ে বোরাম বললেন, ‘গুরু মতামত নয়, আরও অনেক কিছুই জানতে চাও তুমি।’ কার্ডটার দিকে তাকিয়ে বললেন বোরাম। তারপর তাকালেন কিশোরের দিকে। ‘ডাকাতি হওয়ার সময় কনভেনশন ফ্রারেই ছিলাম না আমি, স্টলের কাছে থাকা তো দূরের কথা। গোল্ড রুমের বাইরে কমিকের এক মাথামোটা পুজারি আটকে ফেলেছিল আমাকে।’

‘পুজারি?’

‘এডগার ডুফার।’ ভুক্তি করলেন বোরাম। যেন ডুফারের সঙ্গে সাক্ষাতের সেই শৃতিটাও বিরক্ত করছে তাকে। ‘গোস্ত রূম থেকে বেরিয়ে এল, গাধাগুলো যেখানে সিনেমা দেখাচ্ছিল সেখানে। মনে হলো, প্রোজেক্টরের কিছু একটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মেরামতের চেষ্টা করছিল লুই মরগান। এই সময় ডুফার বেরিয়ে এসে বিরক্ত করতে শুরু করল আমাকে।’

‘তারপর?’

‘কে জানি এসে বলল, ম্যাড ডিকসনের স্টলে গুগোল হয়েছে। দেখতে গেল ডুফার। ভাবলাম, মরগান বোধহয় জানে কিছু, তাই তাকে ধরলাম। সত্যি বলছি, এভাবে ডুফারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে খুশিই হয়েছিলাম। নিজের সম্পর্কে তার উচু ধারণা।’ কৃৎসিত ভঙ্গিতে হাসলেন বোরাম। ‘অনেক অনেক উচু।’

একটু থেমে বললেন সম্পাদক, ‘তোমার প্রশ্ন শেষ হয়েছে? কাজ আছে আমার, যেতে হবে।’

লোকটা চলে যাচ্ছেন, তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে কিশোর। কেসটার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছে না এখনও।

কাঁধে হাত পড়তে ফিরে তাকাল সে। পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন লুই মরগান।

‘বোরামের সঙ্গে কথা বললে দেখলাম,’ জিজ্ঞেস করলেন তিনি, ‘তোমাদের কেসে সে-ও জড়িয়েছে নাকি?’

‘জড়াতেও পারে,’ অনিচ্ছিত শোনাল কিশোরের কষ্ট। ‘তাকাতির আগের মুহূর্তেও ম্যাড ডিকসনের স্টলের সার্মনে ছিলেন তিনি। কিন্তু এখন অঙ্গীকার করছেন। অ্যালিবাই রয়েছে বলছেন। স্টেট তদন্ত করে দেখতে হবে আমাদের।’

‘আর কার কার ব্যাপারে তদন্ত করবে?’

‘এডগার ডুফার। আইজাক হফারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলে এসেছি।’

আগ্রহ ফুটল মরগানের চোখে। ‘তারও কি অ্যালিবাই আছে নাকি?’

বলল তো সেরকমই। আটিচ সেকশনে নাকি জিনিসপত্র বিক্রি করে বেড়াচ্ছিল। আমার তো বিশ্বাস, নয়শো অটোয়াফ শিকারি তার পক্ষে রায় দেবে।’

‘আমার মনে হয় না,’ ভুক্ত কুঁচকে মাথা নাড়লেন মরগান। ‘টোকার মুখে তোমাদের সঙ্গে যখন দেখা হলো, তখন কিন্তু আমি আটিচ এরিয়ার ভেতর দিয়েই এসেছি। একটা লোককেও তখন দেখিনি হফারের টেবিলের সামনে। কারণ, হফার তখন টেবিলেই ছিল না।’

## সাত

‘আজ রাতেই অ্যালিবাইগুলো সব যাচাই করে দেখতে হবে,’ বলল কিশোর। ব্যাংকোয়েট রুমে চুক্কেছে দুই সহকারীকে নিয়ে। ‘তাকাতির সময় ম্যাড ডিকসনের স্টলের কাছাকাছি ছিল এরকম কয়েকজনের সঙ্গেও কথা বলব।’ টাইটা সমানু করতে লাগল সে। অঙ্গীকৃতিতে চোখে।

ভুক্ত কুঁচকে ফেলল মুসা। 'কাণ্টা কি হলো! এমন করছ কেন? সেই সোনালি চূল মেয়েটাই মাথা গরম করেছে তোমার। এরকম অবস্থা তো দেখিনি! রহস্য রেখে সুন্দরী মেয়ের দিকে ঝুকেছে আমাদের কিশোর পাশা! অবিশ্বাস্য!'

'ফালতু কথা রাখো তো!' বাঁবাল কষ্টে বলল কিশোর। গাল লাল হয়ে যাচ্ছে। এদিক ওদিক ঘূরছে চোখ, নিচ্য মিরিনা জরডানকেই ঝুঁজে বেড়াচ্ছে।

দেখা গেল মেয়েটাকে। টেলারা স্টারগার্লের অনুকরণে আরেকটা পোশাক পরেছে। এটা আগেরটার চেয়ে অনেক সহনীয়। উচু কলারওয়ালা আলখেলু। সোনালি চূলগুলোকে সোজা করে আঁচড়ে নিয়ে ঠিক ঠান্ডিতে বসিয়েছে একটা মুকুট। সোনালি রঙের সিঙ্কের কাপড়ে তৈরি হয়েছে পরনের ক্ষাটটা। হাঁটতে গেলেই আলখেলু আর ক্ষাটের ঝুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুন্দর লম্বা পা। এই পোশাকে তাকে আগোর চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় লাগছে।

মিরিনার মা কয়েকজন কমিক ভক্তের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ভুবে না যাওয়াতক অপেক্ষা করল কিশোর, তারপর এগিয়ে গেল মিরিনার দিকে, কথা বলার জন্যে।

পরিচয় দিল কিশোর।

'ও, তুমি ওদেরই একজন,' মিরিনা বলল, 'চোরাই কমিক ঝুঁজছে।' বড় বড় চোখ জুলজুল করছে আগ্রহে। 'কনভেনশন ফ্রারের সবাই তোমাদের কথা বলাবলি করছে। তোমার বস্তু সুইমিং পুলে পড়ার পর থেকে।'

'তাই!' ঢেক গিলল কিশোর। কিভাবে ওকু করবে ভাবছে। সোজাসুজি বলাই ভাল, তাই বলল, 'ডাকাতির সময় তুমি ঘটনাহলেই ছিলে।'

অস্তুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল মিরিনা।

'ম্যাড ডিকসনের টেলের কাছে,' আবার বলল কিশোর। 'আমি...ওখানে তোমাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

হাসল মিরিনা। 'শুধু তুমি নও, অনেকেই আমাকে দেখেছে ওখানে। তাকিয়ে ছিল। এই সম্মেলনে ঢোকার সাহসটা যে কিভাবে করলাম, ভাবলে আমারই অবাক লাগে।'

'শুব সুন্দর লাগছিল কিন্তু তোমাকে।'

'এভাবেই কথা বলো নাকি তুমি?' আঁড়চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মিরিনা। 'এত সোজাসান্টা?'

'ঘুরিয়ে-পেটিয়ে লাভটা কি?' বলল বটে কিশোর, কিন্তু মনে মনে শীকার করতে বাধ্য হলো, এভাবে বললে লোকে যেমন খুশি হয়, রেগেও যায়। প্রশংসা করছে বলে রাগছে না মেয়েটা, কিন্তু যদি সমালোচনা করত? সত্যি হলেও রেগে আগুন হয়ে যেত। বছবার নিজেকে বুঝিয়েছে কিশোর, এভাবে আর বলবে না। কিন্তু বলার সময় ঠিক রাখতে পারে না। হভাব মাফিক সরাসরিই বলে ফেলে শব কথা। যিথে করে বলল, 'তোমার মত একজন বিশিষ্ট চরিত্রের সঙ্গে এই প্রথম কথা বলছি।'

'বিশিষ্ট চরিত্র' কথাটা কিভাবে নিল মিরিনা বোবা গেল না। কারণ হাসতে দেরি করল সে। হয়তো বোবার চেষ্টা করছে কিশোর ব্র্যাক করল কি-না। হাসিটা

ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। 'ডাকাতটার কথা জিজ্ঞেস করবে তো? না, ভাই; আমি ওকে দেখিনি।'

'অন্য কিছু তো দেখেছ? অস্বাভাবিক কিছু? পরিবেশের সঙ্গে মেলে না এমন?'

আগ করল মিরিনা। 'নাহ, ওরকম কিছু দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। আসলে, ভয়েই অস্ত্রির হয়ে ছিলাম তখন। ওই যে, প্রথম স্টেজে উঠতে গেলে কিংবা বক্তা দিতে গেলে এক ধরনের ডয় ডয় লাগে না। আসলে, ডয় না বলে অস্বস্তি বলাই উচিত। বুঝতেই পারছ, জীবনে প্রথম এতবড় সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছি।'

ভাবছে মেয়েটা। কপালে হালকা ভাঁজ পড়েছে। হঠাৎ হাত তুলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, মনে পড়েছে। ম্যাড ডিকসনের স্টলটার দিকে তাকিয়েছিলাম বটে, নামটা আজব বলেই চোখ আটকে গিয়েছিল। কানুন এলোমেলো চুলওয়ালা এক লোক দাঁড়িয়েছিল টেবিলের ওপাশে... কিশোরের দিকে তাকাল সে, তুমি কথা বলছিলে তার সাথে!' আবার কি যেন ভাবল মেয়েটা। 'তোমার পাশে ছিল লম্বা একটা নিশ্চো ছেলে, আর একটা আমেরিকান ছেলে, চুলের রঙ...'

ফোস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। মুসা আর রবিনের কথা বলছে। এসব শুনতে চায়নি সে। 'আর কিছু দেখিনি? অস্বাভাবিক কিছু?'

মাথা নাড়ল মিরিনা। 'নাহ। পোশাক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চলেছি তখন, সেদিকেই খেয়াল ছিল, আর কোনদিকে নয়। পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল লাল আলখেল্লা পরা লোকটা, তার গায়ের বাতাস এসে লাগল। কমিকের চরিত্রের মতই উড়েছিল আলখেল্লার ঝুল। তবে স্বাইম ম্যান বলা যাবে না তাকে কোনমতেই। বিছিরি লেগেছে আমার, তার ওভাবে গা ঘেঁষে যাওয়াটা।' নাক ঝুঁক্কাল মিরিনা।

'ওর কোন কিছু চোখে পড়ার মত ছিল? মানে, খটকা লাগে ওরকম কিছু?'

কি আর লাগবে? ওর পোশাকটাই তো অদ্ভুত, অবশ্য এই কনভেনশন রুমের বাইরে। এখানে কোন কিছুই অস্বাভাবিক নয়। নানা রকম বিচিত্র পোশাক পরে এসেছে মানুষ প্রতিযোগিতার জন্যে। ও-ও পরেছে। লাল আলখেল্লা। তাড়াহড়া ছিল অনেক।'

'ভাব না ভাল করে। ছবিটা মনে গেঁথে নাও। কি কি করছিল মনে করার চেষ্টা কর।'

চোখ বন্ধ করল মিরিনা। 'আলখেল্লার ডেতরে হাত চুকিয়েছিল। কি যেন বের করেছিল।'

'হতে পারে,' মিরিনাকে মনে করায় সাহায্য করতে চাইল কিশোর, 'যৌক বস্তু বের করছিল লোকটা।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েন্দা প্রধান, মেয়েটার মুখের দিকে। 'আলখেল্লার নিচে কি পরেছিল মনে আছে? দেখেছ?'

'না,' মাথা নাড়ল মিরিনা। 'আসলে ওভাবে খেয়ালই করিনি। আমি তখন আমার চিন্তায়। কে কি করছে এত দেখার সময় ছিল নাকি। তাছাড়া কি করে জানব লোকটা বোমা বের করছে?'

‘তা-ও তো বটে’ ভাবল কিশোর। বলল, ‘বোমা ফাটার পর অনেক চিৎকার চেচামেচি হয়েছে। এটা ও কি খেয়াল করোনি?’

‘সেটা তো করতেই হয়েছে। এত চিৎকার করলে কি আর কানে না চুকে যায়। তবে একবারই তাকিয়েছি। দেরি হওয়ার ভয়ে থাকতে পারিনি, তাড়াহড়া করে চলে গেছি। ও, লাল আলখেল্লা পরা লোকটাকে ছুটে যেতে দেখেছি।’

সামনে ঝুঁকল কিশোর। ‘আরেকবার তোমার গা ঘেষে গেল?’

‘না, দ্বিতীয়বার আর গা ঘেষে নয়। মনে হলো, লাল একটা ঝিলিক দেখলাম। ছুটে যাচ্ছে দরজার দিকে, বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।’

‘তুমি কোন দিকে যাচ্ছিলে?’

‘কেন, দেখেনি? আটিটো সব যেখানে বসে ছিল সেদিকে। ঘরের একধারে, ঢোকার দরজা থেকে দূরে। ওখানেই তো প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।’

‘দরজার দিকেই যাচ্ছিল, তুমি শিওর?’

আবার শ্রাগ করল মিরিনা। ‘শিওর হওয়ার কোন উপায় ছিল না। ধোয়া দেখলাম, লাল রঙের ঝিলিক দেখলাম, এর পর আর দেখিনি লোকটাকে।’

‘প্রবেশ পথের কাছে কেউই তাকে দেখেনি,’ কিশোর বলল। ‘ওরকম লাল আলখেল্লা পরা একজন লোককে দেখেও মনে থাকবে না কারণ, এটা হতে পারে না।’ মিরিনার দিকে তাকাল সে। আরও কিছু জিজ্ঞেস করার কথা ভাবছে। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন এল না মাথায়। ‘আপাতত আর কিছু মনে পড়ছে না। আমার প্রশ্ন শেষ।’

‘এবার যেতে পারি?’ হেসে জিজ্ঞেস করল মিরিনা। যেন গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বলতে পেরে ঝুশিই হয়েছে।

‘নিচয়ই।’ বলল কিশোর। মেয়েটা যেন কথা বলার জন্যে মুখিয়েই আছে। খটকা লাগল তার।

‘তোমার ওই যে আমেরিকান বস্তুটি,’ অবশ্যে বলনেই ফেলল মেয়েটা, যেন এটা জিজ্ঞেস করার জন্যেই কিশোরের এত প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। ‘ও কি সোনালি চুল পছন্দ করে?’

ও, এই ব্যাপার! দীর্ঘ একটা মৃহূর্ত নীরবে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর হাসল। কিছু বলতে যাবে এই সময় ডাক শোনা গেল, ‘মিরিনা, আয়ৈ মিরিনা!’

‘ওই যে, তোমার আম্বা ডাকছেন,’ কিশোর বলল। পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে চট করে গুঁজে দিল মিরিনার হাতে। ‘আশা করি আবার দেখা হবে। পকেটে রেখে দাও। প্রয়োজন হতে পারে আমাদেরকে।’

হাসল মিরিনা। ‘হয়তো।’

আলাদা হয়ে দু’জনে দু’দিকে এগোল ভিড়ের মধ্যে দিয়ে। কয়েক মিনিট পরেই এসে রবিন খামচে ধরল কিশোরের হাত। বলল, ‘এডগার ডুফারকে পেয়েছি।’

‘কি বলল?’

‘বোরাম যা বলেছে। দু’জনে নাকি গোল্ড রুমের বাইরে তর্ক করছিল।’

‘কি নিয়ে?’ জানতে চাইল কিশোর।

‘ক্রিমসন ফ্যান্টমের লেটেন্ট বই নিয়ে। নতুন আর্টিস্ট জোগাড় করেছে বোরাম। দুফার বলল, ওই আর্টিস্ট কোন কাজেরই না। ছায়া তৈরি করতে পারবে না।’

‘ছায়া?’

ক্রিমসন ফ্যান্টমকে সংষ্ঠি করে সেটাকে ফোটানৰ জন্যে নানা রকম বিচ্ছি আলোআঁধারি তৈরি করেছিল হফার। এই যেমন, চরিত্রার মাথায় কালো ছায়া। এমনিতেই মড়ার খুলির মত মুখোশ পরানো ওটার, তার ওপর ওই ছায়া একটা দুর্দান্ত আবহ তৈরি করে দিল। নতুন আর্টিস্টৰা ওগুলো সব বাদ দিয়ে দিয়েছে। দুফার বলছে, চরিত্রার কোন কিছুই রাখেনি ওরা। সব কিছু ডিয়ে-ফুড়িয়ে একেবারে জলো করে দিয়েছে।’

‘ইন্টারেস্টিং,’ কিশোর বলল। ‘চোরের মুখোশটার কথা মনে আছে? মড়ার খুলির মত। তার ওপর হালকা কালো রঙ, যেন ছায়াই তৈরি করা হয়েছে। আশা করি দুফার সেকথা স্বীকার করবে।’

‘স্বীকার করবে মানে?’

‘ফ্যান্টমের মাথায় কালো ছায়া যাদের পছন্দ, তাদেরই কেউ নিশ্চয় ওরকম মুখোশ পরবে,’ কিশোর বলল। ‘আরেকটা ব্যাপার, আলখেল্লা অনেক কিছু ঢেকে দেয়। ছদ্মবেশীদের জন্যে এটা এক মহা প্রয়োজনীয় পোশাক। ভেতরে কে আছে, বোৰা মুশকিল হয়ে পড়ে।’ পেটে চাপড় দিল কিশোর। ‘খিদে পেয়েছে। চলো, মুসাকে খুঁজে বের করি।’

‘সীটের ব্যবস্থা হয়েই আছে,’ জানাল রবিন। ‘দুফার আমাদেরকে তার টেবিলে খাওয়ার দাওয়াত করেছে।’

‘তাই নাকি? তাহলে তো খুবই ভাল। মুসা গেল কোথায়?’ ভিড়ের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর। চোখে পড়ল নীল বোরামকে। আইজাক হফারের বুকে হাত ঠেকিয়ে বললেন, ‘তোমার মুখটা বড় বেশি পাজি, হফার। আমার নামে যাতা বলে বেড়াচ্ছ। কানে এসেছে আমার।’

‘পাজি! তুমি আমাকে পাজি বলে গাল দিলে!’ রেগে আগুন হয়ে গেল বদমেজাজী আর্টিস্ট। ‘দাঢ়াও, আমি ও ছাড়ব না। বক্তৃতা যখন দেব, তখন বুঝবে।’

‘ঘোড়ার ডিম করবে!’ জোরে এক ধাক্কা মারলেন হফারকে বোরাম। ঘুসি মারার জন্যে হাত তুললেন।

ভিড়ের ওপর পড়ল হফার। সামলে নিয়ে সোজা হলো। সে-ও ঘুসি তুলল।

ঘুসি চালালেন বোরাম। লাগাতে পারলেন না। রেঞ্জের বাইরে রয়েছে হফার। হফারও ঘুসি চালাল। সে-ও লাগাতে পারল না। বোৰা গেল, মারামারি করতে জানে না দু'জনের একজনও।

দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল একজন লোক।

ঘরের দরজায় পাহারারত সেই ষাঁড়ের মত সিকিউরিটি গার্ড। হফারের কাঁধ চেপে ধরে টেনে সরাতে গেল তাকে। এই সময় আবার ঘুসি মেরে বসলেন বোরাম।

হৃফারের চোয়ালে লাগল। রেগে গাল দিয়ে উঠল হৃফার। কিন্তু গার্ড ধরে রেখেছে বলে কিছু করতে পারল না। একপাশ থেকে এসে বোরামকে ধরে ফেললেন মরগান।

বোরামের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিচাচ্ছে আর গালাগাল করছে হৃফার। টেনেটুনে দু'জনকেই মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। বসিয়ে দেয়া হলো সীটে। একজনের কাছ থেকে আরেকজনকে বহুরে, এমাথায় আর ওমাথায়। সশ্মেলনে যোগ দিতে আসা অন্য সদস্যরাও বসে পড়তে লাগল চেয়ারে।

মুসাকে খুঁজে পেল রবিন আর কিশোর। কিশোর জিজ্ঞেস করল মুসাকে, 'হৃফারের সম্পর্কে কি জানলে?'

'ডাকাতির সময় আর্টিষ্টদের কোন টেবিলের কাছেই তাকে দেখা যায়নি,' মুসা বলল।

'সব কিছুই কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! মেলাতে পারছি না! পোশাক প্রতিযোগিতায় এরকমই হয় নাকি?'

হাত ওল্টাল মুসা। 'কয়েকজন আর্টিষ্টের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। ওরা জানিয়েছে, ওখানে তখন ছিল না হৃফার।'

'তাহলে হৃফারকেও কিছু প্রশ্ন করা দরকার আমাদের,' পরামর্শ দিল রবিন।

'আগে খেয়ে নিই, চলো,' কিশোর বলল।

'চলো।'

টেবিলে বসে গেছে ডুফার। তিন গোয়েন্দাকে দেখে হাত নেড়ে ডাকল। খাবারের চেহারা দেখেই মেজাজ থারাপ হয়ে গেল কিশোরের। সালাদটা তো সহজে করা যায়, কিন্তু মূরগীর যা চেহারা—নিচয় সেন্ট হয়নি ঠিকমত, রবার হয়ে আছে। আলুগুলোও পোড়া।

রবিনের কানে কানে বলল মুসা, 'কিছু বলো না। পয়সা তো আর দিতে হবে না আমাদের। মুক্তে পেয়েছি। যা পেলাম খেয়ে নেয়া ভাল।'

খাওয়ার পরে হৃফারের সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা করেছিল তিন গোয়েন্দা, সেটা সম্ভব হলো না। দেখা গেল, ডিনার শেষের বক্তা হিসেবে তাকেই বেছে নেয়া হয়েছে।

উঠে দাঁড়াল হৃফার। 'আমাকে কিছু বলতে বলা হয়েছে, সে জন্যে প্রথমেই মিষ্টার মরগানকে ধন্যবাদ দিয়ে নিছি।' হাসল সে। 'ক্যালিফোর্নিয়ায় আসার পর এই প্রথম আমাকে এতটা গুরুত্ব দিল কেউ।'

তার উদ্দেশ্যে মদু হাসল শ্রোতারা।

'আমি জানি, কিছু লোকের ধারণা, আমি এখানে এসে কমিক তৈরি একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।' মাথা নাড়ল হৃফার। 'ভুল। তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। নতুন একটা হিরো তৈরির কাজে হাত দিয়েছি আমি। খুব তাড়াতাড়িই সেটাকে দেখতে পাবেন আপনারা।'

কেউ হাততালি দিয়ে, কেউবা কথা বলে তার এই কাজকে স্বাগত জানাল।

'কার হয়ে কাজ করছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল একজন।

সেদিক ঘুরল হৃফার। 'আমি আমার নিজের হয়ে ছাড়া আর কারও জন্যে কাজ

করি না। অন্তত এখন। এবার আমুর কমিক আমি নিজেই পাবলিশ করব। এতে অনেক বামেলা হয় বটে, কিন্তু মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আর, 'নীল বোরামের দিকে তাকাল সে। 'হাতছাড়া হওয়ার ভয়ও থাকে অনেক কম। ঠকিয়ে নেয়ার কেউ থাকে না তো।'

জুন্ট চোখে আর্টিস্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সম্পাদক। তার চকচকে টাকের চামড়া লালচে হয়ে উঠেছে।

নিজে পাবলিশ করার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল হফার। বঙ্গুত্তা শেষে উৎসাহী অনেক ভক্ত তুমুল করতালি আর চিৎকার-চেঁচামেচি করে আনন্দ প্রকাশ করল। জানাল, তার নতুন হিরোর আশায় উদ্ঘীব হয়ে অপেক্ষা করবে তারা।

তিন গোয়েন্দার সঙ্গে এক টেবিলে বসে মাথা দোলাল দুফার। 'হফার নতুন কমিক তৈরি করছে একথাটা আমার কানেও এসেছিল। যাক, সত্যিই করছে তাহলে। খুশি লাগছে।' চিন্তিত ভঙ্গিতে দাঢ়িতে আঙুল চালাতে লাগল সে। 'ভাবছি, পাবলিশ করার টাকা পেল কোথায়?'

'আমার বিশ্বাস,' কিশোর বলল। 'সেজন্যেই এখানে এসেছে সে। টাকা জোগাড়ের জন্যে।'

'অনেক টাকা দরকার। পাবলিশিং মুখের কথা নয়।'

'আইজাক হফারের ব্যাপারে আরেকটা প্রশ্ন জমা হলো!' বিড়বিড় করল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ডাকাতির সময়কার কোন অ্যালিবাই নেই হফারে। এখন মনে হচ্ছে, ডাকাতি করার একটা উদ্দেশ্য থাকলেও থাকতে পারে তার। মোটিভ? তা মোটিভটা হলো, টাকা।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। হাই তুলছে গোয়েন্দা সহকারী। 'কেমন লাগছে তোমার, বুঝতে পারছি,' কিশোর বলল। 'আপাতত হফারের সঙ্গে কথা বলা বাদ দিয়ে ঘুমোতে যাই চলো।'

'তা-ই চলো,' রবিন বলল।

মুসা তো রাজি হয়েই আছে।

'আমিও চলে যাব এখনি,' দুফার বলল।

তাকে গুড নাইট জানিয়ে রওনা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

পথে একটা টেবিলে আবার দেখা হলো মিরিনার সঙ্গে। সাথে তার মা রয়েছেন এবং বরাবরকার মতই টেবিলের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে আছেন।

ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল মিরিনা।

কিশোরের মনে হলো, হাসিটা বোধহয় রবিনের উদ্দেশেই। মনে মনে হাসল সে। রবিনকে বড় বেশি পছন্দ করে মেয়েরা।

তবে সেকথা মুহূর্তে ভুলে গেল কিশোর। তার মন জুড়ে রয়েছে কেসটার নানা প্রশ্ন, নানা রকম সমস্যা। বিছানায় শয়েও ভাবতেই থাকল সে। ঘুম আসছে না। একটু পরেই কানে এল দুই সহকারীর নাক ডাকার শব্দ।

হোটেলের অঙ্ককার ঘরে শয়ে শয়ে নানা কথা ভাবছে কিশোর। একসময় মনের পর্দায় ভেসে উঠল মিরিনা জরুড়নের মুখ। মনে হতে লাগল, মেয়েটা...মেয়েটা সত্যিই এসবে জড়িত নেই তো? থাকতেও পারে...

তাবনায় ছেদ পড়ল তার। খুট করে একটা শব্দ হলো দরজায়।

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল কিশোর।

কে যেন দরজা খুলে ঢোকার চেষ্টা করছে!

## আট

খুলে গেল দরজা।

একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল কিশোর। আবছা আলোয় লোকটাকে চিনতে পারার আগেই পেছনে লেগে গেল পাণ্ডা। ঘরে ঢুকেছে লোকটা।

বিছানার পাশের টেবিলের দিকে ঝটকা দিয়ে চলে গেল কিশোরের হাত, টেবিল ল্যাস্পের সুইচ টেপার জন্যে। কিন্তু অপরিচিত ঘরে তাড়াহড়া করতে গিয়ে সব ভঙ্গল করে দিল। নাড়া লেগে উল্টে পড়ে গেল ল্যাস্পটা।

‘কি! কি হয়েছে?’ চিন্কার শুরু করল রবিন আর মুসা, জেগে গেছে।

ঘরে লোক ঢুকেছে, মুসা টের পেল প্রথমে। লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে ধরতে গেল ওকে। অঙ্ককারে শুরু হয়ে গেল জাপটাজাপটি।

কিশোরও নেমে পড়েছে। ঘুসি মারতে গিয়েও সামলে নিল। সরিয়ে আনল হাত। কার গায়ে লাগবে ঠিক নেই। রবিন কিংবা মুসার গায়েও লাগতে পারে। দ্বিধায় পড়ে গেল সেজন্যে।

কিন্তু লোকটার সেই অসুবিধে নেই। যাকেই মারবে, যার গায়েই লাগবে, সেই শক্ত। কাজেই এলোপাতাড়ি মেরে চলল সে, আর মারতে লাগল গায়ের জোরে।

আগে বাড়তে গিয়ে পেটে লাথি থেল কিশোর। হঁক করে উঠে চেপে ধরল পেট। প্রচণ্ড ব্যথায় হাঁসফাঁস করতে লাগল।

পেট চেপে ধরেই দেয়ালের দিকে রওনা হলো। ‘সুইচবোর্ডটা খুঁজে বের করতে হবে...’

গাঁক করে উঠল একটা কষ্ট। তার পরেই শোনা গেল রবিনের চিন্কার, ‘পালাচ্ছে! ব্যাটা পালাচ্ছে!’

অঙ্ককারে আরও কিছু বিচির শব্দ শোনা গেল।

সুইচবোর্ডটায় হাত ঠেকল কিশোরের।

জুলে উঠল হাতে বোলানো ঝাড়বাতি। আলোয় ভেসে গেল ঘর। দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা।

দরজার দিকে দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা।

প্রথম মোড়টার কাছে পৌছে গেছে ততক্ষণে রহস্যময় লোকটা। মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মোড় পেরিয়ে এল ছেলেরাও। গেল কোথায় লোকটা? সামনে লম্বা বারান্দা, এত তাড়াতাড়ি দৌড়ে সেটা পেরোতে পারার কথা নয়।

‘নিশ্চয় কোন একটা ঘরে চুকে পড়েছে?’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। কোমরের কাছটায় চেপে ধরে রেখেছে, লাখি খেয়েছে ওখানে।

মুসা দৌড়ে গেল ‘একজিট’ সাইন লেখা একটা দরজার কাছে। একটানে পাল্লা খুলতেই কানে এল দ্রুত পদশব্দ।

‘ইমারজেন্সি সিঁড়ি দিয়ে নামছে ও!’ চিৎকার করে বলল সে, ‘জলন্দি এসো।’

দুপদ্মাপ করে নামতে শুরু করল তিনজনে। পদভারে কাঁপছে লোহার সিঁড়ি। ওরা যে পিছু নিয়েছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না নিশ্চয় লোকটার। বুরুক। কি আর করা? নিঃশব্দে তো নামার উপায় নেই।

লোকটাকে যেভাবেই হোক, ধরতে চায় কিশোর। একটা বোঝাপড়া আছে। চোরাই কমিকগুলো উদ্ধারের ব্যাপারটা তো আছেই, এখন যোগ হয়ে হয়েছে পেটের লাখি। আপনা থেকেই হাত মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল ওর।

মাটির নিচে গ্যারেজের প্রবেশ মুখের কাছে শেষ হয়েছে সিঁড়ি।

প্রায় একযোগে এসে দরজার গায়ের প্যানিক বারে ঝাপিয়ে পড়ল ওরা। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। বড় বড় থামের জন্যে ছাতের আলো ঠিকমত পৌছতে পারে না ওখানে। দরজার ওপরের বাস্তুটাও ভাঙ। কাজেই অঙ্ককারই বলা চলে জায়গাটাকে।

দৌড় দিল মুসা। ফংক্রীটের মেঝেতে জুতোর শব্দ হচ্ছে। কেয়ারই করল না সে। বাঁয়ে মোড় নিয়ে চিৎকার করে সঙ্গীদেরকে জানাল, ‘এদিকে।’

সামনে ছুটছে মৃত্তিটা। গতি বাড়িয়ে দিল মুসা। দেখতে দেখতে পেছনে ফেলে এল রবিন আর কিশোরকে।

লম্বা লম্বা পায়ে এগোল মুসা। লোকটার গায়ে গিয়ে পড়ার ইচ্ছে কিন্তু আচমকা ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। ঘুসি চালাল।

একটা থামের আড়ালে চলে গেল মুসা।

‘মুসা!’ থমকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল রবিন। ‘এই মুসা, ঠিক আছ তুমি?’

‘আমার দম বন্ধ করে দিয়েছে!’ হাঁপাতে হাঁপাতে থামের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল মুসা। ‘আরিবুপরে বাপ।’

সবার পেছনে ছিল কিশোর। মুসা অদৃশ্য হওয়ার পর রবিনকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখল। সাবধানে থাম ঘুরে এগোল সে। পাচ কদম এগোতেই জুলে উঠল গাড়ির হেডলাইট, চোখেমুখে পড়ে যেন অঙ্ক করে দিল তাকে।

একটা মাত্র আলো, আরব্য রঞ্জনীর সিন্দুরাদের গল্লের একচোখে দানব সাইক্রুপসের মত। আলোটার আকার দেখে অনুমান করল, ভ্যান জাতীয় গাড়ি।

একটা হেডলাইট কাজ না করলেও ইঞ্জিন ঠিকই কাজ করছে গাড়িটার। গ্যাস বাড়াতেই ভীষণ গর্জন করে খেপা ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে ছুটে আসতে লাগল কিশোরের দিকে।

চিৎকার দিয়ে রবিন আর মুসাকে হঁশিয়ার করেই পাশে লাফ দিল সে। থামের এপাশে বেরোতে গিয়ে হেডলাইট চোখে পড়ল, ওরা ও ঝাপিয়ে পড়ল মেঝেতে। টায়ারের তাঁক্ষ শব্দ করে পাশ দিয়ে চলে গেল গাড়িটা।

লাফিয়ে উঠেই ওটার পেছনে দৌড় দিল কিশোর। ততক্ষণে একজিট র্যাপ্সে

উঠে পড়েছে গাঢ়ি, দ্রুত ডানে ঘূরতে আরম্ভ করেছে। সে র্যাম্পের মাথায় উঠতে উঠতে যানবাহনের ডিডে চুকে গেল ওটা, হারিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

হতাশ ভঙ্গিতে ঝুলে পড়ল তার কাধ। অন্য দু'জন পৌছলে জিজেস করল, 'লাইসেন্স প্লেট দেখেছ? নাথার?'

'ইয়ার্কি করছ নাকি!' মুসার জবাব।

রবিন বলল, 'দেখার জন্যে থেমে থাকলে এতক্ষণে চ্যাপ্টা হয়ে যেতাম, চাকার নিচে পড়ে।'

'আমিও দেখতে পারিনি,' কিশোর বলল। 'ড্রাইভারকেও না। তোমরা কিছু দেখেছ?'

'গাড়িটা গাঢ় রঙের ছিল,' রবিন বলল। 'যদুর মনে হলো, ধূসর।'

'না, কালো,' মুসা বলল।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার কাছে লাগল কালচে সবুজ।'

'একটা হেলাইট নষ্ট।'

মুসার এই কথাটায় একমত হল কিশোর। 'ঠিক। তার মানে একটা সাইক্লপস ভ্যান পাওয়া গেল সূত্র হিসেবে। এরকম গাড়ি লস অ্যাঞ্জেলেসে খুব বেশি নেই।' জোরে একটা নিঃশ্঵াস ফেলে বলল, 'খুঁজে বের করতে তেমন সমস্যা হবে না।'

'সেই সমস্যার কথা পরেও ভাবা যাবে,' রবিন বলল। 'উপর্যুক্ত যে সমস্যা রয়েছে সেটার সমাধান করা দরকার আগে।'

কিশোর আর মুসা দু'জনেই তাকাল রবিনের দিকে। 'কি সমস্যা?'

'আমাদের ঘরের চাবি কেউ এনেছ? পাল্লা বন্ধ করলে তো আপনাআপনি তালা লেগে যায়।'

নিজের পরনের পাজামার দিকে তাকাল কিশোর। তারপর মুসা আর রবিনের দিকে। একজন পরেছে দোড়ের পোশাক, আরেকজন পাজামা। পকেট নেই। চাবি রাখার জায়গা নেই। 'হ্যাঁ!' মাথা দোলাল সে, 'রেজিস্ট্রেশন ডেক্সে গিয়ে আরেকটা চাবি চাইতে হবে আরাকি। কিন্তু যা পোশাক পরে বেরিয়েছি! লোকে সত্যি সত্যি এবার শ্রী ষুজেস ভাববে।'

সাইডওয়াকে উঠে পড়ল সে। 'চলো, যাই। রাতের হাওয়া মন্দ লাগবে না।'

একপাশে খাড়া হয়ে উঠেছে কংক্রিটের দেয়াল। কিছুদূর এগোতেই শেষ হয়ে এল, দেখা গেল সরু একটা প্রবেশ পথ, তার ওপাশে ছোট বাগান।

'এখান দিয়ে চুকে পড়া যাক,' প্রস্তাব দিল মুসা।

একটা রয়াল পাম গাছের কাছে আসতেই ছয়ার মধ্যে গুড়িয়ে উঠল কে যেন। মাটিতে পড়ে ছিল। উঠে বসল কোনমতে। পাতলা, রাগী চেহারা। চিনতে অসুবিধে হলো না। এডগার হুফার।

কি হয়েছে আপনার?: জিজেস করল কিশোর।

ঠোঁট ঝুলে গেছে হুফারের। মুখের একপাশে কাটা দাগ। চোখের কোণে কালশিটে পড়ে গেছে। ভৃকুটি করে মুখ বাঁকাতে গেল সে, সাধারণত যা করে, উফ করে উঠল ঠোঁটে ব্যথা লাগতে।

কি হয়েছে বলতে পারব না। ওই হট্টগোল ভাঙ্গাগছিল ত্রি, তাই বেরিয়ে

এসেছিলাম খোলা বাতাসে। কে জানি এসে পড়ল গায়ের ওপর।' উঠে দাঢ়াল হফার। ব্যথার ভয়ে আন্তে আন্তে খুব সাবধানে নড়াচড়া করছে। 'ভালমত পেটাল আমাকে সে। চেহারা দেখার সুযোগ পেলাম ন্না। তবে কে, আন্দাজ করতে পেরেছি।'

'কে?' জানতে চাইল রবিন।

'কে আমাকে পেটাতে চেয়েছিল? ঘূসি মেরেছিল হলঘরে?' হোটেলে ঢোকার গেটের দিকে পা বাড়াল হফার। 'নীল বোরাম।'

ডেতরে চুকল হফার। পেছনে তিন গোয়েন্দা। ছেলেদের দিকে বার বার তাকাচ্ছে আটিট, ওদের পোশাক অবাক করেছে তাকে।

রিসিপশন ডেক্সের দিকে ঘুরতে গেল রবিন। মাথা নেড়ে তাকে মানা করল কিশোর, 'আপাতত চাবির কথা ভুলে যাও।'

হফারকে অনুসরণ করে লবি ধরে চলল ওরা। নজর সামনের দিকে। আশেপাশে কারও দিকে তাকাচ্ছে না। মুখ টিপে হাসছে লোকে, টিটকারি দিচ্ছে, মস্তব্য করছে ওদের উদ্দেশে। এলিভেটরের কাছে এসে ব্রহ্মির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা।

চারজনেই এলিভেটরে উঠলে তিন নম্বর লেখা বোতামটা টিপল হফার।

সঘেলনের বেশির ভাগ অনুষ্ঠানই হচ্ছে দোতলার ঘরগুলোতে,' হফার বলল। আরও ওপরে উঠছে কেন, সেটা জানাল সে, 'নীল বোরামের ঘরের নম্বর তিনশো পঁয়তিরিশ। শুনে ফেলেছি। ওর সঙ্গে দেখা হওয়া প্রয়োজন এখন আমার।' মুঠো হয়ে গেল তার আঙুল।

এলিভেটর থেকে নেমে বারান্দা ধরে এগোল সে। পেছনে ছায়ার মত লেগে রইল তিন গোয়েন্দা।

৩৩৫ নম্বর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাবা দিল হফার।

ডেতর থেকে সাড়া দিলেন বোরাম। দরজা খুললেন। টাইয়ের নট চিলা করা। সুট এখনও পরাই রয়েছে।

সোজা কলার চেপে ধরল হফার। ঝাঁকাতে শুরু করল। চিংকার করে বলল, 'ভেবেছ পার পেয়ে যাবে! সেটি হচ্ছে না!'

'আরি, হফার, করো কি! করো কি!' চেঁচিয়ে উঠলেন বোরাম।

ডেতর থেকে ডাক শোনা গেল। দু'জনকে ছাড়ানৰ চেষ্টা করতে লাগল তিন গোয়েন্দা। দৌড়ে এলেন লুই মরগান। পেছনে কয়েকজন সোক, কমিকের কোন না কোন কাজ করে সবাই, হাতে গেলাস।

'কি করি!' ব্যাঙ ঝরল হফারের কঠে। 'এখনই বুঝবে! গোমার চেহারাটাকে আরেক রুক্ম করে না দিয়েছি তো আমার নাম হফার নয়। আমারটাকে যেহেন করেছে!'

'কি...কি বলছ তুমি...কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' গলায় চাপ, দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাস করছে বোরাম, কলার ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।

'ন্যাকা! বুঝতে পারছ না!' মুখ ভেঙ্গচাল হফার। 'আমার গায়ের ওপর এসে পড়েছিলে কেন? মারলে কেন?'

বোরাম কিছু বলার আগেই মরগান জিজ্ঞেস করলেন, 'কথন মারল?'

'এই তো কয়েক মিনিট আগে! ওকেই জিজ্ঞেস করুন না!'

মাথা নাড়তে লাগলেন মরগান। কি করে গেল? ওর ঘরে আমরা এসেছি বেশ কিছুক্ষণ হলো। বেরোয়নি। আমাদের দাওয়াত করে এনেছে।'

'পাটি চলেছে,' কিশোর মুখ খুলল এবার, 'কাজেই সবার চোখ এড়িয়ে চট করে বাইরে থেকে ঘুরে আসাটা অসম্ভব নয়।'

'হয়তো।' জোর দিয়ে বললেন মরগান, 'কিন্তু গত আধ ঘটায় যে বেরোয়নি এটা আমি বলতে পারি।' ঘরের মাঝখানের বড় একটা কাউচ দেখিয়ে বললেন, 'ও আর আমি ওখানে বসে ছিলাম এক্ষণ্ণ। কথা বলছিলাম।'

সরাসরি কিশোরের চোখের দিকে তাকালেন তিনি। 'বাইরে বেরোলে আমার চোখ এড়িয়ে কিছুতেই যেতে পারত না।'

## নয়

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়ল কিশোর। ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে তখনও রবিন আর মুসার, ঘুমোছে। শব্দ করল না সে, ওদের ঘূম তাঙ্গল না। ব্যাগ থেকে সাঁতারের স্যুটের একটা পাজামা বের করে পরল। গায়ে দিল একটা ঢোলা শার্ট। চাবি নিয়ে পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে।

পুলের কিনারে যাওয়ার জন্যে বেরোছে। তার ধারণা, ওখানে এই কেসটা নিয়ে ভাবলে জবাব মিলবে তাড়াতাড়ি। মগজটা ভালমত কাজ করবে ওখানে গেলে।

পুলের পানিতে নেমে পড়বে। চূপ করে ভাসতে ভাসতে মনটাকে ছেড়ে দেবে বন্ধাইন ভবে-যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াক। জট ছাড়াক রহস্যগুলোর। আজব এক জটিলতার মধ্যে পড়েছে। এক পা এগোলে দু'পা পিছিয়ে আসতে হচ্ছে।

যেমন ধরা যাক আইজাক হফারের কথা। লোকটাকে কাছে থেকে দেখলে তার সম্পর্কে অন্য একটা ধারণা হয়ে যায়। ওর 'রাগী রাগী' ভাবটা আর ততখানি থাকে না। রাগী, সন্দেহ নেই, তবে হাস্যকর একটা ব্যাপারও রয়েছে ওর মাঝে, কিছুটা ভাঁড়ামি। ওকে চোর হিসেবে কিছুতেই ভাবতে পারছে না কিশোর।

শুধু তা-ই নয়, রাতে ওদের ঘরে চুক্তে পড়েছিল সে, এটাও মানতে পারছে না। একটা ব্যাপার আলোচনা করে তিনজনেই একমত হয়েছে, যতটা জাপটাজাপটি ওরা করেছে ধরার জন্যে, তাতে আর যা-ই হোক, হফারের চেহারার ওই পরিবর্তন হতে পারে না, ওভাবে মারেইনি ওরা। তাহলে ওসব দাগ কার কাছ থেকে সংগ্রহ করল হফার?

সন্দেহ অন্য দিকে ঘোরানৰ জন্যে নিজেই নিজেকে পেটায়নি তো? নাহ। ভ্যানে করে লোকটা পালিয়ে যাওয়া আর তিন গোয়েন্দাৰ ওকে দেখে ফেলার মাঝে এতটা সময় পায়নি সে যে এরকম একটা কাও করতে পারবে।

আরেকটা কাজ করতে পারে। গাড়ির গায়ে ঠুকে ঠুকে মুখে দাগ করে ফেলে তারপর গাড়িটাকে কোথাও রেখে দিয়ে চলে আসা। ভাবতে গিয়ে এতটাই

হাস্যকর মনে হলো কিশোরের, হেসেই ফেলল। উঁচু, এই যুক্তি ধোপে টেকে না, ওরকম কাও আর যে-ই করতে পেরে থাকুক, ছফার পারবে না। ওরকম লোকই নয় সে।

বেশ। তা যদি না হয় তাহলে কে পেটাল তাকে? কেন? কমিক মূরির সঙ্গে এর কি কোন সম্পর্ক আছে? ডাকাতির ব্যাপারে এখনও সন্দেহের বাইরে নয় সে। কিন্তু যেহেতু পিটুনি খেয়েছে, আরও কেউ যে এসবে জড়িত রয়েছে, এটা স্পষ্ট। আরেকটা নতুন রহস্য এসে যোগ হল আগের রহস্যগুলোর সাথে।

এলিভেটরে করে নিচে নেমে এল কিশোর। লবি পেরোতে যাবে, এই সময় নাম ধরে ডাক শুনতে পেল। ঘুরে তাকিয়ে দেখল তাড়াছড়া করে আসছেন লুই মরগান।

‘এত সকালে উঠলে,’ বললেন কনভেনশন চীফ।

‘আপনিও তো উঠেছেন। কাল রাতে পার্টির পর ঘুমোতে নিশ্চয় অনেক রাত হয়েছে।’

‘বাধ্য হয়েই উঠতে হয়েছে,’ হাসলেন মরগান। ‘সম্মেলনের কাজ। অনেক ঝামেলা। কত রকম গোলমাল হতে পারে। আগেই সেগুলো বুঝে নিয়ে সাবধান থাকা দরকার। পারলে মিটিয়ে ফেলা দরকার, যাতে না হয়। ভাগ্যটা বরং ভালই মনে হচ্ছে। কিছুটা তো ঘুমিয়ে নিতে পেরেছি। গোল্ড ক্লামে গিয়ে দের্খ, লাল লাল চোখ হয়ে আছে কতজনার। বিশ ষষ্ঠা ধরে শুধু তাকিয়েই রয়েছে, রক অ্যাসটারয়েডের দিকে। সম্মেলন করতে এলে ঘুম-নিদ্রা সব বাড়িতে রেখে আসতে হয়।’

তবে, মরগানকে দেখে মনে হলো না ঘুমের বিশেষ অসুবিধে হয়েছে। ভালই বিশ্রাম নিয়েছেন। নতুন ধোয়া জিনস পরলেন, গায়ে নতুন ইন্টারকমিকল টি-শার্ট। বগলে চেপে রেখেছেন একটা ক্লিপবোর্ড। চকচকে চোখ। কাজ করার জন্যে পুরোপুরি তৈরি হয়ে এসেছেন।

নিজের চোহরা না দেখেও আন্দাজ করতে পারছে কিশোর, তার মুখে ক্লান্তির ছাপ ফুটে আছে।

‘তোমার কেসের খবর কি?’ জিজ্ঞেস করলেন মরগান, ‘তদন্ত কতটা এগোল?’

‘করছি। নতুন নতুন সব ব্যাপার বেরিয়ে আসছে, অবাক করার যত। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ছফারকে সন্দেহ করছি আমরা। বিশেষ করে তার অ্যালিবাইটাকে আপনি যখন ফুটো করে দিলেন। কিন্তু একটা কথা, সে যদি চোরই হবে, তার ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করতে গেল কে, কেন? তাকে মারলাই বা কেন?’

মাথা ঝাঁকালেন মরগান। কৌতুহলী মনে হচ্ছে। ‘তোমার কি মনে হয়?’

‘এখনও কিছু ভেবে ঠিক করতে পারিনি। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, হঠাৎ করেই কেউ মরিয়া হয়ে উঠেছে ছফারের জীবনটাকে হেল করে দেয়ার জন্যে। কোন একটা ঘাপলা কোথাও নিষ্ঠ আছে, যেটা এখনও ধরা পড়েনি আমাদের চোখে। অবস্থা দেখে তো মনে হয় ছফার শিকারি নয়, শিকার।’

ঘড়ি দেখলেন মরগান। ‘দেরি হয়ে যাচ্ছে। যা-ই হোক, তোমার সঙ্গে আমিও

একমত।' রওনা হয়ে গেলেন তিনি। এক পা গিয়েই ঘূরে তাকালেন। 'আমার মনে  
হয়, হফ্ফারকে নিয়ে যা ঘটছে তার অন্য ব্যাখ্যা আছে।'

'যেমন?'

'সেই যে পুরানো প্রবাদঃ চোরের সঙ্গে থাকতে থাকতে চোরই হয়ে যায়।'

এই শেষ কথাগুলো নাড়িয়ে দিল কিশোরকে। পুলের কাছে পৌছল চিন্তা করতে  
করতে। ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাতার কাটতে শুরু করল।

পানি তার খুব ভাল লাগে। এর একটা কারণ, পানিতে নাক ডুরিয়ে চুপচাপ  
ভেসে থেকে কিংবা চিত হয়ে চোখ বজ্জ করে ধীরে ধীরে সাঁতরানো যায়, আর এই  
সময়ে মগজটাকে খাটানো যায় পুরোদমে। জটিল সমস্যার সমাধান করা সহজ  
হয়, কারণ ভাবনায় একাধিতা আসে।

কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে শাস্ত হলো কিশোর। চুপ করে নাক ডুবিয়ে ভাসতে  
লাগল। চালু হয়ে গেছে মগজ। ভাবছে। কেউ হামলা করেছিল হফ্ফারকে। তার  
ঘরে মুসাকেও আক্রমণ করেছিল একটা লোক। তারপর গত রাতে তিনজনকেই  
এলোপাতাড়ি পিটিয়েছে কেউ। তিনটে ঘটনাই কি একই লোকের কাজ? সেই  
লাল আলখেন্দ্রা পরা লোকটা করেছে এসব, যে কমিকগুলো ছিনতাই করেছে?

মুখোশের জন্যে লোকটার মুখ দেখতে পারেনি মুসা, তবে শরীরের অনেকটাই  
দেখেছে। পেশীবছুল শরীরের লোকটার। ডাকাতির ব্যাপারে যাদেরকে সন্দেহ করা  
যায়, তাদের সঙ্গে এই লোকটার শরীরের মিল নেই। হফ্ফার লম্বা, পাতলা; দুফ্ফার  
মোটা, বোরাম ভুঁড়িওয়ালা। আর মিরিনা জরডানকে তো মেলানোই যায় না  
কোনমতে।

কাজেই চোরটা এমন কেউ, যাকে ওরা চেনেই না, কিংবা ওই ডাকাতির সঙ্গে  
একাধিক লোক জড়িত। জটগুলো ছাড়ানুর চেষ্টা করছে কিশোর, এই সময় পেছনে  
ঝপাং করে শব্দ হলো। ডাইড দিয়ে পড়েছে কেউ।

মাথা তুলল মেয়েটা। পরনে লাল সাঁতারের পোশাক। খাট বাদামী চুল মাথা  
এবং গালের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। সাঁতরাতে শুরু করল সে। পিছু নিল কিশোর।

সে যখন পুলের প্রাণে পৌছল, মেয়েটা তখন ফিরে সাঁতরাতে শুরু করেছে  
আরেক প্রাণের দিকে।

যাবে নাকি আবার? ভাবল কিশোর। যাওয়াই ঠিক করল। জোরে জোরে  
সাঁতরে চলে এল মেয়েটার পাশাপাশি। ভাল করে দেখার জন্যে মুখের দিকে  
তাকাল। বেশ সুন্দরী। রোদে পোড়া চামড়া। তার দিকে একবার তাকিয়েই গতি  
বাঢ়িয়ে দিল মেয়েটা।

প্রতিযোগিতা করতে চাইছে মনে হলো। লেগে গেল কিশোর কিন্তু কয়েক  
সেকেণ্ড পরেই বুরে গেল পারবে না মেয়েটার সঙ্গে। অনেক আগেই আরেক প্রাণে  
চলে গেল মেয়েটা, ঘূরে আবার আসতে শুরু করল। আয় মাঝ থেকে কিশোরকে  
পাশ কাটিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল।

আর চেষ্টা করল না কিশোর। লাজ নেই। পারবে না। অহেতুক পরিশ্রমে  
কাঁচ হওয়ার কোন মানে হয় না। তাছাড়া ক্ষান্ত হলে মগজও ঠিকমত কাজ করতে

চায় না। ভেসে থেকে তাকিয়ে রইল মেয়েটার দিকে।

পানি থেকে উঠে পড়ল মেয়েটা। চুলে আঙুল চালিয়ে পানি ঝরাল, তারপর গিয়ে বসল একটা লাউঞ্জ চেয়ারে। তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে লাগল। কয়েক ডলা দিয়ে তোয়ালেটা রেখে দিয়ে হেলান দিল চেয়ারে। আরাম হচ্ছে না বোধহয়। আবার উঠে চেয়ারটাকে ঘূরিয়ে রোদের দিকে মুখ করে বসল।

চেয়ারের হেলানে ঝোলুনো ছিল ব্যাগটা। নাড়া লেগে মাটিতে পড়ে গেল। মুখ খুলে ছড়িয়ে পড়ল ভেতরের জিনিস। লক্ষ্যই করল না মেয়েটা। সে রোদ নিয়ে ব্যস্ত। কিভাবে ঠিকমত গায়ে লাগে সেটা দেখছে।

কিশোর তাকিয়ে রয়েছে ব্যাগ থেকে বেরোনো জিনিসগুলোর দিকে। কমিকের বই। অনেকগুলো।

খুবই অবাক হয়েছে সে। কি করবে ঠিক করতে পারল না একটা মুহূর্ত। দুব দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে নিল যেন। তারপর সাঁতরাতে শুরু করল তীরের দিকে। পানি থেকেই দেখতে পেল কমিকগুলোর ভেতর থেকে উকি দিয়ে আছে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড। না না, একটা নয়, আরও আছে! আশ্চর্য! ওদের কমিকের বই আর কার্ডগুলো তো থাকার কথা হোটেলের ঘরে, একটাও তো বিক্রি করেনি এখনও। তাহলে মেয়েটা পেল কোথায়?

এর একটাই মানে হতে পারে। এই কমিক ওদের ঘরেরগুলো নয়। ম্যাড ডিকুসনের স্টল থেকে যেগুলো ছিনতাই হয়েছে সেগুলো। বাস্তে অনেক কার্ড ছিল। কিছু চুকে গিয়েছিল হয়তো বইগুলোর মাঝে।

কিন্তু মেয়েটার কাছে এই জিনিস এল কোথা থেকে?

## দশ

ভূতে তাড়া করেছে যেন, এমন তাড়াহুড়ো করে পানি থেকে উঠে এল কিশোর। তার কাও দেখে অবাক হলো মেয়েটা। পিঠ সোজা করে বসে তাকিয়ে রইল।

পানিতে নড়াচড়া করছিল বলে ততটা ভাল করে মেয়েটাকে দেখতে পারেনি কিশোর। এবার দেখল। বড় বড় চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। রোদে শুকানোর পর চুলের রঙও আরেক রকম হয়ে গেছে। বাদামী নেই আর এখন, সোনালি।

‘মিরিনা!’ বলে উঠল কিশোর, ‘তুমি এখানে কি করছ?’

চারপাশে তাকাল মিরিনা। অপরাধী অপরাধী একটা ভাব। অনুনয়ের সূরে বলল, ‘বলো না, পুরীজ। আমি ভেবেছিলাম কেউ দেখতে পাবে না...’

চেয়ারের পায়ের কাছে পড়ে থাকা কমিকগুলোর দিকে তাকাল আবার কিশোর। ‘কেন বলব না?’

ওর হাত চেপে ধরল মিরিনা। ‘পুরীজ! জানলে আমা আমাকে খুন করে ফেলবে!

এটা আশা করেনি কিশোর। চুপ করে রইল।

আবার বলল মিরিনা, ‘এত সকালে কেউ আসবে এখানে কল্পনাও করিনি।

কাজেই ভাবলাম, এই সুযোগে চট করে একবার সাঁতারটা দিয়েই আসি। আমা  
জানতে পারলে...'

চোখ মিটামিট করল কিশোর। 'কিসের কথা বলছ?'

'ওর সোনালি পরচুলাটার কথা। বিছিরি জিনিস! খোলার সুযোগ পেলেই খুলে  
রাখি। শুই ফালতু জিনিস কে মাথায় দিয়ে বেড়ায়! ভাবলাম, এভাবে কেউ চিনতে  
পারবে না আমাকে। ভুল করেছি।'

আরও সোজা হয়ে বসতে গিয়ে চেয়ারের একেবারে কিনারে ঢলে এল সে।  
তৃষ্ণি ঝুঁকে ছিলে, তাই পানিতে নামার আগে দেখতেই পাইনি তোমাকে। আশা  
করি, কাউকে কিছু বলবে না, আমাকে বকা শোনাবে না। কি আর করব!  
কপালটাই খারাপ! পড়লাম তো পড়লাম, একেবারে গোয়েন্দার সামনে!'

মুখ তুলে তাকাল মিরিনা। কিশোরের চোখে চোখ। দৃষ্টিতে অনুনয়। 'আমা  
যদি শোনে, আমি এই কাও করেছি, ভীষণ রেগে যাবে। স্টেলারা স্টারগার্লের মডেল  
হওয়া আর কোন দিনই হবে না হয়তো আমার। আমা সাহায্য না করলে...'

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, 'শোনো, আমি এসেছি জিজ্ঞেস করতে, এগুলোর  
ব্যাপারে।'

মাটি থেকে ব্যাগ আর কমিকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে মিরিনার দিকে বাড়িয়ে ধরল  
সে।

'এগুলো...!' বইগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মিরিনা, 'এগুলো এখানে এল  
কিভাবে!'

'আমিও সেটাই জানতে চাই,' গঞ্জির হয়ে বলল কিশোর।

'ওগুলো আমার নয়!' আজব কমিকগুলো দেখে প্রথমে অবাক হলো মিরিনা।  
কার্ডগুলো দেখে স্বত্ত্বাস ফেলল এই ভেবে যে কমিকের মালিকের নাম  
লেখা রয়েছে। তারপর রেগে গেল যখন দেখল কার্ডে কিশোরের নাম লেখা  
রয়েছে। 'এগুলো তো তোমাদের! তোমাদের কার্ড এর মধ্যে গুঁজে দিয়েছে!  
আমাকে ভয় দেখালে কেন...!'

খেমে গেল আচমকা। গোল গোল হয়ে গেল চোখ। 'সর্বনাশ! শুনেছি  
তোমাদের কমিকও চুরি হয়েছে! এগুলো নয় তো?'

চিত্তিত ভঙ্গিতে মেঘেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। এটা যদি অভিনয়  
হয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে মিরিনার অসকার পাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।  
তবে এতটা বাস্তব অভিনয় করতে পেরেছে বলে মনে হলো নো তার। সত্যি কথাই  
বলছে মেঘেটা।

'হ্যা, এগুলোই আমাদের চুরি যাওয়া কমিক,' কিশোর বলল। 'তিনশো ডলার  
দাম উঠে গেছে। তোমার ব্যাগে এল কি করে?'

হেলান দিল মিরিনা। বিশ্বয় রয়ে গেছে চোখে। কোলের উপর রাখা হাতের  
আঙুল মুঠো হয়ে গেছে। বলল, 'আমি জানি না!' জোর নেই গলায়।

কি বিপদে পড়েছে বুঝতে পারছে মিরিনা। এখন আর কেবল মায়ের বকা  
শুনেই পার পাবে না, আরও দুর্গতি আছে কংপালে। সে চোর, এটা জানাজানি হলে  
ক্যারিয়ার শেষ। মডেলিঙ্গের এখানেই ইতি।

আবার মুখ তুলে তাকাল মিরিনা। বিধ্বস্ত চেহারা। মেকআপ নেই বলেই যে ওরকম লাগছে, তা নয়।

‘এটা তোমার ব্যাগ, তাই না?’ শাস্ত্রকষ্টে জিঞ্জেস করল কিশোর।

চিরনি বের করল মিরিনা। চুলে চালাতে চালাতে বলল, ‘ব্যাগটা আমার, স্বীকার করছি। তবে ভেতরের জিনিসগুলোর খবর জানি না। কসম খেয়ে বলছি, কমিকগুলো আমি ঢোকাইনি।’

‘আজ সকালে কারও সাথে দেখা হয়েছিল, এখানে আসার আগে? কিংবা ব্যাগটা কোথাও রেখে গিয়েছিলে?’

মাথা নাড়ল মিরিনা। ‘না। দেখা যাতে না হয় সেটাই চাইছিলাম। সাবধান ছিলাম। আমি চাইনি কেউ। আমাকে চিনে ফেলুক। ঘর থেকে বেরোনোর পর সারাক্ষণই আমার সঙ্গে ছিল ওটা।’ একটু থেমে বলল, ‘একটা সময় বাদে। যখন আমি পানিতে ছিলাম।’

‘হ্যাঁ,’ মাথা দোলাল কিশোর। যে কেউ চুরি করে কমিকগুলো মিরিনার ব্যাগে চুকিয়ে রাখতে পারে। এটা এমন কোন কঠিন কাজ না। যেন দেখতে পাবে লোকটাকে, এমন ভঙ্গিতে পুলের চারপাশে নজর বোলাল সে। কেউ নেই। এমনকি লাইফগার্ডও না।

পানিতে মিরিনার তো বটেই, কিশোরেরও নজর ছিল না এদিকে। সে-ও ওর সঙ্গে সাঁতরাঁছিল। ওই সুযোগে যে কেউ এসে ওগুলো ব্যাগে চুকিয়ে রেখে যেতে পারে ওদের অলঙ্ক্ষে, এতটাই মগ্ন হয়ে ছিল ওরা। হয়ত তা-ই করেছে লোকটা।

মিরিনার কথায় চমক ভাঙল কিশোরের, ‘তুমি নিশ্চয় এগুলো দেরত চাও।’ কমিকগুলো কিশোরের দিকে তুলে ধরল মেয়েটা। ‘জিনিসগুলো তোমার। কিন্তু আমার ব্যাগে রাখল কে?’

‘বিশ্বিত ভাবটা কেটে গিয়ে হাসি ফুটল মিরিনার মুখে। ‘ওই পচা স্পাই স্টেরিগুলোর মত ঘটনা। যাকে ফাসাতে চায় তার অজাতে শক্রপক্ষের লোক এসে বেআইনী জিনিস চুকিয়ে রেখে যায়। পুলিশ এসে ধরে তখন লোকটাকে, এবং ভুলটা করে।’

মিরিনার তোয়ালেটা চেয়ে নিল কিশোর। গা মুছতে লাগল। ভাবছে, আসলেই কি এই ব্যাপার ঘটেছে? মিরিনাকে ফাঁসানুর জন্যেই একাজ করেছে কেউ?

কমিকগুলো হাতে নিয়ে এক এক করে দেখতে লাগল সে। ‘হ্যাঁ, এগুলোই চুরি হয়েছিল। হতে পারে, অন্যের ব্যাগে চুকিয়ে দিয়ে এগুলো সরিয়ে দিতে চেয়েছে চোরটা। হয়তো তার কাজে লাগবে না, কিংবা বিক্রি করার সাহস করতে পারেনি। কিন্তু সরানুর জন্যে তোমাকে বেছে নিল কেন?’

জবাব দিতে পারল না মিরিনা।

হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। মিরিনার মা! সাংঘাতিক চালাক মহিলা। বিজ্ঞাপনের জাদুকর বলা চলে। বর্ণ পাবলিসিটি হাউগ। মিরিনার কাছে চোরাই কমিক পাওয়া গেছে, মেয়েরজন্যে এর চেয়ে বড় বিজ্ঞাপন আর কি হতে পারে?

সেটা করার জন্যেই হয়তো কমিকগুলো চুরি করেছেন মিসেস জরুডান।

নিজেও করে থাকতে পারেন।

মিরিনাৰ দিকে তাকাল কিশোৱ। ওৱ দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। নিষ্পাপ চাহনী। নাহ, ওই মেয়ে একাজ কৰেনি। যা বলছে সত্যই বলছে। মিরিনা আৱ লাল আলখেলুকে একসাথে দেখেছে ম্যাড ডিক্সনেৱ স্টেলেৱ সামনে। মিসেস জৱডান কি ছিলেন তখন ওখানে? থাকলেও হয়ত মেয়েৱ অলঙ্কৰ। তাৱ পৱিকল্পনাৰ কথা কিছুই জানাননি মেয়েকে।

আৱেকটা প্ৰশ্ন কৰতে যাবে কিশোৱ মিরিনাকে, এই সময় পেছনে হিসিয়ে উঠল রাগী কষ্ট, 'ও, তাহলে এখানে এসে বসে আছ!'

ঘূৱে তাকাল কিশোৱ। জুলত চোখে মিরিনাৰ দিকে তাকিয়ে রয়েছেন মিসেস জৱডান।

'এভাৱে গায়েৰ হয়ে যাওয়াৰ মানেটা কি?' কড়া গলায় আবাৱ শৰালেন মিসেস জৱডান। 'আমি ওদিকে সারা হোটেল খুঁজে মৱছি। কি কৰছ এখানে? এই পোশাকে, একটা সো-কলড ডিটেকটিভেৰ সাথে?'

নিজেৰ জিনিসপত্ৰ তুলে নিতে লাগল মিরিনা। এই সময়টায় তাৱ মায়েৰ অগুদৃষ্টি সহ্য কৰতে হল কিশোৱকে। ইতিমধ্যে একবাৱ মুখ তুলে মায়েৰ দিকে তাকিয়ে মিনমিন কৰে বলল মিরিনা, 'সৱি, আশা, ভুল হয়ে গেছে...'

'হয়েছে!' ধৰ্মক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলেন যা, 'জলনি যাও!' নিজেৰ মাথাৰ হ্যাট খুলে বাঢ়িয়ে দিয়ে বললেন, 'পৰ এটা! কেউ দেখে ফেলাৰ আগেই। সানগুস পৰ। ইস্মি রে, কেউ দেখেই ফেলল কি-না...'

মেয়েৰ হাত চেপে ধৰলেন মিসেস জৱডান। টান দিলেন হাঁটাৰ জন্যে। মিৱা, কি যে কৱিস, কিছু বুঝি না! ভূত চাপে নাকি তোৱ মাথায়! এত কৰে বললাম, টেলিভিশনে একটা সাক্ষাৎকাৱেৰ ব্যবস্থা কৱেছি আজ। বুৰোসমৰে চলবি। সকালে উঠেই তৈৱি হৰি। তা না কৰে চলে এসেছিস এখানে? জানিস না, এভাৱে ভিজিয়ে উঠে রোদে শকালে চামড়াৰ সৰ্বনাশ হয়ে যায়? কত আৱ শেখাৰ! বিৱৰক হয়ে গেছি!'

চৱকিৰ মত পাক খেয়ে হঠাৎ কিশোৱেৰ দিকে ঘূৱলেন মহিলা। 'ইয়াৎ ম্যান, আমি আশা কৱব, আমাৱ মেয়ে সম্পর্কে যেন কোন গুজব ছড়ানো না হয়। ওৱ ভাল হোক, এটাই তোমাৱ চাওয়া উচিত। একটা কথা বিশেষ ভাৱে বলে দিছি, সে রঞ্জম কিছু যদি ঘটে, তোমাৱ সঙ্গে বোৰাপড়া হবে আমাৱ। আমি তোমাকে ছাড়াব না। মনে রেখো কথাটা।'

মায়েৰ পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মিরিনা। যৱমে মৱে যাচ্ছে যেন। আবাৱ তাৱ হাত ধৰে টানলেন মিসেস জৱডান। কিশোৱেৰ দিকে তাকিয়ে জোৱ কৰে মুখে হাসি ফোটাল মিরিনা। অসহায়েৰ হাসি।

জোৱে জোৱে হাঁটছেন মিসেস জৱডান। তাৱ পোশাকেৰ দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোৱ। পোশাকেৰ ঝুলটুল সব মিলিয়ে বিচিত্ৰই শাগছে। আলখেলুৱ সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে। ওপৱেৱে পোশাকেৰ নিচে আৱেকটা পোশাক রয়েছে মহিলাৰু। আলখেলুৱ মত অনেকটা।

সেদিকে তাকিয়ে কিশোৱ ভাৱহে, লাল আলখেলুৱ পৱে যে এসেছিল স্টেলেৱ

কাছে, তাকে পুরুষ হতেই হবে, এমন কোন কথা নেই।

## এগারো

হড়মুড় করে ঘরে ঢুকল কিশোর। মুসা আর রবিনের ঘূম তখনও পুরোপুরি ভাঙ্গেনি। শব্দ শুনে দু'জনেই চোখ মেলে তাকাল। কিশোরের হাতের কমিকগুলো দেখে পুরো সজাগ হয়ে গেল।

'বাইছে!' বিছানায় উঠে বসতে বলল মুসা, 'কোথায় পেলে?'

'পানির কাছে।' খুলে বলতে যাচ্ছিল কিশোর, তার আগেই ফোন বাজল।

'জ্বালাল!' গিয়ে রিসিভার তুলল মুসা। কানে টেকিয়ে শুনে ভুক্ত উঁচু হয়ে গেল। রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার আব্বা।'

উঠে এসে রিসিভার নিয়ে কানে টেকাল রবিন। 'বাবা, কি ব্যাপার...ও, তাই নাকি?...আচ্ছা, দেখি...' রিসিভারে আমিয়ে রেখে বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, 'মিষ্টার বার্টলেট লজ। ভ্যান মুইজে একটা ব্যাও পার্ট হবে, একটা ক্যাসেট পাঠাবেন, সে-জন্যেই বাড়িতে ফোন করেছিলেন আমাকে। যেতে হবে।'

'দিয়ে আসতে হবে নাকি আমাকে?' মুসার প্রশ্ন।

'যদি দয়া করো,' হসে বলল রবিন।

'আমিও আসছি তোমাদের সঙ্গে,' কিশোর বলল। 'যেতে যেতে বলব সব।'

'আচ্ছা।' আবার রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করল রবিন। মিষ্টার লজকে ফোন করে বলল, এক ঘণ্টার মধ্যেই আসছে সে।

কয়েক মিনিটেই তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরোল তিনজনে। নিচে নামার জন্যে রওনা হলো এলিভেটরের দিকে। ৩১৪ নম্বর ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল একজন লোক। শজারুর কাঁটার মত খাড়া খাড়া চুল। হাতে কার্ডবোর্ডের একটা বড় বাক্স। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে ভেতরে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, চলি। নিচে নিয়ে যাচ্ছি এগুলো।'

লোকটা ওদের পেছনে পড়ে গেল। এলিভেটর এল। উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। ডেকে বলল লোকটা, 'অ্যাই, দাঁড়াও, চলে যেও না।'

'ওপেন' সেখা বোতামটা টিপে দিল মুসা।

ভেতরে ঢুকল লোকটা। 'থ্যাংকস। এই জিনিস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। বাপরে বাপ, পাথর!'

বাক্সটা পিছলে গেল। খসে পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল কিশোর। এই সুযোগে ভেতরে তাকানোর সুযোগ হয়ে গেল। ভিড়ও টেপে বোঝাই।

আরেকবার ধন্যবাদ দিল লোকটা। জিভেস করল, 'লবিটা একটু টিপবে, পুীজ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। টিপে দিল বোতামটা।

লবিতে এলিভেটর থামতেই আর যাতে পিছলাতে না পারে এমন ভাবে বাক্সটা শক্ত করে ধরে বেরিয়ে গেল লোকটা। তিন গোয়েন্দা রয়ে গেল। আগুরগ্রাউণ্ড

গ্যারেজে নামবে ওরা ।

বেলা বেশি হয়নি । রাস্তায় যানবাহনের ভিড় কম । দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে এল ওরা রকি বীচে বার্টলেট লজের অফিসে । বাড়িতেই অফিস করেছেন তিনি । ওরা থামতে না থামতেই ভেতর থেকে বিরিয়ে এলেন ট্যালেন্ট এজেন্ট, পরনে ফুটবল খেলোয়াড়ের জারসি, চোখে সানগ্লাস । ব্যায়াম করতে যাচ্ছিলেন । রবিনকে দেখে বললেন, ‘এসেছ । এক মিনিট । আসছি ।’ আবার ভেতরে চলে গেলেন তিনি । বেরিয়ে এলেন ছোট একটা প্যাকেট নিয়ে । সেটা রবিনের হাতে দিয়ে বললেন, ‘ঘূম থেকে জাগিয়েছে আমাকে ঝুঁকে মালিক । এটা চায় । দিয়ে আসতে পারবে?’ হাই তুললেন তিনি । ‘বলো, সারা রাতে কাজ করে এত সকালে ওঠা যায়? ব্যবসাটাই নিশ্চারদের ।’

যেন তাঁর হাইয়ের জবাবেই হাই তুলল মুসা । রবিনও । দেখে হেসে ফেললেন তিনি । ‘বাহ, তোমাদেরও দেখি একই অবস্থা! জেগে ছিলে নাকি সারারাত?’ জবাবের অপেক্ষা না করেই রবিনকে বললেন, ‘প্যাকেটের গায়ে ঠিকানা আছে । যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না । কিছু মনে করো না । আর কাউকে...’

বাধা দিয়ে মুসা বলল, ‘না না, ঠিক আছে ।’

প্যাকেটে গানের টেপ রয়েছে, ঝুঁকে মালিকের দরকার । পৌছে দিতে বেশিক্ষণ লাগল না ওদের । স্যান ডিয়েগো ফ্রিওয়ে ধরে আবার লজ অ্যাঞ্জেলেসে ফেরার সময় ট্র্যাফিকের ভিড় দেখতে পেল ।

ফ্রিওয়ে থেকে সরে এল মুসা । বিকল্প রাস্তা হিসেবে বেছে নিল সেপুলভেড বুলভারকে । সান্তা মনিকার ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় আবার রাস্তা বদল করে পিকো ধরে চলল সে ।

‘কি হলো?’ জিজ্ঞেস করল রবিন, ‘যাচ্ছ নাকি কোথাও?’

‘এলামই যখন,’ জবাব দিল মুসা । ‘আরেকবার ম্যাড ডিকসনের দোকানটা ঘুরে যেতে চাই । কাল রাতের একটা ব্যাপার খচখচ করছে মনের মধ্যে ।’

পুরানো একটা সবুজ ভ্যানের কাছে এসে গাড়ি রাখল সে । সেই গাড়িটাই, আগের দিন যেটাতে করে কমিক নিয়ে গিয়েছিলেন ডিকসন ।

‘কাল রাতে একটা ভ্যান আরেকটু হলেই চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল আমাদেরকে, নিজেকেই যেন বলছে মুসা । ‘আমার কাছে তখন অন্য রকম রঙ লেগেছে । কিন্তু কিশোর বলল সবুজ, তাই একবার দেখতে এলাম ।’

‘লস অ্যাঞ্জেলেসে সবুজ ভ্যান অনেক আছে,’ কিশোর বলল ।

‘কিন্তু একটা সূত্র আছে আমাদের হাতে ।’ গাড়ি থেকে নেমে ঘুরে গাড়ির সামনের দিকে চলে গেল মুসা । ফিরে এল একবার দেখেই । গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল, ‘আমাদের সাইক্লপসকে পেয়েছি । একটা হেডলাইট ভাঙ্গা ।’

বাকি পথটী আলোচনা করল ওরা ব্যাপারটা নিয়ে ।

‘তার মানে,’ রবিন বলল, ‘কাল রাতে আমাদের ঘরে তুকেছিলেন ডিকসনই । কেন? আমরা তো তাঁর হয়েই কাজ করছি, তাই না? তিনি আমাদের মক্কেল ।’

‘হতে পারে,’ কিশোর বলল, ‘আমাদেরকে একটা কভার হিসেবে ব্যবহার করছেন তিনি ।’

ঝাট করে তার দিকে ফিরল রবিন। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে দৃষ্টি। তুমি বলতে চাইছ, তিনিই কমিকগুলো চুরি করেছেন, আমাদের বোকা বানিয়েছেন, কাজে লাগিয়ে দিয়ে সবাইকে দেখাতে চেয়েছেন তিনি নিরপেরাধ। যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে!' মাথা ঝাঁকাল সে। 'চমৎকার একটা মোটিভও রয়েছে তাঁর। বিজ্ঞাপন।'

ডিকসনের স্টলের ডাকাতির কথা কনভেনশনে আসা প্রতিটি মানুষ শুনেছে, কিশোর বলল। 'বাজি রেখে বলতে পারি, সবাই ওরা স্টলে গিয়েছে দেখার জন্যে।'

একমত হয়ে মূসা ও মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ। এবং এটাই চেয়েছিলেন ম্যাড। তৈরি থেকেছেন ওদের জন্যে। কাল আরও কত বই আনিয়েছেন, মনে আছে?' ভুকুটি করল সে। 'কিন্তু ডাকাতির সময় স্টলেই ছিলেন। তিনি ক্রিমসন ফ্যান্টম নন।'

'না। কিন্তু তাঁর সহকারী থাকতে বাধা কোথায়? কাজ শেষ করে লোকটাকে দ্রুত সরে পড়তে বলে রেখেছেন।'

'হ্যাঁ, এইবার মিলে যাচ্ছে খাপে খাপে,' মাথা দেঁলাল মুসা। 'আর একটা প্রশ্ন। কোন্ত লোকটাকে সহকারী বলে মনে হয় তোমার?'

রবিন বলল, 'জেনেই যখন ফেলেছি, আর তাঁকে ব্যবসার সুযোগ দেব কেন?' দুষ্ট হাসি ফুটল তার মুখে। 'চলো, তার ঘাম ছুটিয়ে দিই। হারিয়ে যাওয়া কমিকগুলো রহস্যময় ভাবে আবার আমাদের হাতে চলে এসেছে, সেটা জানলে ভিড়মি থেয়ে পড়বেন পাগল সাহেব।'

হাসল কিশোর। 'কথাটা মন্দ বলোনি। তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখেই অনুমান করতে পারব, কাজটা তিনিই করেছেন কি-না। আবার চোরের সঙ্গানে বেরোতে হবে কি-না আমাদেরকে। 'হোটেলের ঘর থেকে কমিকগুলো নিয়ে কনভেনশন ফ্লোরেই চলে যাব, চলো।'

হোটেলে পৌছে নিজেদের ঘরে চলল ওরা। এই বার ৩১৪ নম্বর ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় লুই মরগান স্বয়ং বেরিয়ে এলেন। 'এই যে, তোমাদেরই খুঁজছিলাম! কথাটা কি সত্যি? মিরিনা জরডান নাকি চোরাই কমিকগুলো খুঁজে পেয়েছে?'

'সবগুলো নয়, কিন্তু,' মরগানের কথায় হাসি চেপে রাখতে পারছে না কিশোর, 'কেবল আমাদেরগুলো।' তাহলে যা আন্দাজ করেছিল, তা-ই ঠিক। মিসেস জরডান এভাবে বিজ্ঞাপনই করতে চেয়েছিলেন।

কিশোরের মনের কথা পড়তে পেরেই যেন মরগান বললেন, 'মিরিনার মা কিছুই বলছে না। তবে তার মেয়ের বিজ্ঞাপন হয়ে গেল ভালমত। যা-ই হোক, তোমাদের খুঁজছিল মহিলা। কমিকগুলোর জন্যে, ওগুলো হাতে নিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবে মিরিনা।'

নাক ঘোঁত ঘোঁত করলেন তিনি। 'থবর পেয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকজন সাংবাদিক হাজির হয়ে গেছে। মিসেস জরডানের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে গন উইথ দ্য উইঙ্গের মত আরেকটা ছবি তৈরি করতে যাচ্ছেন তিনি।'

'লোকের ভিড় জমে যাবে তো হোটেলে!' কিশোর বলল। 'মিরিনাকে দেখার

জন্মে...

'এটাই চেয়েছেন মহিলা। কি করে কাজটা করলেন তিনি, জানি না, ম্যানেজারকে রাজি করিয়ে ফেলেছেন। তাঁর মেয়ের জন্মে আলাদা এলিভেটরের ব্যবস্থা হয়েছে, সাথে থাকবে ইউনিফর্ম পরা আর্দালি।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন তিনি, 'ভাব একবার অবস্থাটা! এই হোটেলে চুকেছিল স্টারগার্লের সাধারণ মডেল হয়ে, ফেরত যাবে বীতিমত স্টার হয়ে।'

এই সময় দেখা গেল মিরিনাকে। এলিভেটরের দিকে চলেছে। পরনে আবার সেই স্টেলার স্টারগার্লের পোশাক। কিশোরের ওপর চোখ পড়তে অস্বস্তি ভরা হাসি হাসল। বুবতে পারল কিশোর, মঞ্চ-ভীতিতে ধরেছে মেয়েটাকে। আরেকটা ব্যাপার, মিরিনা এক।

'আমার মনে হয়,' ব্যাপারটা মরগানও লক্ষ্য করেছেন, 'আগেই নিচে চলে গেছেন মিসেস জরডান। রিপোর্টারদের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছেন। একটা বিষয়ে অন্তত শিওর হলাম, আগাগোড়া মিথ্যে বলেননি মহিলা।'

ঘরে ফিরে গেলেন মরগান।

আবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। ভাবছে। ঘটনাটা কি? এরকম করলেন কেন কনভেনশন চীফ? এটা তো তাঁর সম্মেলনের জন্মেও একটা বিরাট বিজ্ঞাপন।

'মিরিনাকে কমিকগুলো দেয়া যায়, কি বল?' দুই সহকারীর মতামত জানতে চাইল কিশোর।

শ্রাগ করল শুধু মুসা।

রবিন বলল, 'অসুবিধে নেই।'

ঘরে ঢুকল ওরা। কমিকগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে রওনা দিল এলিভেটরের দিকে।

ব্যক্তিগত এলিভেটরের সামনে তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে মিরিনা। নিঃসঙ্গ। পরনে নীল আলখেলুটা শেষ বারের মত টেনেটুনে ঠিক করল। এলিভেটরের দরজার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকাল, যেন আলিবাবার ডাকাতের পাহাড়ের দরজা খুলতে যাচ্ছে। ভেতরে গিয়ে ধনরত্নও পেতে পারে, আবার ডাকাতের তলোয়ারে মুগ্ধ কাটা যেতে পারে।

ওর কাছ থেকে দশ ফুট দূরে রয়েছে কিশোর, এই সময় এলিভেটর এল।

'মিরিনা,' ডাকল কিশোর। মেয়েটা ফিরে তাকাতেই হাতের কমিকগুলো তুলে দেখাল।

কিশোরকে দেখে খুশি হলো মিরিনা। একা যেতে ভয় করছিল যেন। পরিচিত একটা মুখ দেখে সাহস পেল।

এবং এদিকে তাকিয়ে ছিল বলেই এলিভেটরের গোলমালটা চোখে পড়ল না তার। দরজা খুলে গেছে। ভেতরে উজ্জ্বল আলো থাকার কথা। অথচ আলোই নেই। অঙ্ককার।

বেরিয়ে এল একটা হাত। আর্দালির নয়। ধরে, এক হ্যাচকা টান দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল মিরিনাকে।

## বারো

এলিভেটরের দিকে ছুটে গেল কিশোর। পেছনে রবিন আর মুসা। ওরা এসে পৌছতে পৌছতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মাঝ পথে আটকে গেল মিরিনার চিংকার।

হাতে কমিকগুলো ধরাই রয়েছে। পাই করে ঘুরল কিশোর। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। দুই সহকারীকে বলল, ‘এসো!’

ঘোরানো লোহার সিডিটার দিকে দৌড় দিল সে। আগের রাতে এটা দিয়েই পালিয়েছিল ওদের ঘরের চোর। এক টানে দরজা খুলেই ভেতরে চুকে পড়ল কিশোর। একেক লাফে দু’তিনটে করে ধাপ পেরিয়ে নামতে লাগল।

তার সাথে পাণ্ডা দিতে মুসার অসুবিধে হল না, তবে রবিন পেরে উঠল না। পিছিয়ে পড়তে লাগল।

পা ব্যথা ওরু হয়েছে কিশোরের। মাঃসপেশীতে খিচ ধরছে এভাবে নামতে গিয়ে। কেয়ার করছে না। তার এক চিন্তা, মিরিনাকে ধরতে পারবে তো? নামতে পারবে এলিভেটরের আগে?

অসঙ্গবই মনে হলো। তবু হাল ছাড়ল না। গতি কমাল না। নেমে চলল একই ভাবে।

লবিতে পৌছেও থামল না কিশোর। টিভির সাংবাদিক সহ অনেকেই রয়েছে এখানে। এতগুলো মানুষের সামনে কিছুতেই বেরোবে না লোকটা মিরিনাকে নিয়ে। অন্য কোন তলায় নামারও সাহস করবে না। এলিভেটরের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে যে কেউ, দেখে ফেলার ভয় আছে।

লোকটার জন্যে একমাত্র নিরাপদ জায়গা হলো গ্যারেজে নামা।

সিডির শেষ কয়েকটা ধাপ যেন উড়ে নেমে এল কিশোর। আগের রাতের মতই গিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল প্যানিক বারের ওপর। লোকটা বেরিয়ে গিয়ে মিরিনাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে পরার আগেই ধরতে না পারলে...

এলিভেটর ব্যাংকের দিকে দৌড় দিল সে। ধন্তাধন্তি আর চিংকারের চাপা শব্দ যেন মধুবর্ষণ করল তার কানে। এর অর্থ এখনও এলিভেটরের ভেতরেই রয়েছে মিরিন। মুক্তির চেষ্টা করছে।

‘তুমি থামবে!’ ধমক শোনা গেল। ‘গায়ে হাত তুলতে চাই না আমি। আমার জিনিসগুলো কোথায় লুকিয়েছে বলে দাও, ছেড়ে দেব।’

পরিচিত কষ্টস্বর। দরজা খুলে বেরিয়ে এলে কিশোর দেখল, তার অনুমান ঠিক। মিরিনাকে টেনেইচড়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ম্যাড ডিকসন।

কমিক হাতে কিশোরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে গেলেন তিনি। আপনাআপনি চিল হয়ে গেল মিরিনার গলা পেঁচিয়ে ধরা হাতের বাঁধন।

এটাই চেয়েছিল কিশোর। টেনে সরিয়ে আনল মিরিনাকে। এক ধাক্কায় ডিকসনকে ফেলে দিল কংক্রিটের দেয়ালের ওপর। দেয়ালে দুপ করে বাঢ়ি খেলো কমিক বিক্রেতার শরীর। ক্ষণিকের জন্যে অসংড় হয়ে গেল যেন।

টলমল করছে মিরিনার পা। শরীরের ভার রাখতে পারছে না যেন। একবার

তুলে উঠেই পড়তে শুরু করল কাটা কলাগাছের মত।

কমিকগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে তাকে ধরতে গেল কিশোর। এই সময় ঝাঁপিয়ে এসে পড়লেন ডিক্সন। জড়োর পঁচ কষার সময় নেই। সরাসরি ঘূসি মারল তাঁর চোয়ালে কিশোর। আবার গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেলেন কমিক বিক্রেতা।

রবিন আর মুসা পৌছে গেছে। মিরিনাকে ধরল রবিন। মুসা এগোল কিশোরকে সাহায্য করতে। এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরল ডিক্সনকে।

পাশে চলে এল কিশোর। কমিক বিক্রেতার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, ‘মেয়েমানুষের সঙ্গে ধন্তাধন্তি করার চেয়ে পুরুষমানুষের সঙ্গে করা অনেক কঠিন, তাই না?’

মিরিনাকে আবার সোজা হয়ে দাঢ়াতে সাহায্য করল রবিন। ডিক্সনকে ধরে রেখেছে মুসা। মিরিনার কাছে এসে কিশোর সাম্ভনা দিয়ে বলল, ‘আর তব নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। ও আর কিছু করতে পারবে না তোমার।’

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল মিরিনা। তারপর হঠাৎই যেন কথাটা মনে পড়তে চিন্তার করে বলল, ‘হায় হায়, ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে! আম্মা আমাকে মেরে ফেলবে...’

বিদ্যুৎ থেলে গেল যেন ওর শরীরে। রবিনের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বট করে বসে পড়ে কমিকগুলো কুড়াতে লাগল। তুলতে তুলতেই কিশোরের দিকে তাকাল একবার। ‘অনেক ধন্যবাদ তোমাদের।...বলো তো, আমাকে কেমন দেখাছে? ক্যামেরার সামনে যেতে পারব?’

‘ঠিকই আছে সব,’ রবিন বলল। ‘পারবে।’

‘যা ঘটল সেটা সবার সামনে আম্মাকে বলা যাবে না। যাই। তোমাদের সঙ্গে পরে দেখা করব।’

কমিকের বই হাতে এলিভেটরের দিকে এগোল মিরিনা।

ডিক্সনের দিকে নজর দিল আবার কিশোর। অনেক কথ বের করতে হবে পেট থেকে।

‘এভাবে আমাদের দেখে নিচয় চমকে গেছেন,’ হেসে বলল রবিন।

‘চমকাব কেন?’ আরেক দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ডিক্সন। চুলগুলো আগের চেয়ে এলোমেলো, সত্যি সত্যিই এখন পাগল মনে হচ্ছে তাঁকে। মাথা নাড়তে লাগলেন। ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু মুসা কি আর ছাড়ে।

‘ও, চমকাননি,’ ব্যাঙ্গ করে বলল কিশোর। ‘তা চমকাবেন কেন? কাল রাতে তো আর আপনি আমাদের ঘরে ঢোকেননি। আমরা যখন পিছু নিয়ে এখানে নামলাম, তখন আমাদেরকে মারেনওনি।’

‘কি বলছ বুবুতে পারছি না।’

‘তা তো পারবেনই না,’ মুসা বলল। ‘পেরেছেন কেবল ভ্যানে করে পালাতে। হেডলাইট ভাঙা সবুজ গাড়িটাতে চড়ে। চমৎকার একটা নাম দিয়েছি আমরা ওটার, জানেন। সাইক্লপস।’

‘আমি...মানে...আমি...’

‘মানে মানে না করে ছেড়ে ফেলুন না,’ কিশোর বলল। ‘নাকি আমরাই বলে দেব কি কি অকাজ করেছেন। চুরি, খুনের চেষ্টা, অপহরণের চেষ্টা...’

‘অভিযোগগুলো সব সত্য নয়!’ গলা কাঁপছে ডিকসনের। ‘শুনলাম, স্টারগার্লের পোশাক পরা মেয়েটা কমিকগুলো খুঁজে পেয়েছে। ভাবলাম, সবই বুঝি পেয়েছে। তারপর শুনলাম, না, শুধু তোমাদেরগুলো পেয়েছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল আমার কাছে।’

রাগত ভঙ্গিতে চোখ মিটামিট করছেন তিনি। ‘কমিকগুলো চুরি যাওয়ার আগে আমার স্টলের সামনে তাকে দেখেছি। তারপর হঠাতে করেই কয়েকটা কমিক পেয়ে গেল সে। ধরেই নিলাম, সবগুলোই আছে তার কাছে। অল্প কয়েকটা বের করেছে। কাজেই তাকে একা ধরার জন্যে ওত পাতলাম। কোথায় কমিকগুলো লুকিয়েছে বের করার জন্যে। টাকা খাইয়ে কয়েক মিনিটের জন্যে আর্দালিটার কাছ থেকে এলিভেটরটা চেয়ে নিয়েছি। বের করে দিয়েছি তাকে।’

একটা মৃহূর্তের জন্যে কিশোরের মনে হলো, মিরিনাকে একা ছেড়ে দিয়ে ভুল করল না তো? কমিকগুলো নিয়ে পালাল? হয়তো শ্রিরিনাই আসল চোর। পরক্ষণেই দূর করে দিল সন্দেহটা। কমিকগুলো দেখার পর মিরিনার চমকে যাওয়াটা অভিনয় হতেই পারে না। বলল, ‘ভুল মানুষকে ধরেছিলেন আপনি, মিস্টার ডিকসন। কমিকগুলো পাওয়ার সময় আমি ছিলাম মিরিনার সামনে। কে জানি তার ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল?’

উদ্ভাস্ত দৃষ্টি ফুটল ম্যাডের চোখে। পাগলই হয়ে যাচ্ছেন যেন। অনুনয়ের সুরে কিশোরকে বললেন, ‘চুরি করে কমিকগুলো নিয়ে গিয়ে মাথা খারাপ করে দিল আমার লোকটা। তোমরাও সুবিধে করতে পারলে না। বের করতে পারলে না ওগুলো। তখন আমিই খুঁজতে শুরু করলাম। কাল রাতে তোমাদের ঘরে সেজন্যেই ঢুকেছিলাম।’

‘কিন্তু আমাদের ঘরে কেন ঢুকলেন?’ মুসার প্রশ্ন।

‘তোমরা যে আছ ওখানে, তা-ই জানতাম না। শুধু জানি, ওটা দিয়ে তিনশো চোদ নয়ের ঢেকা যায়, তাই ঢুকেছিলাম...’

‘লুই মরগানের ঘরে ঢোকার জন্যে?’ ভুরু তুলল রবিন।

‘লুই মরগান!’ নিজের কপালে চাপড় মারল কিশোর। ‘আজ সকালে ভিডিও টেপের বাঞ্ছ নিয়ে বেরোতে দেখলাম একটা লোককে, তাঁর ঘর থেকে। তখনই মনে পড়া উচিত ছিল আমার, কোথায় দেখেছি লোকটাকে। সুমাতো কমিকের স্টলে গরম গরম কাটুনের ভিডিও ক্যাসেট বিক্রি করছিল।’

ডিকসনের দিকে তাকাল সে। কিছুটা শাস্তি হয়ে এসেছেন ম্যাড, যেন বুঝতে পেরেছেন জ্যান্ট পোড়ানো হবে না আর তাঁকে, রেহাই পেয়ে গেছেন।

‘মরগানের সঙ্গে সুমাতো কমিকের সম্পর্ক কি, বলুন তো?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘জায়গাটার মালিক সে,’ জবাব দিলেন ডিকসন। ‘কেন, ভূমি জানো না? এজন্যেই তো কনভেনশনটা করতে পেরেছে এখানে। বহুদিন ধরে কমিকের ব্যবসা করে আসছে লোকটা।’

‘কমিকের ব্যবসা,’ আমরনে বিড়বিড় করল কিশোর। কয়েকটা ছিল সুতো  
ছেঁড়া দেয়ার চেষ্টা চালাল মনে মনে। একটা ব্যাপারে নিচিত হয়ে গেছে, ম্যাড  
ডিক্সন চুরিটু করেননি।

ফোস করে নিঃখাস ফেলল কিশোর। একজন সন্দেহভাজন কমল। তবে  
রহস্য যেখানে ছিল, মোটামুটি সেখানেই রয়ে গেছে। সমাধান হয়নি।

আরেকটা প্রশ্ন করা দরকার ডিক্সনকে। ফ্যান ফানের একটা কপি চুরি  
যাওয়ার পর আরেকটা যেটা এনে রাখা হল তার জ্যায়গায়, সেটাতে প্রাইস ট্যাগ  
দেখলাম দু’শো পঞ্চাশ ডলার। অথচ যেটা চুরি গেছে সেটা যখন কিনতে এলেন  
নীল বোরাম, দাম চাইলেন ছ’শো ডলার, এবং তাতেই তিনি কিনতে রাজি হয়ে  
গেলেন। কেন? ওটার এত বেশি দাম হওয়ার কারণ কি?’

কালো ছায়া নামল ম্যাড ডিক্সনের মুখে। ‘ওটাতে আইজাক হফারের সই  
ছিল। আসল আইজাক হফার। সংগ্রাহকের জিনিস। কারও পছন্দ হলে যত দাম  
হাঁকতাম, তত দিয়েই কিনে নিত।’

## তেরো

‘অটোগ্রাফ দেয়া?’ কিশোর বলল, ‘আমি কমিক সংগ্রহ করি না, তার পরেও আমি  
জানি আইজাক হফার কোন ক্রিমসন ফ্যান্টম বইতে সই করেনি। এডগার ডুফার  
আমাকে সমন্ত গল্প বলেছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, হফার সই করেনি।’

‘তুমি ঠিকই বলেছ,’ ডিক্সন বললেন। গোফের নিচে দেখা দিল এক চিলতে  
হাসি। ‘তবে সে যাতে সই করেছে, তাতে ছিল ফ্যান ফান আর ঘে ফ্যান্টম।  
ক্রিমসন ফ্যান্টমের অনেক আগে আকা হয়েছিল ওই কমিক। আমার মনে হয়,  
বোরামের সঙ্গে গঙ্গোলের আগে ওই অটোগ্রাফ দিয়েছিল হফার।’ হঠাতে করেই  
মিলিয়ে গেল হাসিটা। ‘চুরি করে নিয়ে গেল শয়তান চোরটা।’

চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। ‘হফারকে ওটা  
দেখানোর সুযোগই আপনি পাননি, তাই না?’

মাথা নাড়ল ডিক্সন। ‘বইটা চুরি হওয়ার আগে দেখাই হয়নি ওর সঙ্গে  
আমার। আর যখন হলো, তখনও তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম না। বরং  
জড়িয়ে গেলাম ডুফারের সঙ্গে।’

কেশে গলা পরিষ্কার করলেন ডিক্সন। তিনি গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে  
জিঞ্জেস করলেন, ‘তো, আমাকে নিয়ে কি করবে?’

‘কাল রাতের কথা জিঞ্জেস করছেন তো?’ কিশোর বলল, ‘ওই যে, যে সব  
ছোটখাট শয়তানিগুলো করলেনঃ জোর করে লোকের ঘরে ঢোকা, মারধর করা,  
গাড়ি চাপা দেয়ার চেষ্টা, এসব?’

‘হ্যাঁ,’ ঘামতে শুরু করেছেন ডিক্সন। ‘ওগুলোর কথাই বলছি।’

শ্রাগ করল কিশোর। ‘আমরা অভিযোগ করব না। আপনি হেডলাইটটা ঠিক  
করে নিন। থানায় গিয়ে বড়জোর একটা এন্ট্রি করিয়ে নিতে পারেন, বাড়ি লেগে  
ওটা ভেঙ্গেছে।’

বন্তির নিঃধাস ফেললেন ডিকসন।

কিন্তু রবিন আবার চিন্তায় ফেলে দিল তাঁকে। বলল, 'তবে মিরিনা যদি পুলিশকে রিপোর্ট করে, বিপদে পড়বেন। আমাদের না জানিয়ে হয়তো যাবে না। কিন্তু যদি যায়, কি বলবেন পুলিশকে, তবে ঠিক করে রাখবেন।'

কিশোর আশা করল, পুলিশের কাছে না যাওয়ার জন্যে বোঝাতে পারবে মিরিনাকে। তবে সেকথা বলল না ডিকসনকে।

কুকনো হাসি হাসলেন কমিক বিক্রেতা। 'দেখা যাক, কি হয়। আমি টেলে যাচ্ছি। প্রয়োজন পড়লে ওখানে দেখা কোরো আমার সঙ্গে। পারলে মিরিনাকেও নিয়ে এসো। সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলে মাপটাপ চেয়ে নেব, যাতে পুলিশের কাছে না যায়।'

'স্টেই করবেন,' মুসা বলল। এলিভেটরের বোতাম টিপে দিয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'এরপর কি করছি আমরা?'

'চলো, হফারকে খুঁজি। অটোগ্রাফের ব্যাপারটা আলোচনা করা দরকার।'

লবিতে উঠে এল ওরা। মেইন কনফারেন্স রুমের দিকে চলল। প্রবেশ পথের কাছে, টেবিলের সামনে কমিক ক্রেতাদের ছেট একটা লাইন। ওদের হাতে সিল মেরে দিচ্ছে দুই রঙ চুলওয়ালা মেয়েটা।

দ্রুত টেলের দিকে চলে গেলেন ডিকসন। তিনি গোয়েন্দা গেট পেরোতে যেতেই ওদেরকে আটকাল বিশালদেহী সেই দারোয়ান। 'সরি। হবে না।'

হাতের ছাপ দেখাল কিশোর।

'এটা তো কালকের,' দারোয়ান বলল। 'মুছে গেছে। যাই হোক, চেষ্টাটা ভালই করেছিলে। পারলে না আরকি। আমাকে ফাঁকি দেয়া অত সোজা না।'

মানি ব্যাগের জন্যে পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর। 'দেখুন, টিকেটের পয়সা মারার কোন ইচ্ছেই আমাদের নেই। জানতাম না। আমরা মনে করেছিলাম, একদিন টিকেট করে নিলেই হবে।'

কয়েক মিনিট পরে, হাতের উল্টোপিঠে 'ইন্টারকমিকন-২' ছাপ মেরে কনভেনশন রুমের ডেতরে চুকল তিন গোয়েন্দা। ভিড়ের ডেতর দিয়ে পথ কঢ়ে এগোল।

'কোথায় পাওয়া যাবে হফারকে?' মুসার প্রশ্ন।

'টেবিলের কাছে গিয়ে দেখি,' কিশোর বলল। 'ওখানে না পেলে দোকানদারদের জিজ্ঞেস করব। কেউ হয়তো বলতে পারবে।'

হফারের সৌট খালি।

অনেককেই জিজ্ঞেস করা হলো—দোকানদার, হফারের ভক্ত, কিন্তু কেউ বলতে পারল না লোকটা কোথায় আছে। এমনকি অন্যান্য আর্টিস্টেরা ও জানে না ও কোথায় আছে। পেঙ্গিল দিয়ে ওয়াকি উডেটের ছবি আঁকছেন একজন বৃদ্ধ আর্টিস্ট। প্রশ্ন শুনে বললেন, 'একটু আগে তো ছিল। কোথায় যে গেল...কিছুই কলে যায়নি।'

'এবার?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এসব ক্ষেত্রে,' মাথা চুলকে জবাব দিল কিশোর, 'হোটেলের রিসিপশনিস্টকে'

জিজ্ঞেস করলে ফল পাওয়া যায়।'

'না,' মাথা নেড়ে বলল রিসিপশন ক্লার্ক, 'এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। জরুরি একটা শীটিং রয়েছেন।'

'কখন দেখা করা যাবে,' জানতে চাইল কিশোর। 'বলেছেন কিছু?'

'হয়তো আজ বিকেলে কোন এক সময়,' জানাল রিসিপশনিস্ট।

'তার জন্যে কি একটা মেসেজ রেখে যেতে পারব?' রিসিপশনিস্ট সম্ভতি জানালে তার কাছ থেকেই কাগজ আর কলম নিয়ে নোট লিখে; ভাঁজ করে, সেটা দিয়ে বলল, 'মুখে বলবেন, আমরা তার সঙ্গে ম্যাড ডিক্সনের টলে দেখা করব।'

'ইঁ,' মাথা দুলিয়ে মুসা বলল, 'এখন আমরা জানি, বিকেলটা কোথায় কাটাতে হবে।'

আবার কনভেনশন হলে ফিরে চলল ওরা। ওদেরকে দেখে অস্তি ফুটল ডিক্সনের চোখে: 'মেয়েটা এল না?'

'কঢ়ে বলিনি এখনও।' কোথায় গিয়েছিল, জানাল কিশোর। ডিক্সনকে সাজ্জনা দিয়ে বলল; 'ভাববেন না, ব্যবহৃত একটা হবেই।'

এই সময় একটা ছেলেকে আসতে দেখা গেল। বিরাট একটা বাঙ্গ হাতে, কিশোর যে বাঙ্গটা এনেছিল, তার চেয়ে অন্তত তিন গুণ বড়। ভারের চোটে বাঁকা হয়ে গেছে ছেলেটা, হাঁটতে পারছে না ঠিকমত। ওদেরকে বললেন ডিক্সন, 'আমার ব্যবসা আসছে মনে হয়।'

টেবিলের সামনে এসে বাঙ্গটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল ছেলেটা। চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল ডিক্সনের দিকে। টেবিলে হেলান দিয়ে মৃদু হাঁপাতে লাগল ছেলেটা। স্লাইম ম্যান নম্বর ওয়ান আছে? দ্য আউরেজিয়াস ওজনের নম্বর ওয়ান এবং নম্বর টু পেয়ে গেছি। স্লাইম ম্যানটা দরকার।'

মাথা ঝাঁকালেন ডিক্সন, 'আছে।'

পেছনের র্যাক থেকে স্লাইম ম্যানের একটা কপি নামাতে গেলেন তিনি। ছেলেটা বাঙ্গটা তুলে ধপাস করে ফেলল টেবিলের ওপর।

\* কমিকগাঁও ছেলেটার হাতে দিতে গিয়েই চিন্কার করে উঠলেন ডিক্সন, 'ধর, ধর!' তবে কিছু করার আগেই পড়ে গেল কোলপসিবল টেবিলটা।

'দূর, কাঙ্গাটা কি করলাম! দাঁড়ান, আমি ঠিক করে দিচ্ছি,' বলে হাঁটু গেড়ে বসে বই তুলতে শুরু করল ছেলেটা।

ডিক্সন আর তার সহকারী মিলে আবার টেবিলটা খাড়া করতে লাগলেন।

জমাতে জমাতে এক জায়গায় কমিকের স্তুপ করে ফেলল ছেলেটা। তারপর নিজের বাঙ্গটা ঠেলে সরাতে গেল।

পা দিয়ে আটকালেন ডিক্সন। 'এক মিনিট।' বলেই বাঙ্গের ডালা ফাঁক করে ডেতের থেকে বের করে আনলেন একটা স্লাইম ম্যানের কপি। 'এটা আমার। ওখানে গেল কি করে?' ছেলেটা মুখের কাছে বইটা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'এবার ছেড়ে দিলাম, যাও। আর যদি এদিকে দেখি ঠ্যাঙ্গ ভেঙে দেব।'

বিরাট বোঝাটা তুলে নিয়ে দ্রুত সরে পড়ল ছেলেটা, বোঝার তুলনায় খুব তাড়াতাড়ি গেল।

সেদিকে তাকিয়ে আনমনে বিড়বিড় করে বললেন ডিকসন, 'ভাল করে দেখা উচিত ছিল। আমার আরও বই নিয়ে গেছে কি-না কে জানে! এই জন্মেই, বুঝলে, তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দামি জিসিনগুলো পেছনে সরিয়ে রাখি, হাতের কাছ থেকে দূরে। চোরের অভাব নেই।' তিঙ্ক হাসি হাসলেন। 'একটা চোরকেও কিছু না বলে ছেড়ে দিলাম। অথচ আমাকেই চোর ভাবে ডুফার, গলাকাটা ডাকাত ভাবে!'

এডগার ডুফারের নাম শনে বাট করে একটা কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের। লোকটার ওপর থেকে সন্দেহ দূর হয়ে গেল তার। টেবিলটা পড়ে যাওয়া থেকেই বুঝেছে। লাল আলখেন্দ্রার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে আসতে পারলেও বিশাল বপু নিয়ে ওই টেবিল ডিঙিয়ে যেতে পারবে না সে কোনমতেই। তাহলে অবশ্যই ধসে পড়ত টেবিলটা। তাহলে কে কাজটা করুণ? মিসেস জরডান?

'অ্যাই যে, তোমরা এখানে।'

ফিরে তাকাল কিশোর। হাতে একগাদা কমিক বুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিরিনা। বলল, 'এখানেই পাব জানতাম। ভাবলাম, ফেরত দিয়েই যাই।'

'থ্যাংকস।' মিরিনার হাত থেকে কমিকগুলো নিল কিশোর। 'সাক্ষাৎকার কেমন হলো?'

ভাল। আশ্চর্য বলল, এতদিনে নাকি আমি কিছু শিখতে পেরেছি। সাংবাদিকদেরকে অপেক্ষা করিয়ে রেখে ভাল করেছি। এরকমই নাকি করতে হয়, তাতে দাম বাড়ে। আমার দেরি হওয়ার আসল কারণটা যদি জানত...'. ডিকসনের ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল সে।

কমিক গোছাচ্ছেন ডিকসন। হাত কাঁপছে। তাকাতে পারছেন না মিরিনার দিকে। হঠাৎ কেন কথা ধারিয়ে দিয়েছে বুঝতে অসুবিধে হয়নি। বললেন, 'মিরিনা, আমি দুঃখিত, সত্যিই দুঃখিত! বড় অন্যায় করে ফেলেছি!'

নরম হয়ে গেল মিরিনা। 'না না, আমি কিছু মনে করছি না! ভুল হয়েই যায় মানুষের।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'কিশোর, তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া হয়নি তখন। সাংঘাতিক ছেলে তুমি, বাকবাক!' বলে ওর হাত চাপড়ে দিল সে।

লাল হয়ে গেল কিশোর। এরকম খোলাখুলি প্রশংসায় লজ্জা পায় সে, তার ওপর করেছে একটা মেয়ে। ঢেক গিলে বলল, 'ও কিছু না...আমি...আমরা...' চুপ হয়ে গেল সে। দেখল, ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে রবিন আর মুসা। মেয়েদের ব্যাপারে কিশোরের অস্বস্তির কথাটা জানা আছে ওদের।

ওকে আরও অস্বস্তিতে ফেলে দিল মিরিনা। বলল, 'ফাইট করতে পারো বটে তুমি!' কিশোরের হাত ধরে বলল, 'এসো না, আজ একসঙ্গেই লাঞ্ছ খাই?' কিশোরের নীরবতাকে সম্মতি ধরে নিয়ে বলল সে, 'তাহলে ওই কথাই রইল। হোটেলের সাইড গেটের কাছে বাগানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি। বিশ মিনিটের মধ্যে।'

চলে গেল মিরিনা।

দুই বছুর দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকে কিশোর বলল, 'কি করা যায়, বলো তো? ও আমাকে একা যেতে বলল!'

'কি আবার,' রবিন বলল। 'যাবে। কথা বলার এটাই তো সুযোগ। দেখো না, কিছু বের করতে পারো কি-না।'

'ঠিক,' মুসাও একমত। 'লাল আলখেল্লার সঙে কোন যোগাযোগ থেকে থাকলে...'

'বেশ,...' নিউবিড় করে আরও কিছু বলল কিশোর, বুঝতে পারল না অন্য দু'জন। রওনা হলো নিজেদের ঘরের দিকে, কমিকগুলো রেখে আসার জন্যে।

পোশাক বদলে এল মিরিনা। পরনে শর্ট, গায়ে টি-শার্ট, মাথায় উইগ নেই, বেরিয়ে আছে খাট বাদামি চুল। স্বাভাবিক লাগছে তাকে এই পোশাকে, আরও বেশি সুন্দর।

'বাহ, দারুণ লাগছে তোমাকে,' প্রশংসা করল কিশোর। 'এটাই কি তোমার আসল রূপ?'

হাসল মিরিনা। 'কেন, আরও কিছু আছে ভাবছ নাকি?' কিশোরের হাতের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে সাইডওয়াকের দিকে টেনে নিয়ে চলল সে। 'পোশাক তো না, পাগলামি! আহ, বাঁচলাম!'

পাশাপাশি হাটছে দু'জনে।

আবার বলল মিরিনা, 'কাছেই একটা রেস্টুরেন্ট আছে। বারগার আর সালাদ খুব ভাল করে। ওখানে গিয়ে আরামে বসতে পারব আমরা, স্টেলার স্টারগার্লের ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাবে না।'

পচুর আলোবাতাস রয়েছে রেস্টুরেন্টটার ভেতরে। চারদিকে প্রচুর কাচ, ভেতরে অসংখ্য টবে গাছ। ভিড় কম। খাবারের অর্ডার দিল মিরিনা।

খাওয়ার ফাঁকে একসময় তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে পড়ল। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা সত্যিই গোয়েন্দা? অপরাধী খুঁজে বেড়াও?'

কিশোর বলল, 'বহু বছর ধরে একাজ করছি।'

'আর এর প্রতিষ্ঠাতা হলে গিয়ে তুমি। অন্য দু'জন তোমার সহকারী।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কাঁটা চামচের মাথায় গেঁথে তোলা মাংসের টুকরোটা খসে পড়ে গেল পিরিচে। আবার গেঁথে নিয়ে মুখে পুরে চিবাতে লাগল।

'দারুণ একটা চিম তোমাদের,' মিরিনা বলল। 'অনেক খোঁজখবর নিয়েছি তোমাদের ব্যাপারে। তুমি হলে দলটার মাথা। তোমার নিশ্চো বস্তুটির গায়ে জোর বেশি, তাই তাকে দেয়া হয় সাধারণত বিপজ্জনক কাজের ভার। আর আমেরিকান বস্তুটি বইয়ের পোকা, তাই বই ঘেঁটে তথ্য জোগাড় আর গবেষণার ভার পড়ে তার ওপর। ঠিক বলেছি না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যা, খোঁজখবর সত্যিই নিয়েছি!'

তারপর কিছুক্ষণ প্রশ্ন করে গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে নানা কথা। জেনে নিল মিরিনা। অবশ্যে কাজের কথায় এল কিশোর, 'ওই অস্তুত পোশ' ক কেন পরো তুমি?'

'কঠিন প্রশ্ন করলে।' চিবিয়ে মুখের খাবারটুকু গিলে নিল মিরিনা। এক ঢোক পানি খেলো। তারপর বলল, 'কামক খুব পছন্দ আমার। কিন্তু আশা একদম দেখতে পারে না। হাতে দেখলেই বকাবকি করে। শেষে একদিন চোখ পড়ল

টেলারা স্টারগার্লের ওপর। আমাকে দিয়ে মডেলিং করানর ভাবনাটা তখনই এল  
মাথায়।

‘তে মার কেমন লাগে মডেল হতে?’

‘ভাল না। আমার ইচ্ছে কমিক আর্টিস্ট হওয়া।’

হাসল, কিশোর। স্লাইম ম্যানের ছবি আঁকবে?’

‘আঁকলে ক্ষতি কি? তবে টেলারা স্টারগার্লকেই আমার বেশি পছন্দ।’

আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পেল না কিশোর। খাওয়া শেষ করে উঠল।

হোটেলের পাশের গেট দিয়ে আবার বাগানে চুকল দুঁজনে।

কিশোর বলল, ‘ভাল খাবার খাইয়েছ। ধন্যবাদ।’

‘আবার দেখা হবে,’ হাত বাড়িয়ে দিল মিরিনা। ‘কাল পর্যন্ত থাকছ তো?’

মিরিনার হাতটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। কি যেন ভাবছে। তারপর  
ধীরে ধীরে হাত বাড়াল। বলল, ‘কতদিন থাকব বলতে পারছি না। তবে এ কেসের  
সমাধান না হওয়াতক আছি, এটা বলতে পারি।’ চোখ আটকে গেল মিরিনার  
হাতের দিকে। ‘আরি!’

‘কী?’ হাতটা টেনে নেয়ার চেষ্টা করল মিরিনা। কিন্তু কিশোর ছাড়ল না।  
তাকিয়ে রয়েছে হাতের উল্টো পিঠের সিলটার দিকে।

‘কিশোর, কি হলো?’

বিড়বিড় করছে কিশোর, ‘আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল! অনেক আগে!’

‘ডাকাতির কথা বলছ?’

আরেক হাতে মিরিনার হাতটা চাপড়ে দিয়ে কিশোর বলল, ‘বলছি, ক্রিমসন  
ফ্যান্টমের কথা। স্বোক বস্তুগুলো ফেলার সময় লোকটার দুটো হাতই আমি  
দেখেছি।’

‘তাতে কি?’

‘তাতে? অনেক কিছু। প্রথমেই বলা যায়, লোকটার কোন হাতেই সিল ছিল  
না।’

## চোদ্দ

মিরিনার হাত ধরে টানতে টানতে দরজার দিকে ছুটল কিশোর। ‘বিন আর  
মুসাকে একথা জানানো দরকার।’

‘আহ, ছাড় না!’ হ্যাচকা টান দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল মিরিনা। ‘এই  
পোশাকে কন্ডেনশন ফ্রারে মেতে পারব না আমি। কেউ আমাকে চিনে ফেলতে  
পারে। আর তাহলে আমা আমার...’

‘ছাল ছাড়াবে,’ কথাটা শেষ করে দিল কিশোর।

‘হাতে সিল না ধাকাটা এমন কি জরুরি?’

‘অনেক জরুরি। এতে প্রমাণ হয়, কাজটা করেছে ডেতরের কোন লোক।  
তুমি, আমি, দোকানদার, যে-ই চুকি না কেন, প্রবেশ মূল্য দিতে হয়, হাতে সিল  
মেরে নিতে হয়। নইলে দরজায় আটকে দেয় দারোয়ান। কিন্তু যে লোকটা বোমা

ফেলন তার হাতে সিল না থাকলেও চুকতে পারল। কি করে? কেন তাকে আটকাল না দারোয়ান? একটাই কারণ ও এখানকার লোক।

‘ই, বুঝলাম,’ বিধা করছে মিরিনাথ। লবিতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে এলিভেটর ব্যাংকের দিকে। ‘মের, এই কেসে তোমাদের আমি সাহায্য করতে চাই, যদি সহজ হয়। এখন তো আর আমাকে এড়াতে পারবে না, জড়িত হয়ে গেছি। ওপরে গিয়ে শোশাঙ্ক বাসলে আসি। ম্যাজ ডিকসনের দোকানের সামলে থেক, দেখা হবে।’

‘তোমার সাথে আসব?’

হাসল মিরিনা। ‘দরকার নেই। এখন আর এলিভেটরে কিছু হবে বলে মনে হয় না। একাই যেতে পারব।’

মেইন কনফারেন্স রুমের দিকে রওনা হলো কিশোর। কয়েকবার দেখা হয়েছে, ইতিমধ্যে তাকে চিনে ফেলেছে দারোয়ান, তার পরেও হাতের সিল না দেখে ছাড়ল না। ডিডের ভেতর দিয়ে সোজা ডিকসনের টেলের দিকে এগোল সে। ওটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে রবিন আর মুসা।

ওকে দেখেই বলে উঠল মুসা, ‘করেক যুগ তো লাগল আসতে। টেলারা টারগার্ল তোমাকে আরেক গ্যালাক্সি নিয়ে গিয়েছিল নাকি?’

রবিন রসিকতা করল না। কিশোরের চেহারা দেখেই অনুমান করে ফেলেছে কিছু হয়েছে। ‘কি ব্যাপার?’ ভুরু কোঁচকাল সে। ‘ওখানেও রহস্য পেলে?’

‘একটা সূত্র পেলাম,’ কিশোর বলল। ‘শুনলে তোমাদেরও চোখ কপালে উঠবে। আইজাক লফারের দেখা পেলে?’

‘আমাকে কি দরকার?’ পেছন থেকে বলে উঠল হফার। ‘সময় মত এসে গেছি, তাই না?’ হাসল সে। ‘এইমাত্র এলাম। একটা উৎসবের আয়োজন করব ভাবছি।’ জ্যাকেটের পকেটে চাপড় দিয়ে বলল, ‘একটা কন্ট্রাক্ট আছে এখানে। নতুন একটা কমিকের জন্যে চুক্তি করে এলাম।’

‘কে ছাপছে?’ সব কথাই কানে গেছে ডিকসনের।

‘হ্যারিস ডিমলার। এ শহরেই আছেন। কনভেনশনে যোগ দিতে এসেছেন। দেখা হয়ে গেল। আমাকে নিয়ে গেলেন ঘরে। আলাপ-আলোচনা করে পছন্দ হলো, কাজ করতে রাজি হয়ে গেলাম। মীটিং থেকে চলে গিয়েছিলাম সে জন্যেই।’

‘কাল ডাকাতির সময় কি সেখানেই ছিলেন?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল হফার। ‘হ্যাঁ। ওখান থেকে এসে কনভেনশন ক্ষেত্রে চুক্তি দেখি ধোয়া।’

‘আপনার নতুন চুক্তির কথা কেউ জানে?’

‘কেউ না। বকবক করে সবাইকে জানিয়ে দিয়ে মেজর মেহ্যামের বারোটা বাজাতে চাই না এখনই।’

‘মেজর মেহ্যাম?’ ডিকসনের গোফ কাঁপছে। ‘কি ধরনের হিরো হবে? মুষ্টিযোদ্ধা? ইনটেলিজেন্ট এজেন্ট? মারসেনারি? নাকি স্পেসম্যান?’

তাঁর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল হফার। ‘একটা কপি কিনে নিজেই পড়ে দেখবেন। আগে থেকেই বলতে যাব কেন?’ কিশোরের দিকে তাকাল সে। চুক্তির

কথা কেউ জানে কি-না, এ প্রশ্ন করলে কেন?’

কষ্টহীন ধাদে নামিয়ে কিশোর বলল, ‘আপনার কি ক্ষতি করেছে, জানি আশি। সে কথাই ভাবছি ছবিগুলো নষ্ট করল, হামলা চালাল... যে করেছে, সে জানেই মা, যে এখানে থাকার একটা জোরাল কারণ আছে আপনার।’

সামনে ঝুঁকল রবিন। ‘কিশোর, কেবলই জটিল করে তুলছ সব কিছু। দয়া করে একটু সহজ করো। এমন ভাবে বলছ, বেন কেউ ছফারকে তাড়াতে চাইছে এখান থেকে।’

‘ঠিক, তা-ই বলছি।’ ছফারের দিকে তাকাল কিশোর। ‘এই চুক্তি না হলে কি এখনও এখানে থাকতেন আপনি?’

‘না। এমনকি সেদিন বজ্র্তাও দিতাম না। আমি বুঝতে পেরেছি, ঘটনাটা কোনভাবে আঁচ করে ফেলেছে বোরাম, তাই তাকে আরেকটু ঝুঁচিয়ে দিতে চেয়েছি। কিন্তু তুমি বললে...’

‘কেউ জানে না আপনার চুক্তির কথা,’ কিশোর বলল। ‘তাহলে মিস্টার ডিমলারের ওপরও হামলা চলত। বিরক্ত করা হত তাঁকেও। আঘাতটা শুধু আপনার ওপরই হয়েছে, ছফার। আমার বিশ্বাস এর সঙ্গে ফ্যান ফান চুরির ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক আছে। থাকতেই হবে।’

ডিকসনের দিকে তাকাল কিশোর। ‘অটোগ্রাফের কথা জিজ্ঞেস করেছেন না কেন?’

‘অটোগ্রাফ?’ সতর্ক হয়ে উঠলেন ছফার। ‘কোন কিছুতে সই করতে বলবেন না তো...’

‘সই করে দিয়েছেন, এমন কিছুর কথাই বলব,’ ডিকসন বললেন।

‘যদি ছফার করে থাকেন আরকি,’ মাঝখান থেকে বলল কিশোর।

‘মানে?’ ছফারের চোখে সংশয়।

‘আমি দেখেছি, আপনি ক্রিমসন ফ্যান্টমে সই করেননি। পুড়িয়ে ফেলতেও দেখেছি। আপনার হিরোয়িক কমিক আমলের কোন কিছুতেই সই আপনি আর করতে চান না।’

‘ও, সবই দেখেছ তাহলে। কোন কিছুই চোখ এড়ায় না। খেপামি ভাবতেই পার। তবে কেন এই খেপামি করি কারণটা জানলে আর ওরকম ভাববে না। হিরোয়িক কমিক, বিশেষ করে নীল বোরাম আমার সর্বনাশ করে দিয়েছে।’

‘জানি আমরা,’ কিশোর বলল। ‘এডগার ড্রফার সবই বলেছে আমাদের।’

পক্ষেতে দুই হাত চুকিয়ে দিল আটিষ্ট। ‘তার মানে কোন কথাই আর গোপন থাকে না। যা-ই হোক, বুঝতেই পারছ কেন আর আমি ওদের প্রকাশিত কোন কিছুতে সই করি না। আমি সই দিয়ে ওদের ব্যবসা কেন বাঢ়াব?’

‘সব সময় তো ওদের ওপর খাঙ্গা ছিলেন না,’ ডিকসন বললেন। ‘সে সময় নিচর সই করতেন।’

হেসে উঠল ছফার। ‘সে সময় এত কাজ আমাকে দিত হিরোয়িক কমিক, করতে করতেই জানো বেরোত, সম্মেলনে যোগ দেয়ার আর সময় পেতাম না। সই করব কি?’

অবাক কাণ

‘তারও শাগে? ফ্যান ফানের আমলে?’

‘গো খাটমের কথা বলছেন?’ মাথা নাড়ল হফার, ‘না, তখনও দিইনি। একটা বিখ্যাত হইনি তখনও যে লোকে আমার অটোগ্রাফ চাইতে আসবে।’

‘যা-ই হোক, আপনি নিশ্চয় কথাটা ভুলে গেছেন। একআধটা সই করেই থাকতে পারেন। কাউকে উপহার দেয়া কোন কপিতেও মাকে দিতে পারেন, বোনকে দিতে পারেন, বন্ধুকে...কিংবা যেখানে কাজ করতেন সেখানকার কাউকে...’

‘মনে করতে পারছি না।’ ভুল কোঁচকাল হফার। ‘কেন? এটা নিয়ে এত প্রশ্ন কেন?’

‘আপনার সই দেয়া ফ্যান ফানের একটা কপি ছিল আমার কাছে,’ জোর দিয়ে বললেন ডিকসন।

‘থাকতেই পারে না,’ ঠিক একই রকম জোর দিয়ে বলল হফার। ‘আমি ফ্যান ফানের কোন কপিতে সই করিনি।’

‘দেখুন, আপনার নামটাই ছিল। স্পষ্ট পড়া যায়। যে পৃষ্ঠা থেকে গল্প শুরু হয়েছে...’

‘চোখের পাতা সরু হয়ে এল হফারের। ‘দেখলে বুঝতে পারতাম।’

‘তা আর পারবেন না। কপিটা চুরি হয়ে গেছে।’

ডিকসনের দিকে তাকাল হফার। ‘সইটা দেখতে কেমন, বলতে পারবেন? এখন আমার সই অনেক বদলে গেছে, তখনকার সঙ্গে মিলবে না। ইদানীংকার কোন সই থেকে জাল করতে গেলে ধরা পড়ে যাবে, অন্তত আমি দেখলে বুঝে ফেলব। আমি সই করিনি ওরকম কোন কপিতে, এটা বলতে পারি। মনে থাকতই...’

‘হয়তো মনে করতে চান না এটার কথা। আমি শিওর হচ্ছি, তার কারণ, যে লোকটা ওই কপি আমার কাছে বিক্রি করেছে, সে আপনার সই ভালমতই চেনে।’

‘কে লোকটা?’ জানতে চাইল মুসা।

‘নীল বোরাম।’

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে ডিকসনের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

‘ওই শয়তানটা! কেটে পড়ল হফার। তার কপিতে দেব আমি সই!’

‘দিতেই পারেন। একটা সময় তো বন্ধুত্ব ছিল আপনাদের। যখন একসঙ্গে কাজ করতেন,’ ডিকসন বললেন।

‘কোন কালেই ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল না।’ তিঙ্ক কষ্টে বলল হফার। ‘ওটা একটা ধাঢ়ি শয়তান, আর আমি ছিলাম অঙ্গুরয়েসী, তার তুলনায় কঢ়ি খোকা, যাকে ঠকানৰ সুযোগ পেয়েছিল সে। আমাকেই বৱং একটা অটোগ্রাফ দিয়েছিল একবার। হিরোঠিক কমিক ছাড়ার পর সেটা পুড়িয়ে ফেলেছি।’

‘তাহলে বইটা পেশেন কোথায় বোরাম?’ ডিকসন প্রশ্ন করল।

নীল-সোনালি রঞ্জের ঝিলিক তুলে এই সময় সেখানে একে হাজির হলো মিরিনা।

‘কিছু মিস করলাম না তো?’

‘না,’ কিশোর বলল, ‘সময়মতই এসেছ। আলাপটা সবে গরম হচ্ছে। নীল বোরামের কথা বলছি আমরা।’

‘ওই হারামজাদার মুখে একটা ঘুসি মারতে পারলে এখন খুশি হতাম আমি!’  
মুঠো তুলে ঝাঁকাল হফার।

‘পারলে মারুনগে, আমি আপনাকে আটকাব না,’ ডিকসন বললেন। ‘লোকটা আপনাকে যদি ঠকিয়েই থাকে, রাগ হবেই। হাজার হোক, আপনারটা ভাঙিয়ে তো আর কম থাচ্ছে না। একটা খবর নিচয় জানেন, পুরানো। জনপ্রিয় কমিকগুলো আবার ক্ল্যাসিক হিসেবে ছাপছে হিরোয়িক কমিক।’

‘তার মানে,’ মুসা বলল। ‘আমরা যেগুলো পড়তাম, সেগুলোই রিপ্রিং করছে?’

‘হ্যাঁ। ক্রিমসন ফ্যান্টম ক্ল্যাসিক খুব ঢ়া ঢামে বিক্রি হবে।’ ব্যাপারটা ডিকসনেরও পছন্দ নয়। ‘এতে আসল বইগুলোর দাম অনেক কমে যাবে। যেগুলো আগে প্রকাশিত হয়েছিল। আমার কাছে অনেক আছে, যেখানে যা পেয়েছি কিনে ফেলেছি। লস দিতে হবে আমাকে।’

‘বোরামের কাছে ফ্যান ফান বিক্রি করেননি কি এই রাগেই?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘হ্যাঁ,’ তিক্ত হাসি ফুটল ডিকসনের ঠোঁটে। ‘অনেক দিন ধরেই কেনার জন্যে আমার পেছনে লেগে ছিল সে। দিইনি।’

‘নীল বোরামের সঙ্গে কথা বলা দরকার,’ বলল কিশোর। ‘দেখি, তাঁর কি বলার আছে?’

হিরোয়িক কমিকের এলাকায় পৌছল ওরা। আরেকটা প্রেস কনফারেন্স দিতে তৈরি হচ্ছে কোম্পানি। মিরিনার দিকে তাকিয়ে হাসলেন বোরাম। পেছনে কাঁড়া আসছে, দেখেই হাসিটা মুছে গেল মুখ থেকে।

‘হফার!’ জোর করে পাতলা একটা হাসি দিলেন বোরাম। ‘অভিযোগ করতে এসেছ তো আমার নামে? গালাগাল করবে?’

‘না,’ জবাবটা দিল কিশোর। ‘কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আপনি বে বইটা কিনতে চেয়েছিলেন ডিকসনের দোকান থেকে, সেটার ব্যাপারে। মনে আছে নিচয়? ফ্যান ফানের কপি। সংগ্রাহকের জিনিস।’

‘কি বলছ বুঝতে পারছি না!’ টাকের চামড়া লাল হয়ে যাচ্ছে সম্পাদকের। চোখে অঙ্গস্তি। বার বার তাকাচ্ছেন ডিকসনের দিকে।

‘ফ্যান ফান নাথার ওয়ানের কপিটা, যেটা সেদিন কিনতে চেয়েছিলেন,’ মনে করিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল কিশোর। ‘মিস্টার ডিকসন বললেন, আপনিই নাকি তাঁর কাছে ওটা বিক্রি করেছিলেন।’

‘তাতে কি?’ সম্পাদকের গালে দুটো লাল রক্তবিন্দু জমল। ‘এটা কোন অভিযোগ নয়। কমিক আমি বিক্রি করেই থাকতে পারি। ওটাই আমার ব্যবসা।’ কিশোরের দিকে সরাসরি তাকালেন তিনি। ‘নাকি চোর ভাবছ আমাকেই?’

‘আরে না না, কি যেন বলেন,’ তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। ‘বোমা যখন ফ্লাটল, তখন আপনি ছিলেন দুফারের সঙ্গে, গোক্ত কুমৰের বাইরে। আমরা কেবল

জানতে এলাম, কপিটার জন্যে এত আগ্রহ কেন আপনার?’

‘শুনতে চাও? আরও বেশি দামের অফার পেয়েছিলাম আমি কপিটার জন্যে। শাভের এই সুযোগ ছাড়াব কেন? তাই কিনতে গিয়েছিলাম। অন্যায় হয়েছে?’

‘তা হয়নি। মিষ্টার ডিক্সন যা চাইলেন, তা দিয়েই আনলেন না কেন তাহলে?’ লাভ তো হতই।’

‘না, হত না। দাম বাড়াতে বাড়াতে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, বেচে লাভ হত না। তাই আর কিনিনি।’

‘কে কিনতে চেয়েছিল?’ জিজ্ঞেস করল মুসা।

ঠোটে জিভ বুলিয়ে ডিজিয়ে নিলেন ব্যোরাম।

চাইলেও এখন আর লোকটার কাছে কপিটা বিক্রি করতে পারছেন না, মিষ্টার বোরাম,’ রবিন বলল।

‘সে পাট ঘুচে গেছে। কাজেই এখন বলতে আর অসুবিধে কি?’

‘সুমাতো কমিক,’ ফাঁদে আটকা পড়েছেন যেন বোরাম, ভাবভঙ্গিতে সে রকমই লাগছে।

‘বইটা পেলেন কোথায়?’ হফার জানতে চাইল। ‘আমি তো দিইনি।’

হাল ছেড়ে দিলেন বোরাম। বুবালেন, মিথ্যে বলে মুবিধে হবে না আর। বললেন, ‘সুমাতোর কাছ থেকেই নিয়েছিলাম।’

কিশোর বলল, ‘মিষ্টার বোরামকে আর বিরক্ত করার দরকার নেই। চলো।’

সারি বেঁধে টেলটার কাছ থেকে সরে এল ওরা সবাই।

‘ভেরি, ভেরি ইন্টারেস্টিং,’ কিশোর বলল, ‘ঘরের ইঁদুরেই বেড়া কেটেছে। একটা কোম্পানি, যে কমিকটা বিক্রি করেছে, হঠাৎ করে তারাই আধার ফেরত চাইছে ওটা। অবশ্যে জোড়া লাগতে আরম্ভ করেছে এক এক করে। আর মাত্র কয়েকটা প্রশ্নের জবাব, তাহলেই আমাদের চোরটাকে ধরে ফেলতে পারব।’  
রহস্যময় কষ্টে বলল সে। ‘আমি এখন জানি, কোথায় খুঁজতে হবে তাঁকে।’

## পনেরো

‘দাঁড়াও,’ কিশোরের হাত ধরে ফেলল মিরিনা। ‘আসলে কোথায় যাচ্ছি আমরা?’

‘যেখান থেকে সমস্ত গোলমালের উৎপত্তি,’ জবাব দিল কিশোর। ‘সুমাতো কমিকসের খানিক দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল সে।

ভিড়ের জন্যে কাছে যাওয়ার উপায় নেই। গায়ে গায়ে লেগে যেন মানুষের প্রাচীর তৈরি হয়ে গেছে।

‘টোকা যাবে?’ ভিড়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।

‘যাবে,’ এদিকে তাকিয়ে বলে উঠল একটা ছেলে, লাল হয়ে গেছে চোখ, টেলাটেলি করার পরিশ্রমেই বোধহয়। ‘কাল ছিল ত্রিসিং, আজি নিজে কিনেছি, আজ হয়ে গেছে দশ। এখনি সবু বিক্রি শেষ হয়ে যাবে।’

‘তারপরেও দাম অনেক বেশি,’ নিচু গলায় বলল কিশোর। টেপের কথা

বলছে ছেলেটা। অন্যান্য জিনিসের দামও কমিয়ে দেয়া হয়েছে জানা গেল। কেন? অবাক লাগছে কিশোরের। হঠাৎ করে কেন এভাবে দাম কমাল?

কারণটা জানার জন্যে এগিয়ে গেল সে। ভিড় ঠেলে ঢোকার চেষ্টা করল। কয়েক মিনিট একটানা মানুষের শরীরের চাপ আর কনুইয়ের উত্তো খাবার পর বেরিয়ে আসতে পারল প্রাচীরের অন্যপাশে, কাউন্টারের কাছাকাছি। কমিক আর ভিডিও টেপ বিক্রি করে কুল পাছে না সেলসম্যানেরা। দাম কমে যাওয়ায় যেন পাগল হয়ে উঠেছে ক্রেতারা। কিনেই চলেছে। সোনালি, শজাফ্ফর কাঁটার মত চুলওয়ালা লোকটা জিঞ্জেস করল কিশোরকে, 'কি দেব?'

'ইমে... টেলারা স্টারগার্ল!' প্রথম যে নামটা মনে এল বলে দিল কিশোর।

তাল জিনিস চেয়েছে। অনেকগুলো আছে আমাদের কাছে, স্পেশাল, এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত। পাঁচ ডলার করে সবগুলোর দাম হয় পঁচিশ,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা। 'তবে তোমার জন্যে পনেরো। দশই বাদ, যাও।'

টাকা বের করে দেয়া ছাড়া উপায় নেই। দেয়ার সময় লোকটার হাতের দিকে তাকাল। না, এই লোক ক্রিমসন ফ্যান্টম নয়। আঙুলগুলো মোটা মোটা, খাটো, নখের মাথা কামড়ে কেটে ফেলেছে। হাতের উল্টো পিঠে স্পষ্ট ছাপ দেয়া।

টাকাটা নিয়ে আরেক জনের হাতে দিল সোনালি চুল, দাম রেখে বাকিটা ফেরত দেয়ার জন্যে। টাকা ওনছে দ্বিতীয় লোকটা, কিশোর তাকিয়ে রয়েছে তার হাতের দিকে। নাহ, ওর হাতেও ছাপ রয়েছে।

'এই যে, নাও, থ্যাংকস,' টাকাটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল দ্বিতীয় লোকটা। তারপর তাকাল সহকারীদের দিকে। একজনকে ডেকে বলল, 'ডেভ, স্পেশাল কিছু নিয়ে এসো তো।'

আরেক প্যাকেট টেলারা স্টারগার্ল কমিক বের করল ডেভ। 'এগুলো?' দামটা দেখতে পেল কিশোর। দশ ডলার লেখা রয়েছে।

'না, গাধা, এগুলো কি স্পেশাল হলো নাকি? না থাকলে দোকান থেকে নিয়ে এসোগে। আজকেই দরকার।'

আবার ভিড় ঠেলে ফিরে চলল কিশোর। চুক্তে যতটা কষ্ট হয়েছিল, বেরোতে তার চেয়ে কিছুটা কর্ম হলো। কি কিনে এনেছে সে, দেখেই হাসতে লাগল মিরিন।

গঠির হয়ে কিশোর বলল, 'পরে তোমার অটোগ্রাফ নিয়ে নেব এগুলোতে, যখন তুমি বিশ্বাত হয়ে যাবে স্টারগার্ল হিসেবে। এখন অন্য জায়গায় যেতে হবে।' 'অন্য জায়গায়?'

'এখানে সব ফালতু জিনিস বিক্রি করছে সুমাতোরা।' হাতের প্যাকেটটা দেখাল কিশোর, 'এসব জঞ্জাল। তবে দোকানে স্পেশাল কিছু রয়েছে। ভাবছি, ওগুলো এতই স্পেশাল কিনা, যা চুরি করে জোগাড়ের দরকার পড়ে?'

'দেখতে চাও তো? চলো, ভ্যান আছে আমার,' ম্যাজ ডিকসন বললেন। 'কিছুক্ষণের জন্যে সেলসম্যানদের ওপর দোকানের ভার দিয়ে যেতে পারব।'

'আমিও যাব,' মিরিনা বলল। সোনালি পোশাকের দিকে তাকাল। 'তবে এই-' 'কাপড়ে...''

'নাও,' নিজের গায়ের জ্যাকেটটা খুলে দিল হফার। 'এটা গায়ে চড়াও। অনেকখানিই ঢাকতে পারবে।'

আগুরগাউও গ্যারেজে নেমে এল ওরা। হফার, মিরিনা আর ডিকসন উঠলেন সবুজ ভানে। তিন গোয়েন্দা উঠল মুসার ইমপালায়।

'সত্যিই জানো তো দোকানটা কোথায়?' গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এলে জিজেস করল কিশোর।

'জানি,' মুসা বলল। 'ডিকসন কি বলল শুনলে না? ওয়েষ্টার্নের কাছে, হলিউডে। বলল তো দেখতে পাবই। আমিও একবার দেখেছিলাম মনে পড়ে। বের করে ফেলতে পারব।'

ঠিকই পারল সে। একবারেই। চার তলা একটা পুরানো বাড়ির গ্রাউণ্ড ফ্লোরে রয়েছে সুমাতো কমিকস। সামনের দিকটায় উজ্জ্বল রঙে দোকানটার বিজ্ঞাপন লেখা হয়েছে। আর এঁকেছে প্রচুর ছবি। হলুদ'পটভূমিতে ফুটে আছে কমিকের নানা রকম হিরোরা। জাপানী হিরোদের সঙ্গে আমেরিকান সুপারম্যানের লড়াইটা চমৎকার।

হেসে ফেলল রবিন। 'সুমাতো কমিকস যখন, এর চেয়ে ভাল আর কি দেখাতে পারত?'

দুটো গাড়িই পার্ক করে নেমে এল সবাই।

ডিকসন বললেন, 'কমিক জোগাড় যখন শুরু করেছিলাম, তখন প্রায় সারাটা দিনই এখানে কাটাতাম। সব চেয়ে কম দামে বিক্রি করত এরা।'

'আর সব চেয়ে কম ভাড়ায় দোকান পাওয়া যেত তখন,' পাশের মলিন ঘরগুলোর দিকে তাকাল হফার।

'ওই সময়,' কথার পিঠে আবার বললেন ডিকসন, 'বাড়িটার মাটির তলার দোকানগুলোতে সেকেওহাও পেগারব্যাক বই বিক্রি হত। এখন আর দোকান নেই, শুধাম করে ফেলা হয়েছে। আমরা যেটার খোঁজে এসেছি, সেটা ওখানে পাওয়ার স্বাভাবনাই বেশি। সিডিটা চিনি, কিন্তু নামতে গেলে ধরা পড়ে যেতে পারি।'

হাসল মিরিনা। হফারের জ্যাকেটটা খুলতে শুরু করল। 'আমার মনে হয়, ওদের নজর আরেক দিকে সরানৱ ব্যবস্থা আমি করতে পারব।'

কিভাবে কি করবে দ্রুত একটা ছক ঠিক করে ফেলল কিশোর। কাজ শুরু হলো সেই মত। পরের পাঁচটা মিনিট হফার, ডিকসন আর কিশোর ঘুরে বেড়াতে লাগল, সাধারণ ব্রিন্ডারের মত। পাঁচ মিনিট পর পিছু নিল মিরিনা। বাইরে রয়ে গেল মুসা আর রবিন, কোন গওগোল দেখা দিলে সেটা সামলানোর চেষ্টা করবে।

কনডেনশন হলের তুলনায় অর্ধেক বেচাকেনাও এখানে আশা করেনি কিশোর। তবে যা দেখল, সেটাও আশা করেনি। র্যাকে কমিক ঘাঁটাঘাঁটি করছে চারজন কাটোমার। উদাস, শূন্য দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দু'জন সেলসম্যান।

দেয়াল ষেষে প্রচুর বাক্স ছিল, দাগ দেখেই অনুমান করতে পারল কিশোর। মেঝেতে ধূলোর মাঝে মাঝে চারকোণ দাগ, ওসব জায়গায়ও বাক্স ছিল। র্যাকেও

বই তেমন নেই। ব্যবসা খারাপ হয়ে এলে কিংবা দোকান বিক্রি করে দেয়ার সময় যে অবস্থা হয় সে রকম লাগছে। তবে বেশি তাড়াছড়া যেন করেছে মালিক।

ঝুরে তাকিয়ে ডিকসনের ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। দোকানের পেছনের অংশে একটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। দোকান খালি হয়ে যাওয়ায় সুবিধেই হয়েছে ওদের। অনেক বাস্তু সরিয়ে নিয়ে গিয়ে খোলা হয়েছে, বই বের করে নিয়ে বাস্তুগুলো ওখানেই ফেলে রেখেছে। র্যাকের কমিক দেখার ভান করতে করতে ওখানে ঢলে এল কিশোর। হফারও এল।

ঝুলে গেল সামনের দরজা, ভেতরে চুকল মিরিনা। পোশাকের মতই মুখেও হাসি ঝলমল করছে। কনভেনশন হলে যেভাবে আকৃষ্ট করেছে মানুষকে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। সব কটা চোখ ঘুরে গেল তার দিকে।

‘এই-ই সুযোগ। মাটির নিচের ঘরে ঢোকার দরজাটা আন্তে করে খুলে ফেললেন ডিকসন। চুকে পড়ল তিনজনে। খুলো পড়া চল্লিশ ওয়াটের একটা বাস্তু জুলছে সিঁড়িতে, আলো-আধারি তৈরি করেছে।

নিচে নেমে সুইচবোর্ডটা খুঁজল কিশোর। পেল না। সিঁড়ির আলো আরছা ভাবে আসছে এখানে, তাতে ভাল করে জিনিসপত্র চোখে পড়ে না। তবে দেখার তেমন কিছু আছে বলেও মনে হলো না। কয়েকটা ছোট ছোট বাস্তু আর খুলে রাখা কোন মেশিনের কিছু যন্ত্রপাতি বাদে।

যন্ত্রাংশগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। এরকম জিনিস দেখেছে কোথাও আগেও। কোথায়? ধীরে ধীরে স্থিতিতে স্পষ্ট হলো। দেখেছে ওদেরই স্যালভিজ ইয়ার্টে। বঙ্গ হয়ে যাওয়া একটা ছাপাখানা থেকে কিনে এনেছিলেন রাশেদ পাশা। ‘কি মেশিনের জানেন?’ ফিসফিস করে বলল সে, ‘পুরানো অফসেট প্রিণ্টিং মেশিন। কিন্তু কি ছেপেছে ওরা এই মেশিন দিয়ে?’

সামনে পা বাড়াতেই পায়ে লাগল দলায়োচড়া করে ফেলে রাখা কাগজ। লাথি লেগে কাগজের বলটা ছুটে গেল হফারের দিকে। তুলে নিল সে। টেনেটুনে সমান করল কাগজটা। দেখে বলল, ‘এই ম্যাড, জানেন এটা কি?’

সাদা-কালোয় ছাপা হয়েছে কাগজটাতে।

ডিকসনও দেখে চিনতে পারলেন। ‘জানব না কেন? আগে খবরের কাগজে সাদা-কালোয় ছাপা হত কমিক। বইও ছাপত। এই পাতাটা নিচয় পঞ্চাশ বছরের পুরানো।’

‘আমার মনে হচ্ছে নতুন,’ পাতাটা দেখিয়ে বলল হফার। ‘পুরানো হলে হলুদ হয়ে যেত, কিনারগুলো হত ফাটা ফাটা। খোলার সময় মুড়মুড় করে ভেঙে যেত।’

‘খবন বুবাতে পারছি,’ কিশোর বলল, ‘স্পেশাল জিনিস বলতে কি বোঝাতে চেয়েছে।’

‘ভাল কথা,’ বলে উঠল একটা কষ্ট। ‘খবন বলো তো, তোমাদের নিয়ে কি করা যায়?’

সিঁড়ির দিকে তাকাল ওরা। আরছা আলোয় তিনটে মূর্তিকে দেখা গেল। নেমে আসতে লাগল একজম। তাকে চিনতে পারল কিশোর। কনভেনশন ফ্লোরের সেই বিশালদেহী দারোয়ান।

'মনে করেছিলাম,' লোকটা বলল, 'তোমার কালো বস্তুটা উড়াল দিয়ে পুলে নামার পর থেকেই সাবধান হয়ে যাবে। হলে না। ঘূরঘূর করতেই থাকলে, যাকে পেলে তাকেই প্রশ্ন করলে, আরও সহকারী জোগাড় করলে, শেষমেষ এখানেও এসে হাজির হলে। আশা করি, চেচামেচি করার কথা ভাবছ না। লাড হবে না। দোকানটা বক্ষ করে দিছি আমরা। দেয়ালগুলোও অনেক পুরু। বাইরে থেকে শোনা যাবে না।'

'নরিস,' বলল একজন সেলসম্যান, কঠে অস্তি, 'কি করব এদের?'

'হ্যা,' লোকটার সঙ্গে গলা মেলাল কিশোর, 'কি করা হবে আমাদের? নরিস, জানলেন কি করে আমরা এখানে আসছি?'

'ওই বোরাম ছাগলটা লাফাতে লাফাতে এল বসের কাছে, তোমরা নাকি নানা রকম কথা জিজেস করেছ, এটা বলার জন্যে। সে আন্দজ করে ফেলেছিল, তোমরা এখানে আসছ। হাসল নরিস। 'তারপর আর কি? আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিল তোমাদের তিন গাধাকে ধরার জন্যে।'

অঙ্ককারে ভালমত আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, ভাবল কিশোর। ডিকসন আর হফারকে মুসা আর রবিন বলে ভুল করছে ব্যাটা। 'ও, লুই মরগানের হয়ে অনেককেই ধরতে যান তাহলে আপনি,' বলতে বলতে তার দিকে এগোল সে। আলোয় বেরিয়ে এল। পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে নেড়ে ইশারা করল ডিকসন আর হফারকে, যাতে না এগোয়।

'এখন আমার মনে পড়ছে,' বলছে কিশোর, 'মুসা যখন ব্যালকনি থেকে পড়ে গিয়েছিল, তখন আপনি ছিলেন না গেটে পাহারায়। আপনার জায়গায় বসেছিল যে মেয়েটা হাতে সিল দেয় সে। ছুটি ছিল নাকি তখন আপনার? নাকি ছুটি দেয়া হয়েছিল আইজাক হফারের ঘরে ঢোকার জন্যে?'

ডয় পাচ্ছে কিশোর, তার কথা শুনে লোকটা মেজাজ না খারাপ করে বসে। সময় চাইছে সে। দেরি করিয়ে দিতে চাইছে। যাতে মুসা আর রবিন চলে আসার সময় পায়। ওপরে মিরিনারই বা কি হলো?

'ডিনারের সময়ও আপনি ছিলেন শুধানে,' কথা থামাল না কিশোর। 'বোরাম আর হফার যখন হাতাহাতি শুরু করলেন, তাদের ছাড়াতে গেলেন। কেন? পরে সুযোগ করে গিয়ে হফারকে শেষ করে দেয়ার জন্যে? নাকি বোরাম যে কাজটা করতে চেয়েছিলেন, সেটা করার জন্যে? বেচারা হফারকে দুরমুজ করার জন্যে?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল নরিস। 'এতক্ষণে বুঝলাম, তোমাদের নিয়ে কেন এত দুচিত্তায় পড়ে গিয়েছেন বস। মাথাটা বড় বেশি পরিষ্কার তোমাদের। অনেক কিছুই বুঝে ফেল।'

'তবে সব বুঝতে পারি না। আমি ভেবেছিলাম, আপনিই বুঝি ক্রিয়সন ফ্যান্টম সেজেছেন। পরে বুঝলাম, আপনি না। আপনার হাতের আঙ্গুল বেশি মোটা, প্রায় চাঁপাকলের মত।' সময় ফুরিয়ে আসছে, বুঝতে পারছে কিশোর। নরিস আর তার দুই সহকারী আর বেশিক্ষণ থাকবে না এখানে, কাজ সেরে সরে, পড়তে চাইবে।

'চাঁপাকলা, না?' রাগ প্রকাশ পেল নরিসের কঠে। 'চাঁপাকলার গাঁটা খাওনি

তো মাথায়, খেলে বুঝতে পারবে!

বাধা দেয়ার জন্যে তৈরি হলো কিশোর। ‘বেশি আঘারিষ্ঠাস দেখাচ্ছেন না? আমি একা নই। আপনারাও তিনজন, আমরাও তিনজন।’

আবার হাসল নরিস। বেরিয়ে পড়ল ভাঙা দাঁত, মান আলোতেও দেখতে পেল কিশোর। ‘তাতে কোন অসুবিধে নেই। তোমাদের তিনজনকে একাই কাবু করে ফেলতে পারিঃ’

কথা শেষ করল না সে। পেছন থেকে হাতটা সামনে নিয়ে এল। হাতে একটা বেসবল ব্যাট। ব্যাটের মোটা অংশটায় চাপড় দিল বাঁ হাতে।

তয় পাছে তার দুই সহকারী। ওরাও হাত সামনে আনল। দুজনের হাতেই একটা করে ব্যাট।

নরিসের ইঙ্গিতে এগিয়ে আসতে লাগল তারাও।

## শোলো

মুঠো শক্ত করল কিশোর। লড়াই না করে ‘কিছুতেই ধরা দেবে মা। হেরে গেলে যাবে, সে পরে দেখা যাবে। কোনমতে নরিসকে কাবু করে ফেলতে পারলেই হলো, বাকি দুজন আর এগোবে না। লেজ তুলে দৌড় দেবে, বোঝাই যায়। নিজের ইচ্ছেয় আসেনি ওরা, নিচয় জোর করে নিয়ে এসেছে নরিস।

তবে বিশালদেহী লোকটাকে কাবু করা অত সহজ নয়। গায়ে যে শুধু মোষের জোর তাই নয়, কি করে ব্যাট ব্যবহার করতে হয়, তা-ও জানে। ধরার কায়দা দেখেই অনুমান করা যায়। এক পা এক পা করে এগোছে, পেছনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে তার দুই সহকারী।

সমস্ত দুশ্চিন্তা আর তয় জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিল কিশোর। জুড়ো ঝাসে শেখানো হয়েছে এটা করতে। শক্তর ওপর কড়া নজর, প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে। ধীরে ধীরে ভারি দম নিতে লাগল।

কাছে আসতে নরিসদের আরও অর্ধেক পথ বাকি, এই সময় সিঁড়ির মাথায় আরও দুটো মূর্তি চোখে পড়ল কিশোরের।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিল সে, ‘মুসা, এই সামনের লোকটাই তোমাকে ঘুসি মেরেছিল! পুলে ফেলে দিয়েছিল!’

হেসে উঠল নরিস। ‘ওসব পুরানো কৌশল অনেক দেখা আছে আমার। আমি তাকচি না পেছনে।’

ওরা কথা বলছে, এই সুযোগে নিঃশব্দে নেমে চলে এল রবিন আর মুসা। ঝাপিয়ে পড়ল দুই সেলসম্যানের ওপর। একটা লোকের কানের সামান্য নিচে ঘাড়ের ওপর কারাতে কোপ মারল রবিন। টু শব্দ করতে পারল না লোকটা। হাত থেকে ব্যাট খসে পড়ল। জান হারিয়ে পড়ে গেল সে।

অন্য লোকটার ব্যাট ধরা হাতটা চেপে ধরে মুচড়ে পেছনে নিয়ে গুল মুসা। হ্যাচকা টান দিয়ে ব্যাট কেড়ে নিল বিশ্বিত লোকটার হাত থেকে। তারপর সেটা দিয়ে আক্রমণ করল নরিসকে।

‘বোঝাপড়াটা এই ব্যাট’র সঙ্গেই হবে আমার,’ বলল সে।

চমকটা সামলে নিতে সময় লাগল না নরিসের। চিৎকার করে উঠে ব্যাট তুলল সে, বাড়ি মারল মুসার মাথা সই করে। সেটা ঠেকানোর জন্যে ব্যাট তুলল মুসা। ঠেকালও। তবে ব্যাটটা ধরে রাখতে পারল না, ছুটে গেল। সে যে লোকটার কাছ থেকে ব্যাট কেড়ে নিয়েছিল সে-ও এগিয়ে এল ওকে ধরার জন্যে। রবিন বাধা দিল তাকে।

মুসার দিকে যেই নজর দিয়েছে নরিস, অমনি লাফ দিয়ে আগে বাড়ল কিশোর। তবে টের’পেয়ে গেল সেটা বিশালদেহী লোকটা। মুসাকে বাড়ি মেরে তার হাত থেকে ব্যাট ফেলে দিয়েই ঘূরল, সই করার সময় পেল না, কিশোরকে আসতে দেখেই বাড়ি মারল।

ঠিকমত লাগাতে পারল না। ব্যাটের মাথা কিশোরের মুখ ছুঁয়ে গেল। তারপর গিয়ে লাগল পুরানো কাঠের রেলিংটাতে। মড়াও করে কাঠ ভাঙার আওয়াজ হলো। আরেক কদম অ্যাগোল কিশোর। এক হাতে ব্যাট আটকানোর চেষ্টা করতে করতে আরেক হাতে কজি চেপে ধরল নরিসের।

কিন্তু ভারি শরীর দিয়ে ধাক্কা মেরে কিশোরকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল সে। রেলিং লেগে ব্যথা পেল কিশোর, উফ্ করে উঠল। কজি থেকে আঙুল ছুটে গেল। রেলিং আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকাল।

ব্যাটটা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে হেসে উঠল নরিস। আবার ঘূরল মুসা আর রবিনকে বাড়ি মারার জন্যে। ওদের চিত করেই ঘূরবে কিশোরকে কাবু করার জন্যে।

ওদেরকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে আবার ঘূরল কিশোরের দিকে। কিন্তু ওকে যেখানে আশা করেছিল, সেখানে পেল না। তার পরেও বাড়ি মারল। ব্যাটের নিচ দিয়ে ডাইভ দিল কিশোর। মাথা নিচু করে উড়ে এসে পড়ল নরিসের ওপর। মাথা দিয়ে ভীষণ জোরে উঁতো মারল পেটে।

ইংক করে উঠল লোকটা। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল শরীর। দু’দিক থেকে তাকে ধরে ফেলল মুসা আর রবিন। সাংঘাতিক জোর লোকটার গায়ে। প্রচঙ্গ ব্যথা পেয়েছে, তবু দু’জনের ধরার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাড়া দিয়ে মুক্ত করে নিল নিজেকে। শুধু মুক্ত করেই ক্ষান্ত দিল না, পাশে ঘূরে ঘূসি মারল রবিনের ঘাড়ে।

‘মথেষ্ট হয়েছে,’ বলেই ঝাপ দিল মুসা। গড়াতে গড়াতে পড়ল নরিসকে নিয়ে। গড়ানো থামল যখন, সে থাকল ওপরে।

কাহিল হয়ে পড়েছে নরিস। তাকে টেনে দাঁড় করাল মুসা। হেসে বলল, ‘তোমার ঘূসিতে দাক্ষণ শক্তি, জানা হয়ে গেছে আমার। এবার দেখ তো, আমারটা কেমন লাগে?’

বলেই মেরে বসল।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সেলসম্যানকে কাবু করে ফেলেছে কিশোর। দু’জনেই বসে পড়েছে সিঁড়ির ওপর। হাঁপাছে পরাজিত কুকুরের মত। মারপিটের বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আর নেই ওদের।

‘দাক্ষণ, বুবলে!’ হাত ঝাড়তে কিশোরকে বলল রবিন, ‘শেষ মারটা।’

বড় চমৎকার দিলে। কি মার? জড়ো?' .

মাথা ডলছে কিশোর। 'ছাই!' একজায়গায় ফুলে উঠেছে, সেখানে আঙুলের চাপ দিয়েই উফ করে উঠল। 'ছাই হোক আৱ যা-ই হোক, কাজ হয়েছে,' নরিসের ওপৰ প্রতিশোধ নিতে পেরে সন্তুষ্ট হয়েছে মুসা। 'তোমাদেরকে মারতে এল কেন?'

সংক্ষেপে সব জানাল কিশোর। শনেটুনে মুসা বলল, 'ভাল। পুলিশকে খবর দেব?'

'তাতে এই তিনটেকে জেলে ভৱতে পারব বটে,' কিশোর বলল, 'কিন্তু গভীর জলের মাছটা ফসকে যাবে। লুই মুগানকে আটকাতে পারব না আমরা।'

'কেন নয়? জালিয়াতি যে করেছে এটা তো ঠিক?'

'কমিক বুক জালিয়াতি,' হফার বলল, 'এই অপরাধে জেলে ঢোকানো যাবে বলে মনে হয় না। উকিলই ভাল বলতে পারবে।'

'কিন্তু আইন তো ভঙ্গ করেছে সে?'

'পাবলিশিং কপিরাইট অমান্য করেছে, এটা বলা যায়,' কিশোর বলল। 'এধরনের অপরাধে লোকের শাস্তি হয় বটে, তবে জেলে যায় না। জরিমানা টরিমানা দিয়েই খালাস পেয়ে যায়।'

'শহর ছেড়ে চলে যাবে সে,' ডিকসন বললেন।

'দেশ ছেড়েও চলে যেতে পারে,' বলল কিশোর। 'তাহলে জরিমানাও দিতে হবে না। দেখি, আগে জেনে নিই, কি ধরনের শয়তানি চলছিল এখানে। তারপর বুঝেশুনে কিছু একটা করা যাবে।'

ধমক দিতেই যা জানে গড়গড় করে বলে দিল এক সেলসম্যান। এখানে, এই মাটির নিচের ঘরে কমিক বই ছেপে নকল জিনিসটা আসল বলে ধরিয়ে দেয়া হত সংগ্রাহকের হাতে।

'ভাল আয় করেছে,' হফার বলল। 'শ' খানেক কমিক ছাপতে ব্ল্যাক অ্যাও হোয়াইটে বড় জোর হাঁড়ার দুয়েক ডলার লাগে। প্রতিটি বই কম করে হলেও পঞ্চাশে গচ্ছাতে পারবে বোকা সংগ্রাহকগুলোকে। তাতে লাভ থেকে যাবে তিন হাজার। সোজা কথা নয়। লেখক কিংবা আটিটকে কমিশনের জন্যে একটা পয়সাও দিতে হবে না। লাভ সবটাই নিজের পকেটে পূরতে পারবে প্রকাশক।'

'কিন্তু সব কিছু বন্ধ করে দিছে মুগান,' কিশোর বলল। 'প্রেসও বন্ধ করে দিয়ে এখনকার পাট চুকিয়ে চলে যাওয়ার মতলব। তারমানে আরও কোন ব্যাপার আছে।' একজন সেলস-ম্যানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, বলুন তো?'

'আরেক ফন্ডি করেছে,' শোকটা বলল। 'এবাবে কঢ়াবে হাঁপবে।'

'কালার?' ভুঁরু কোঁচকাল হফার। 'তাতে শে অনেক খরচ। একশে ছাপতেই বেরিয়ে যাবে বারো হাজার। মুরি করে ছাপতে গেলে অন্য প্রেস থেকে তো আর পারবে না, নিজেকেই করতে হবে সব কিছু। এস্টারলিসমেন্ট কষি অনেক। একটাকা পাবে কোথায়?'

'তাইওয়ান,' সিডির গোড়া থেকে জবাব দিল নরিস। হাত-পা দীর্ঘ হয়ে বস্তে আছে। চারপাশে তাকাল বিরক্ত চোখে। 'ওরই মত আরেক নেতৃত্বাল প্রিন্টারের।'

সঙ্গে ওখানে যোগাযোগ হয়েছে মরগানের, চুক্তি করেছে। ওখানে ছেপে চোরাচালান হয়ে চলে আসবে আমেরিকান। আপাতত চিনামাটির জিনিসের বাস্তু করে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মরগান। পুরো উপকূলে ছড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছা তার। আমাদের সবাইকে ব্যবসায় লাগাবে বলে শোভ দেখিয়েছিল। টাকার অক্ষ হিসেব করে দেখিয়েছিল। রাজি না হয়ে পারিনি।'

'এখন আর কি,' কিশোর বলল, 'জেলে গিয়ে পছন্দগে। বেশি শোভ করলে এরকমই হয়।'

সেলারেই তিনজনকে বেঁধে ফেলে রেখে বেরিয়ে এল তুরা। দোকানের দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। গাড়িতে বসে আছে মিরিনা। এরকম একটা পরিবেশে এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না তুর। ওদের দেখে অস্তি দূর হলো। উঠিয় কঠে জিজ্ঞেস করল, 'থবর কি তোমাদের? সব ভাল? চিঞ্চায়ই পড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে বের করে দিল সেলসম্যানগুলো। চুরি করে চুক্তে হয়েছে তখন মুসা আর রবিনকে।'

'আমরা ভাল।' কি কি ঘটেছে মিরিনাকে জানাল কিশোর। 'এখন গিয়ে মরগানকে ধরতে হবে, পালানোর আগেই।'

'কি করে আটকাব?' মুসার প্রশ্ন।

'ডাকাতির অভিযোগে,' সমাধান দিল রবিন। 'যদি কোনভাবে ওটার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে পারি ওকে, চোরাই কমিকগুলো খুঁজে বের করতে পারি, তাহলেই হবে।'

সন্তুষ্ট হতে পারল না মিরিনা। বলল, 'অনেকগুলো "যদি" এসে যাচ্ছে।'

কনভেনশনে ফিরে কোলাহল আর লোকের হড়াহড়ি যেন জোর একটা ধাক্কা মারল ওদের। আশা করেছিল, সুমাতো কমিকের মতই এখানেও দেখবে ভাঙা মেলা, লোকজন কম, সবাই পেটলাপুটলি গোছগাছ করে বাড়ি ফেরার তোরজোর করছে।

দই রঙ চুলওয়ালা মেয়েটার শোচনীয় অবস্থা। কুলিয়ে উঠতে পারছে না আর বেচারি। একই সাথে দুটো কাজ করতে হচ্ছে। হাতে সিলও মারতে হচ্ছে, দারোয়ানের কাজও করতে হচ্ছে। ফুরসত পেলেই তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, নিচয় নরিসকে দেখার আশায়। নরিস যে আর ফিরবে না, জানলেই মুষড়ে পড়বে মেয়েটা, তাই তাকে কিছু বলল না কিশোর।

'এবার?' কনভেনশন ফোরে চুকেই জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আমাদেরকে দেখে ফেলার আগেই তাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের,' মুসা বলল। 'গরিলাটাকে পাঠিয়েছে আমাদেরকে বন্দি করার জন্যে। এখন আমাদেরকে ঘূরঘূর করতে দেখলেই সন্দেহ করে বসবে।'

'ঠিক' একমত হয়ে বলল কিশোর। 'মরগানকে খুঁজে বের করতে হবে, চোরাই কমিকগুলোও বের করতে হবে।'

'এই তো, পেলাম,' শোনা গেল বাঁজখাই কঠ। মোটা শরীর দিয়ে ধাক্কা মেরে তিড় সরাতে সরাতে এগিয়ে এল ডফার। 'খুব উৎসুজিত লাগছে! ব্যাপারটা কি?'

খপ করে তার হাত চেপে ধরল ভুকার। 'এড, মরগানকে দেখেছ?'

হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল ভুফারের। দাঢ়ি নেচে বলল, 'ঠিকই আন্দজ  
করেছি! খুব উভেজনা। হয়েছেটা কি? আবার কিছুতে হাত দিল নাকি?'

সে হাসছে, আর কিশোর তাবছে মরগানের হাতের কথা। ডাকাতির পর পর  
হাজির হয়েছে শোকটা, শুধু আঙুলওয়ালা পাতলা হাতজোড়া ভলতে ভলতে। ওই  
হাতের উট্টো পিঠে সিল ছিল না। কনভেনশন বসু হিসেবে তার টিকেট লাগে না।

'মরগানের হাত ডাকাতীর হাতের সঙ্গে মিলে যায়,' কিশোর বলল, 'ওই  
হাতেও কোন সিল নেই। আমার বিদ্যাস, ডাকাতীটা সে-ই করেছে। কিন্তু দু'জন  
লোক তাকে গোল্ড রুমে যেতে দেখেছে, ডাকাতির সময়।' ভুক্ত কোচকাল  
কিশোর। নিচের ঠোটে চিমটি কাটল একবার। ভাবছে।

'আমি তাকে গোল্ড রুমে দেখেছি,' ভুফার বলল। 'ঘরে চুকে ঘ্যান ঘ্যান  
করতে লাগল প্রোজেকশনিং তখনও আসেনি বলে। সে নিজেই প্রোজেকটরটা  
চালানের চেষ্টা করল, পারল না। যন্ত্রটা এমনকি পর্দার দিকেও সেট করা ছিল না,  
যে ছবি ফেলা যাবে। মজার কাও করেছে। ওটাকে চালানোর জন্যে ব্যাগ ব্যবহার  
করেছে সে।'

'ব্যাগ? কিসের ব্যাগ?' জানতে চাইল কিশোর।

আগ করল ভুকার। 'কাঁধে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ ছিল। এই কনভেনশনের  
অর্ধেক লোকের কাঁধেই ওরকম ব্যাগ আছে।'

মুসা বলল, 'কিন্তু আমাদের সাথে যখন দেখা হলো, তখন ছিল না।'

রবিন যোগ করল, 'আর সেটা ডাকাতির বেশি আগেও নয়।'

'আসল কথা হলো,' কিশোর বলল, 'কি ছিল ব্যাগটার ভেতর?'

'তোমার কি মনে হয়?' মিরিনার প্রশ্ন। 'কসটিউম?'

'হতে পারে,' ভুকুটি করল কিশোর। 'কিন্তু সময়ের ব্যাপারটা মিলছে না।  
পোশাক খুলে এত তাড়াতাড়ি গোল্ড রুমে পৌছল কি করে?'

'ভাল প্রশ্ন,' মুসা বলল।

'গোল্ড রুমে দেখা দরকার। এসো।'

দল বেঁধে রওনা হলো সবাই। কনভেনশন ফ্লোর থেকে বেরিয়ে প্রথমে বাঁয়ে  
মোড়, তারপর আরেকবার বাঁয়ে মোড় নিতে লম্বা একটা করিডর পড়ল।

'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ?' ভুফার বলল, 'কনভেনশন ফ্লোরে এদিক  
দিয়ে যাওয়ার পথটা বড় জটিল। বেশি ঘোরপ্যাচ।'

শেষ মাথায়, ডানে গোল্ড রুমের প্রবেশ পথ। বক্ষ দরজার ওপাশ থেকে  
আসছে জমজমাট বাজনা। চিংকার করল একটা মহিলা কষ্ট, গান নিয়ে একটা  
মন্তব্য করল।

বাঁয়ে আরেকটা দরজা, তাতে ডোরনব নেই। ঠেলা দিল কিশোর। নড়ল না  
পাল্টা। 'এটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?' নিজেকেই যেন করল প্রশ্নটা।

'ওটা একটা ইমারজেন্সি একজিট,' ভুফার বলল। 'জরুরি অবস্থায় বেরোনোর  
পথ। এর অন্য পাশেই কনভেনশন ফ্লোর।'

দরজায় কান পেতে ওপাশে অসংখ্য মানুষের নড়াচড়া আর কোলাহল শুনতে

পেল কিশোর। চকচক করে উঠল চোখ। 'তাহলে এই ব্যাপার। এটা দিয়ে  
সহজেই কনভেনশন ফ্লোর থেকে ডাকাতি করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে ক্রিমসন  
'ফ্যান্টম'। মিস্টার ডিকসনের দোকান থেকে খুব কাছেই হবে মনে হয়।'

'তার পরেও কথা থাকে,' প্রশ্ন তুলল হৃষ্ণ। 'কা পড় বদলাল কোথায় সে?'

'যেখানে ডাকাতি করেছে সে গানেই।' জবাব দিল কিশোর। 'পোশাক বদলের  
ঘর তো ওখানেই তৈরি করে নিয়েছিল। ধোয়া। ধোয়ার মধ্যেই কাজটা  
সেরেছিল।' মিরিনার দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'ধোয়ার ভেতরে তাকিয়ে কি  
দেখতে পেয়েছিলে তুমি, বলো তো আবার?'

শ্রাগ করল মিরিনা। 'এক ঝলক লাল। মনে হলো কাঁধের ওপর। ধোয়ার  
ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তখন সে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কোন দিকে গিয়েছিল?'

ভেবে নিল মিরিনা। 'তখন তো মনে হয়েছিল, মানে আমি ভেবেছি আরকি,  
সামনের দরজার দিকেই গেছে। এখন মনে হচ্ছে, এই দরজাটার দিকেও আসতে  
পারে।'

হাসল কিশোর। 'লাল ঝিলিকের মানে হতে পারে, তখন ওটা খুলে ফেলছিল  
মরগান, ব্যাগে ঢোকানোর জন্যে। কমিক ভরে আনতে যে ব্যাগটা সাথে করে  
নিয়ে গিয়েছিল।'

ডুফার বলল, 'কিন্তু ডাকাতির আগের ক্ষণে যে তাকে আমি গোল্ড রুমে  
দেখেছি...'

বাধা দিয়ে বলল কিশোর, 'তা দেখেননি। ডাকাতির খবর শোনার আগের  
মুহূর্তে তাকে দেখেছেন, ডাকাতি হওয়ার আগের ক্ষণে নয়।'

ঘিধায় পড়ে গেল ডুফার। 'তাই তো! এটা তো হতেই পারে...হয়তো ঠিকই  
বলেছ তুমি...বুঝতে পারছি...'

'আমি পারছি না,' মুসা বলল।

'সামনের দরজা দিয়ে ডাকাতির খবরটা বাইরে বেরোতে মিনিট দুই লেগে  
গেছে,' বুঝিয়ে দিল রবিন।

'ঠিক।' কিশোর আরও ব্যাখ্যা করে বোর্বাল, 'পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে  
পড়েছিল মরগান, খবরটা হস্তরূপ থেকে বাইরে বেরোনোর আগেই। ছুটে চলে  
এসেছিস গোল্ড রুমের কাছে। যাতে তাকে লোকে দেখতে পায়, অ্যালিবাই তৈরি  
হয়, তাকে সন্দেহ না করতে পারে কেউ।'

বাহ্যিক ছিল: এক আঙুল তুলল। আর একটা হিন্দু সূত্র রয়ে গেল: সাথে  
করে ব্যাগটা পেল্ল রুমে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। ভাবছি, এখনও প্রোজেক্টরের  
গায়ে কোথাও খুলছে না তো?'

হৃষ্ণ বলল, 'গিয়ে দেখলেই তো হয়।'

'সব চেয়ে ভাল হয়,' কিশোর বলল, 'মরগান মদি যায়। গিয়ে বের করে  
ওটা। এক কাজ করা যাক। প্রোজেক্টরিটকে দিয়ে একটা খবর পাঠানো যাক  
তাকে।'

'প্রোজেক্টর চালাচ্ছে এখন পিটার, আমার বক্স,' ডুফার বলল। 'ওই যে,

আমাদের পাশে বসে খাচ্ছিল যে লোকটা সেদিন।'

'বুঝতে পেরেছি,' কিশোর বলল। 'তাকে দিয়ে কিছু করানো যায় না?'

'খবর পাঠাতে চাও তো? যাবে। কি বলতে হবে?'

'প্রোজেকটের ভীষণ গরম হয়ে গেছে, আগুন লেগে যেতে পারে,' হাসল  
কিশোর, 'এরকম কিছু?'

## সতেরো

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল গোল্ড রুমের দরজা। নাছোড়বান্দা কিছু কমিকের ভঙ্গের  
ওপর ছড়িয়ে পড়ল আলো। টেরই পেল না ওরা। গভীর ঘুমে অচেতন। যারা  
জেগে রয়েছে তারা তাকিয়ে রয়েছে পর্দার দিকে। আলো পড়তেই চিংকার করে  
উঠল দু'চারজন, 'এই, বন্ধ করো! দরজা বন্ধ কর!'

পর্দায় তখন ম্বাকম্বানের রাজা গুঙ্গের সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়ছে রক  
অ্যাসটারয়েড।

দর্শকদের আপত্তির পরোয়াই করল না দরজায় দাঁড়ানো লম্বা মানুষটা। সোজা  
এগোল প্রোজেকটরের দিকে। যাওয়ার সময় ঘষা লাগল পিটারের গায়ে। টেবিলে  
রাখা ক্যানভাসের ব্যাগটা ধরে টান দিল নিজের দিকে। একপাশে সরে গেল  
প্রোজেকটর, আলো অর্ধেক পড়ছে এখন পর্দায়, বাকি অর্ধেক বাইরে।

দর্শকরা দেখতে পাচ্ছে রে গান বের করছে রক, কিন্তু যার উদ্দেশে বের  
করেছে, সেই শক্রই গায়েব। আলো অর্ধেক সরে যাওয়ায় বাইরে পড়ে গেছে গুঙ্গ।

'অ্যাই, কি হলো? ছবির কি হলো?' চিংকার করে উঠল কয়েকজন দর্শক।  
এমনকি যারা ঘুমিয়ে ছিল তারাও জেগে উঠে চেঁচামেচি শুরু করল। লোকটা যখন  
টান দিয়ে প্রোজেকটরের নিচ থেকে ব্যাগটা বের করল, তখন চিংকার চরমে  
উঠেছে। কারণ প্রোজেকটরের আলো তখন পর্দা থেকে এতটাই নিচে নেমে গেছে,  
রক আর গুঙ্গের কেবল মাথাটা দেখা যাচ্ছে। রকের হেলমেট আর গুঙ্গের মাথার  
অ্যান্টেনা এপাশ ওপাশ করছে প্রোজেকটরের আলো নড়ার সাথে সাথে।

চেঁচামেচিতে ছবির শব্দই শোনা যায় না। কয়েকজন ভঙ্গ চেঁচিয়ে উঠল যারা  
চিংকার করছে তাদেরকে চূপ করানোর জন্যে। তাতে চিংকার বাড়লই শুধু, কমল  
না।

সব চিংকারকে ছাপিয়ে শোনা গেল আরেকটা তীক্ষ্ণ কর্কশ চিংকার, 'অ্যাই,  
তোমরা চূপ করবে! কিছু তো শুনতে পাচ্ছিন্না!'

নিঃশব্দে এগিয়ে এল ওরা সাতজন, ঘিরে ফেলল টেবিলের কাছে দাঁড়ানো  
মানুষটাকে। এই সাতজন হলো তিন গোয়েন্দা, ম্যাড ডিকসন, আইজাক হফার,  
এডগার ডুফার আর মিরিনা জরডান। আবছা আলোতেও স্পষ্ট চেনা গেল লুই  
মরগানকে।

ব্যাগটা হাতে আঁকড়ে ধরে একটা মুহূর্ত চূপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন্স মরগান।  
তারপর শুঁগ করে ব্যাগ থেকে বের করলেন ছোট একটা বল।

'থার্মুন!' চিংকার করে উঠল কিশোর। কিন্তু ততক্ষণে বলটা মেরোতে পড়ে

গেছে।

ঘন ধোয়া উঠতে শুরু করল। চিংকার করে বললেন মরগান, 'আগুন! আগুন!'

আসল ভক্তেরা কথাটা কানেই তুলল না। ছবি ঠিক করতে বলছে পিটারকে। ধোয়া বাড়ছে, তাতে ঠিক করা ক্রমেই মুশকিল হয়ে উঠছে। যারা একটু কম ভজ্জ, তারা গোয়েন্দাদের দলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দৌড় দিল দরজার দিকে। এই সুযোগটা কাজে লাগালেন মরগান। আক্রমণ করে বসলেন মিরিনাকে। ব্যাগ ঘুরিয়ে বাড়ি মারতে গেলেন।

বাড়ি লাগল না, ধাক্কায়ই টলে উঠে পিছিয়ে গেল মিরিনা। তার পাশ কাটিয়ে খোলা দরজার দিকে দৌড় দিলেন মরগান।

পড়ে যাছিল মিরিনা, কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে আটকাল কিশোর। চিংকার করে বলল অন্যদেরকে, 'আসুন! জলদি!'

দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরোল ওরাও। হলের অর্ধেক পেরিয়ে গেছেন ততক্ষণে মরগান। সামনে কেউ পড়লে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছেন। পিছু নিল তিন গোয়েন্দা। সামনে একটো ছেলেকে দেখে সোজা ঘুসি মেরে বসলেন মরগান, সরানৰ জন্যে। চৰকিৰ মত পাক খেয়ে দেয়ালের দিকে চলে গেল ছেলেটা।

লবিতে বেরোলেন মরগান। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ছুটলেন্ন, লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে, কনুইয়ের গুঁতো মেরে সরিয়ে। সাধাৰণত যেদিক দিয়ে বেরোনৰ কথা—সামনেৰ দরজা কিংবা এলিভেটৱেৰ দিকে না গিয়ে যাচ্ছেন অন্য দিকে।

বুকো ফেলল কিশোর। 'সিঁড়ি! লোহার সিঁড়িৰ দিকে যাচ্ছেন তিনি!'

আগে চলে গেল মুসা। দ্রুত কমে আসছে তার আৱ মরগানেৰ মাঝেৰ দূৰত্ব। অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে লোকে।

মোড়েৰ কাছে গিয়ে যেন ব্ৰেক কৃষলেন মরগান। পৰক্ষণেই ঘুৰে গেলেন সিঁড়িৰ দিকে। একটু পৱেই দড়াম করে সিঁড়িৰ দরজা বক্ষ হওয়াৰ শব্দ শোনা গেল।

হাঁচকা টানে দরজাটা খুলে ফেলল মুসা। চুকে পড়ল ভেতৱে। পেছনে বিন্দুমাত্ৰ গতি না কমিয়ে এসে চুকল কিশোৰ আৱ রবিন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুৱ কৱল।

'মুসা,' চেঁচিয়ে বলল কিশোৰ। 'সোজা তোমাৰ গাড়িতে গিয়ে উঠবে। মরগানকে ধৰাৱ চেষ্টা কোৱো না!' আগেৰ বাব কিভাবে ওদেৱ দৌড়ে পৱাজিত কৱে দিয়েছিলেন কনভেনশন চীফ, মনে আছে তার।

পাৰ্কিং গ্যারেজে নেমে এল ওৱা। ওৱাও নামল, মরগানও উঠে পড়লেন লাল একটা কৱলতে গাড়িতে।

ইমপালাৰ দিকে দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা। মুসা ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে দিতে চলতে শুৱ কৱল কৱলতে, ঘুৰে রওনা হয়ে গেল এক্জিট র্যাস্পেৰ দিকে। এক্সিলারেটৱেৰ পায়েৰ চাপ বাড়িয়ে গাড়িটাৰ পিছু নিল মুসা।

'খোলা রাস্তায় যদি চলে যায়,' বলল সে। 'তাহলে আৱ ধৰতে পাৱব না। ওৱ গাড়িৰ ধুলো থাওয়া ছাড়া তখন আৱ কিছুই কৱাৰ থাকবে না আমাদেৱ।'

কিন্তু থামাবেই বা কি করে লোকটাকে? র্যাস্পে যেতে কোন বাধা নেই।

তারপর, হঠাৎ করেই কর্কশ আর্তনাদ করে উঠল টায়ার। দেখা গেল, একটা থামের আড়াল থেকে বেরোছে ম্যাড ডিকসনের সবুজ ভ্যান। মরগানের গাড়ির পথরোধ করতে ছুটল একচোখা সাইক্লিপস।

গতি বাড়াল করভেট। শাই করে একপাশে কেটে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল সাইক্লিপসকে। পুরোপুরি পারল না। ধ্রাম করে এসে ওটার পেছনের ডান ফেণ্টারে গুঠো মারল সবুজ ভ্যান।

থামলেন না মরগান। গতি কমালেন না। ভাঙা ফেণ্টার বিচ্ছি শব্দ তুলছে।

কয়েক জায়গায় রঙ চটে গেল সাইক্লিপসের। কেয়ারই করল না। তীক্ষ্ণ মোড় নিতে গিয়ে কাত হয়েই আবার সোজা হলো। দুলে উঠল একবার। থামল না। করভেটের লেজে লেগে রইল। কাছাকাছি চলে এল ইমপালা।

সেশ্বুরি বুলভারে বেবিয়েই গতি বাড়াল করভেট। যানবাহনের ভেতর দিয়ে পথ করে ছুটতে গিয়ে যেন মাতালের মত দুলছে। খানিক পর পরই কিংইচ কিংইচ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে টায়ার। রাস্তায় ঘষা লেগে জুলে যাচ্ছে। ডানের ফেণ্টারটা চেপে লেগে রয়েছে চাকার সঙ্গে, ক্ষতি করে চলেছে টায়ারের।

মুসার ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হয়নি। গতি বাড়িয়ে ওদেরকে ধূলো খাইয়ে সরে পড়তে পারেননি মরগান। গতি বাড়ালেই মাতাল হয়ে যায় গাড়ি, নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় আছে এভাবে চললে। গতি কমাতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি। আশা হলো তিন গোয়েন্দার। ধরার সুযোগ আছে!

করভেটের পেছনে লেগেই রয়েছেন ডিকসন। গালাগাল করছে অন্যান্য ড্রাইভাররা, সরতে বলছে, কানেই তুলছেন না তিনি। শ্রী লেনের দিকে ঘুরে গেল মুসা। সামনে দিয়ে গিয়ে করভেটকে আটকানোর চেষ্টা করল।

আরেকবার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করলেন মরগান। আবার বাধা দিল আহত ফেণ্টার। পেছনের বাস্পারে গুঠো মারল কয়েকবার সাইক্লিপস।

সব রকমে চেষ্টা চালিয়েও করভেটকে থামাতে কিংবা রাস্তা থেকে সরাতে পারল না সাইক্লিপস আর ইমপালা। কিছুতেই পাশ কাটিয়ে পেরোতে দিলেন না ওদেরকে মরগান। একবার বাঁ পাশে এগিয়ে প্রায় সমান সমান হয়ে গেল সাইক্লিপস। ধাঁ করে এসে ওটাকে বাড়ি মারল করভেট, কয়েক জায়গার রঙ তুলে দিল। তুবড়ে গেল বড়ির ওসব জায়গা। রাস্তায় এই কাও চলতে দেখে হতবাক হয়ে গেছে অনেক ড্রাইভার। জোরে জোরে হৰ্ন বাজাতে শুরু করেছে।

রবিন বলল, 'করভেট বেচারার স্যালভিজ ইয়ার্ডে যেতে আর দেরি নেই।'

ভুল বলেনি সে। চমৎকার গাড়িটার করণ চেহারা হয়েছে। দুই পাশে রঙ চটে গেছে অনেক জায়গায়, তুবড়ে গেছে শরীর। বাস্পারের একটা পাশ ঝুলে ঝুলছে, রাস্তায় ঘষা লেগে আগনের ফুলকি ছিটাচ্ছে। বসে যাওয়া ফেণ্টারের চাপে একনাগড়ে আর্তনাদ করে চলেছে চাকাটা।

ঘষা লেগে রাবার ক্ষয়ে গিয়ে পাতলা হয়ে এল টায়ার, আর সইতে পারল না। বিকট শব্দ করে ফাটল। পাগল হয়ে গেল যেন করভেট। হঁশজ্ঞান সবকিছু

হারিয়ে রাস্তার গাড়িগুলোকে গুঁতো

মারার জন্যে ছুটে যেতে লাগল এদিক ওদিক। সবাই সরে যেতে চাইছে পাগলা গাড়ির নাকের সামনে থেকে। ব্রেক কর্ষার ফলে একাধিক টায়ারের কর্কশ শব্দ হলো। হৰ্ন বাজল। রাগত চিৎকার শোনা গেল ড্রাইভারদের। অবশেষে গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন মরগান।

ডান পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল সাইক্লপস। বাঁ পাশে চেপে আসছে ইমপালা। কোণঠাসা করে ফেলল করভেটকে।

এখন আর কিছুই হারানোর নেই মরগানের। দুটো গাড়ির মাঝখান দিয়ে ভয়ানক ভাবে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে তাঁর গাড়ি। থামলেন না এত কিছুর পরেও। দুই সারি গাড়িকে মাঝখান দিয়ে কেটে বেরিয়ে চলে যেতে চাইছেন ডানের রাস্তায়। কিন্তু যেতে দিলেন না ডিকসন।

করভেটের গায়ে প্রায় ঘষা লেগে বেরিয়ে গেল সাইক্লপস। সামনে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়াল লাল গাড়িটার। থামতে বাধ্য হলেন মরগান। তবে সেটা মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই শৌই শৌই টিয়ারিং কেটে নাক ঘোরাতে শুরু করলেন গাড়ির।

ভ্যান থামতে না থামতেই ঘটকা দিয়ে খুলে গেল এক পাশের দরজা। লাফিয়ে রাস্তায় নামল মিরিনা। ডয় পাছে বোঝা যায়, তবে ছাড়তেও রাজি নয়। টান দিয়ে গা থেকে খুলে ফেলল আলখেন্টা। বুলফাইটারদের লাল কাপড়ের মত করে ধরল। তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল করভেট। সোজা ওটার ডান উইপশীল্ডে আলখেন্টা ছুঁড়ে মারল সে।

সামনের কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না মরগান। মোড় নিতে ব্যর্থ হলেন তিনি। অঙ্কের মত রাস্তা হাতড়ে বেড়াতে গিয়ে দড়াম করে লাইটপোস্টে গুঁতো লাগিয়ে বসল করভেট।

‘পুলিশ যখন হাজির হলো, দেখল, মরগানকে ঘিরে রেখেছে সাতজন লোক। বিধ্বস্ত চেহারা হয়েছে কনভেনশন চীফের, তবে জ্বর হয়নি কোথাও। হাতে ধরা রয়েছে তখনও ব্যাগটা, যেটাতে রয়েছে ডাকাতির মাল।’

## আঠারো

ডাকাতির দায়ে জেলে যেতে হলো মরগানকে। তবে কনভেনশন চীফের জন্যে কনভেনশন থেমে থাকল না। চলল শেষ দিন পর্যন্ত, যতদিন চলার কথা। রবিবারে তো প্রচণ্ড ভিড় হলো, সব চেয়ে বেশি ভিড়। সুমাতো কমিকের স্টল খালি, চুটিয়ে ব্যবসা করল অন্য স্টলগুলো।

বেশি ভিড় হলো ম্যাড ডিকসনের দোকানের সামনে, লোক জেনে গেছে। একটা অপরাধ চক্রকে ভাঙতে সাহায্য করেছেন তিনি। বিরাট বিজ্ঞাপন হয়ে গেছে এটা তাঁর জন্যে। বই বিক্রি করে অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠলেন তিনি, তাঁকে সাহায্য করার জন্যে বাঢ়তি লোক নিয়োগের পরেও।

এরই মাঝে এক ফাঁকে কতগুলো কমিক উল্টেপাল্টে দেখলেন, কেনার জন্যে। বললেন, 'আরও ভাল অবস্থায় পেলে ভাল হত। দুটো পাতা দুমড়ে গেছে। মলাটটায় একটু টান লাগলেই খুলে চলে আসবে। আরও যত্ন করে রাখা উচিত ছিল তোমার।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি।

'পারতাম,' হেসেই জবাব দিল কিশোর। 'একটা সুন্দরী যেয়ের বিপদ তো, সাহায্য করতেই হলো। এগুলোর দিকে আর নজর দিতে পারিনি।'

বিশ ডলারের তাড়া বের করে নোট গুণতে শুরু করলেন ডিকসন। কয়েকটা বের করে নিয়ে টেবিলে রাখলেন। 'এই হলো গে কমিকের দাম,' বললেন তিনি। আরও কিছু নোট বের করে সেগুলোর সঙ্গে রেখে বললেন, 'আর এটা হলো গিয়ে বোনাস।'

তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। যা ইনভেন্ট করেছিল ওরা কমিকগুলোতে, তার অনেক গুণ বেশি ফেরত পেয়েছে। প্রায় আটশো ডলার!

টাকাগুলো পকেটে রাখতে রাখতে কিশোর বলল, 'মনে হয় অনেক বেশি দিয়ে ফেললেন, মিস্টার ডিকসন। চাইলে এখনও ফেরত নিতে পারেন। ব্যবসা করতে এসেছি আমরা, গলা কাটতে নয়।'

'কি যে বল! পনেরো মিনিটেই তুলে ফেলব ওই টাকা!' হাসিতে দাঁত বেরিয়ে গেল তার। 'আশা করছি তোমারগুলো থেকেই তুলে ফেলব। আর যদি লাভ তেমন না-ই হয়, কুছ পরোয়া নেই। ফ্যান ফানটা বিক্রি করে দিয়ে টাকা তুলব। যেটাতে জাল অটোগ্রাফ রয়েছে। ওটার জন্যে তো এখন পাগল হয়ে আছে সংগ্রাহকরা। পুলিশের কাছ থেকে ফেরত এলে আর একটা মিনিটও আটকাতে পীরব না। চাই কি, বলেকয়ে হফারের একটা আসল সইও করিয়ে নিতে পারি। তাহলে দাম আরও চড়ে যাবে।'

'অট্টা আশা কোরো না,' পাশ থেকে বলে উঠল হফার। কখন এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করেনি তিন গোয়েন্দা কিংবা ডিকসন। 'অন্য কমিকে সই করে দিতে রাজি আছি, ওটাতে নয়।'

'হফার, পুরীজ,' অনুরোধ করলেন ডিকসন। 'এখন তো আর...'

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে হফার। মাথা নেড়ে বলল, 'বেশ, দিতে পারি। তবে শারের কমিশন দিতে হবে আমাকে।'

'আজব লোক, এই কমিকের মানুষগুলো,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন ডিকসন। 'টাকা ছাড়া আর কিছু বেঁচে না। খালি ব্যবসা...'

মাঝখান থেকে কিশোর বলল, 'একমাত্র এডগার দুফার বাদে। তাকে তো দেখছি না?'

'হ্যা,' মাথা দোলাল হফার, 'এডের লোভটোড নেই। গোল্ড রুমে গেলেই পাবে তাকে। রক অ্যাস্টারয়েডে দুবে রয়েছে। প্রোজেক্টরটা জায়গামত বসিয়ে ফেলা হয়েছে আবার। গিয়ে দেখগে, লোকের কি ভিড়।'

'লুকানোর জায়গা খুঁজে বের করেছিল বটে মরগান,' রবিন বলল। 'সব তো

ফাঁস হয়ে গেছে। তার দলের এখন কি হবে? বান্দাবাজি করে নিশ্চয় অনেক লোকের পকেট মেরেছে?’

‘তা তো মেরেইছে,’ ডিকসন বললেন। ‘ভাঁওতা দিয়ে অনেক লোককে ঠকিয়েছে। টাকা অনেছে অনেক কমিক বিক্রেতা আর সংগ্রাহকের কাছ থেকে। আসল ভেবে সাদা-কালো যে সব কমিক কিনেছিল ওরা, সেগুলোর কথা ভেবে এখন কপাল চাপড়াচ্ছে। ওরা তো ভেবেছিল অনেক কমে অনেক দামি জিনিস পেয়ে যাচ্ছে। এভাবে ঠকবে, কল্পনা করতে পারেনি।’

গভীর হয়ে গেল হফার। ‘ঠকিয়েই যেত, যদি বেশি লোভ করতে গিয়ে জাল অটোগ্রাফের শয়তানিটো না করত। তবে একটা ব্যাপার ভালই হয়েছে। ধরা না পড়লে আরও অনেক বেশি ঠকানোর ব্যবস্থা করত। রঙিন কমিক ছেপে তাতে জাল অটোগ্রাফ দিয়ে পাইকারী হারে ঠকাত মানুষকে।’

‘ওদেরও দোষ আছে। অনেকেরই,’ মুসা বলল। ‘শনেছি, জেনেভনেই ঠকে ওরা। কয়েকজনকে নাকি গিয়ে বলেছে মরগান, দেখুন তো সইটা জাল কি-না? ওরা দেখেছে, চিনেছেও। বলেনি। জানে, জাল হলে আসলের চেয়ে দাম বেড়ে যাবে। বেশি দাম যদি চেয়ে বসে আবার মরগান, সে জন্যে বলেছে, না আসলই। তারপর তাড়াতাড়ি তার হাতে দামটা ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছে। ভেবেছে, আহা কি লাভটাই না করলাম!'

‘ওদের এই লোভের জন্যেই খেলাটা খেলতে পেরেছে মরগান,’ কিশোর বলল। ‘অনেককেই দলে টেনেছে সে, এমন কি নীল বোরামকেও। ভুলটা করেছে হফারকে কনভেনশনে দাওয়াত দিয়ে। অটোগ্রাফ দেয়া ফ্যান ফানটো বিক্রি করে দিয়েছে বোরাম, একথা যদি জানত মরগান তখন, তাহলে ভুলটা আর করত না।’

মাথা ঝাঁকাল হফার। ‘হ্যাঁ, তাহলে বুঝে যেত, ওই অটোগ্রাফ আমার চোখে পড়লেই সব ভেস্টে যাবে।’

‘বইটা কেনার জন্যে দেখলে না, কি রকম পাগল হয়ে গিয়েছিল বোরাম! হাসলেন ডিকসন।

‘কিন্তু যেহেতু আপনি বেচলেন না,’ কিশোর বলল। ‘চুরি করতে বাধ্য হলো মরগান। এভাবে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল সে। হফারকেও বের করে দিতে চেয়েছিল কনভেনশন থেকে। ডাকাতি হলে সবাই ভাববে, হফারই কাজটা করেছে। মানে মানে তখন কেটে পড়বে সে, এই ছিল মরগানের ধারণা। যত ভাবে সম্ভব, হফারকে ঠেকাতে চেয়েছিল, যাতে অটোগ্রাফটা তার চোখে না পড়ে। সে বুঝতে পেরেছিল, পড়লে তার সমস্ত জারিজুরি ফাঁস হয়ে যেতে পারে। লাটে উঠতে পারে অবৈধ ব্যবসা।’

‘আমি যে এখানে আমার ধান্দায় এসেছি, এটাও জানত না সে,’ হফার বলল।

‘ভুল আরও করেছে,’ বলল রবিন। ‘ডাকাতির পর আমাদের তিনজনকে, বিশেষ করে কিশোরকে উৎসাহিত করেছিল কেসের তদন্ত করার জন্যে। কিশোর পাশা যে কি চিজ সেটা কি আর ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিল। এ কাজ করেছে সে নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখতে। এবং সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছে।’

‘তবে ঘোলা পানি কম খাওয়ায়নি আমাদের,’ স্বীকার করল কিশোর। ‘মিরিনার ব্যাগে কমিকগুলো রেখে তো মহাদ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল আমাকে।’

হেসে উঠল মুসা, ‘কিন্তু বেচারা জানত না, দ্বিধায় পড়লে যে খেপা বাষ হয়ে যায় কিশোর পাশা।’

‘তোমরাও কি আর কম নাকি? এক ঘুসি খেয়েই তো পাগল হয়ে উঠলে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে।’

অনেক সময় নষ্ট করেছেন ডিকসন। ওদিকে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তাঁর সেলসম্যানেরা। ওদেরকে সাহায্য করতে যেতে চাইলেন তিনি। ছেলেদের বললেন, ‘যা-ই বলো, তোমাদের মত গোয়েন্দা আমি আর দেখিনি। সাংঘাতিক ছেলে তোমরা। তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে খুব ভাল লেগেছে আমার। ইয়ে, পুরানো কমিক পেলেই চলে আসবে আমার দোকানে। দোকান তো চেনেই। কেনার মত হলে কিনে নেব।’ এক এক করে তাকালেন ওদের মুখের দিকে। ‘তো, এখন যে শাপ করতে হয় আমাকে?’

‘নিশ্চয়ই,’ তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। ‘অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কমিকগুলো কিনে নেয়ার জন্যে...’

‘জলদি ভাগ,’ হেসে রসিকতা করল হৃফার। ‘নইলে আবার তোমাদের অটোগ্রাফ চেয়ে বসবে। বাপরে বাপ, এমন ব্যবসায়ী আমি আর দেখিনি!’

ডিকসন আর হৃফারকে ‘গুড-বাই’ জানিয়ে দরজার দিকে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। ভিড় ঠেলে কিছুদুর এগোতেই দেখতে পেল ক্যামেরার ফ্ল্যাশারের ফিলিক। মিরিনা জরডানের ছবি তুলছে উৎসাহী তরঙ্গেরা।

কিশোরকে দেখেই উজ্জ্বল হলো মিরিনার মুখ। ‘কিশোর!'

‘উম-হাই!’ কোনমতে বলল কিশোর। এড়িয়েই যেতে চায়। কেস শেষ, মিরিনার ব্যাপারেও তার আগ্রহ শেষ। \*

কিন্তু এত সহজে তাকে রেহাই দিল না মিরিনা। এগিয়ে এল। ‘আমাকে বিখ্যাত করে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে ওরা, কিশোর। তবে আমি তো জানি, এ সবের পেছনে আসল ক্রেডিটটা কার। তোমার। নইলে বিখ্যাত হওয়া তো দূরের কথা, অপমানিত হয়ে এই হোটেল থেকে বিদেয় হতে হত আমাকে। তুমি আমাকে চুরির অপবাদ থেকে বাঁচিয়েছ, তুমি আমাকে কিডন্যাপ হওয়া থেকে রক্ষা করেছ। মরগানকে ধরার জন্যে ফাঁদটা তুমিই পেতেছে। কিশোর, কি বলব তোমাকে, তোমার মত মানুষ আমি সত্যিই দেখিনি! তুমি একটা লোক বটে।’

প্রমাদ গুনল কিশোর। সবার সামনে এখন প্রেম না নিবেদন করে বসে! তাহলে ভীষণ লজ্জায় পড়তে হবে। কৌতুহলী চোখে অনেকেই তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে দু’একজন। কিশোর বলল, ‘থ্যাঙ্কস, মিরিনা। এখন তো আমার সময় নেই। পরে কথা বলব। তা কোথায় থাক তোমরা?’

‘পোর্টল্যাণ্ডে।’

চোখ মিটমিট করল কিশোর। ‘ওরিগনের পোর্টল্যাণ্ড?’

ইঁয়া।'

'অনেক দূৰ...'

'অত দূৰে যেতে হবে না তোমাকে! আৱও কিছুদিন লস অ্যাঞ্জেলেসেই আহি  
আমৱা। আৱ যদি মডেলিঙের কাজটা পেয়েই যাই, তাহলে তো এখানেই থাকতে  
হবে। দেখা কৰতে পাৱব...'

ঘিৰে ফেলছে ওদেৱকে তক্ষণেৱা। আৱ একটা মুহূৰ্তও এখানে নয়, ভাৱঃ  
কিশোৱ। বলল, 'পৱে কথা বলব, ঠিক আছে? চলি, গুড বাই।'

হলেৱ বাইৱে বেৱিয়ে হাঁপ ছাড়ল গোয়েন্দাপ্ৰধান। 'বাপৱে বাপ! বড় :  
বেঁচেছি!'

'তুমি যে কি কিশোৱ, বুঝি না,' রবিন বলল। 'মেয়েদেৱ সঙ্গে কথা বলত  
গেলেই...'

'ওসৰ কথা থাক।' কিশোৱেৱ দিকে হাত বাঢ়ল মুসা। 'আমাৱ ট  
টাকাটা এখনই দিয়ে দাও। পৱে ভুলে যাব।'

'চলো, গাড়িতে গিয়ে দেব,' এলিভেটৱেৱ দিকে রওনা হলো কিঃ  
'এখানে বেৱ কৱলে আবাৱ কে কোন্দিক দিয়ে ডাকাতি কৱে নৈয়, ঠিক আছে

'আমাদেৱ টাকা নিয়ে হজম কৱবে এতই সহজ?' বুকে চাপড় দিয়ে বল  
মুসা, 'আমৱা তিন গোয়েন্দা। মঙ্গল গ্ৰহে গিয়েও পাৱে না ব্যাটা। ঠিক ধ  
নিয়ে আসব।'

তাৱ কথীয় হাসল রবিন আৱ কিশোৱ।

-ঃশ্রেষ্ঠঃ-